सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পন করছি।”

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাসের
পাঠ্যবই

ভারতের ইতিহাস

ভাগ ২

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি ।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

এন সি ই আর টি অনুমোদিত
প্রথম বাংলা সংস্করণ-
প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০২০

দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই
এন সি ই আর টি-র
•Themes in
INDIAN HISTORY Part II
পাঠ্যপুস্তকের
২০১৭ সালের পুনর্মুদ্রণের অনূদিত সংস্করণ।

প্রচ্ছদ : সুদীপ দাস

অক্ষর বিন্যাস : সুদীপ দাস

মূল্য: 110 টাকা মাত্র

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২।

প্রকাশক
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উপদেষ্টা

ড. অর্ণব সেন, সহঅধ্যাপক, এন ই আর আই ই, শিলং

ড. অরূপ কুমার সাহা, সহঅধ্যাপক, আর আই ই, ভুবনেশ্বর

পাঠ্যপুস্তকটি যাঁরা অনুবাদ করেছেন :

শ্রী সুকান্ত চক্রবর্তী, শিক্ষক

শ্রী দেবাশিস চৌধুরী, শিক্ষক

শ্রীমতী সুজাতা পাল, শিক্ষিকা

শ্রীমতী বিপাশা ব্যানার্জী, শিক্ষিকা

শ্রী সঞ্জীব দেব, শিক্ষক

শ্রী অম্লান দেব, শিক্ষক

শ্রী দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, শিক্ষক

শ্রী শিবু চন্দ্র দাস, শিক্ষক

ভাষা-পরিমার্জনায়

শ্রী সুপ্রিয় চক্রবর্তী

শ্রী গৌতম বুদ্র পাল

শ্রীমতী এমেলী নাগ

FOREWORD

The *National Curriculum Framework* (NCF), 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the *National Policy on Education* (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-table is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hard work done by the textbook development committee responsible for this book. We wish to thank the Chairperson of the advisory group in Social Sciences, Professor Hari Vasudevan, and the Chief Advisor for this book, Professor Neeladri Bhattacharya, Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi for guiding the work of this committee. Several teachers contributed to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their

resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the Chairpersonship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

Director
National Council of Educational
Research and Training

New Delhi
20 November 2006

DEFINING THE FOCUS OF STUDY

What defines the focus of this book? What does it seek to do? How is it linked to what has been studied in earlier classes?

In Classes VI to VIII we looked at Indian history from early beginnings to modern times, with a focus on one chronological period in each year. Then in the books for Classes IX and X, the frame of reference changed. We looked at a shorter period of time, focusing specifically on a close study of the contemporary world. We moved beyond territorial boundaries, beyond the limits of nation states, to see how different people in different places have played their part in the making of the modern world. The history of India became connected to a wider inter-linked history. Subsequently in Class XI we studied *Themes in World History*, expanding our chronological focus, looking at the vast span of years from the beginning of human life to the present, but selecting only a set of themes for serious exploration. This year we will study *Themes in Indian History*.

The book begins with Harappa and ends with the framing of the Indian Constitution. What it offers is not a general survey of five millennia, but a close study of select themes. The history books in earlier years have already acquainted you with Indian history. It is time we explored some themes in greater detail.

In choosing the themes we have tried to ensure that we learn about developments in different spheres – economic, cultural, social, political, and religious – even as we attempt to break the boundaries between them. Some themes in the book will introduce you to the politics of the times and the nature of authority and power; others explore the way societies are organised, and the way they function and change; still others tell us about religious life and ritual practices, about the working of economies, and the changes within rural and urban societies.

Each of these themes will also allow you to have a closer look at the historians' craft. To retrieve the past, historians have to find sources that make the past accessible. But sources do not just reveal the past; historians have to grapple with sources, interpret them, and make them speak. This is what makes history exciting. The same sources can tell us new things if we ask new questions, and engage with them in new ways. So we need to see how historians read sources, and how they discover new things in old sources.

But historians do not only re-examine old records. They discover new ones. Sometimes these could be chance discoveries. Archaeologists may unexpectedly come across seals and mounds that provide clues to the existence of a site of an ancient civilisation. Rummaging through the dusty records of a district collectorate a

historian may trip over a bundle of records that contain legal cases of local disputes, and these may open up a new world of village life several centuries back. Yet are such discoveries only accidents? You may bump into a bundle of old records in an archive, open it up and see it, without discovering the significance of the source. The source may mean nothing to you unless you have relevant questions in mind. You have to track the source, read the text, follow the clues, and make the inter-connections before you can reconstruct the past. The physical discovery of a record does not simply open up the past. When Alexander Cunningham first saw a Harappan seal, he could make no sense of it. Only much later was the significance of the seals discovered.

In fact when historians begin to ask new questions, explore new themes, they have to often search for new types of sources. If we wish to know about revolutionaries and rebels, official sources can reveal only a partial picture, one that will be shaped by official censure and prejudice. We need to look for other sources – diaries of rebels, their personal letters, their writings and pronouncements. And these are not always easy to come by. If we have to understand experiences of people who suffered the trauma of partition, then oral sources might reveal more than written sources.

As the vision of history broadens, historians begin tracking new sources, searching for new clues to understand the past. And when that happens, the conception of what constitutes a source itself changes. There was a time when only written records were acknowledged as authentic. What was written could be verified, cited, and cross-checked. Oral evidence was never considered a valid source: who was to guarantee its authenticity and verifiability? This mistrust of oral sources has not yet disappeared, but oral evidence has been innovatively used to uncover experiences that no other record could reveal.

Through the book this year, you will enter the world of historians, accompany them in their search for new clues, and see how they carry on their dialogues with the past. You will witness the way they tease out meaning out of records, read inscriptions, excavate archaeological sites, make sense of beads and bones, interpret the epics, look at the stupas and buildings, examine paintings and photographs, interpret police reports and revenue records, and listen to the voices of the past. Each theme will explore the peculiarities and possibilities of one particular type of source. It will discuss what a source can tell and what it cannot.

This is Part II, of *Themes in Indian History*. Part III will follow.

NEELADRI BHATTACHARYA
Chief Advisor, History

TEXTBOOK DEVELOPMENT COMMITTEE

CHAIRPERSON, ADVISORY COMMITTEE

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Calcutta, Kolkata

CHIEF ADVISOR

Neeladri Bhattacharya, *Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

ADVISORS

Kumkum Roy, *Associate Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Monica Juneja, Guest Professor, Institut Furgeschichte, Viennna, Austria

TEAM MEMBERS

Jaya Menon, *Reader,* Department of History, Aligarh Muslim University, Aligarh, UP (Theme 1)

Kumkum Roy (Theme 2)

Kunal Chakrabarti, *Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 3)

Uma Chakravarti, *Formerly Reader in History,* Miranda House, University of Delhi, Delhi (Theme 4)

Farhat Hassan, *Reader,* Department of History, Aligarh Muslim University, Aligarh, UP (Theme 5)

Meenakshi Khanna, *Reader in History,* Indraprastha College, University of Delhi, Delhi (Theme 6)

Vijaya Ramaswamy, *Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 7)

Rajat Datta, *Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 8)

Najaf Haider, *Associate Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University New Delhi (Theme 9)

Neeladri Bhattacharya (Theme 10)

Rudrangshu Mukherjee, *Executive Editor, The Telegraph*, Kolkata (Theme 11)

Partho Dutta, *Reader,* Department of History, Zakir Hussain College (Evening Classes), University of Delhi, Delhi (Theme 12)

Ramachandra Guha, *freelance writer,* anthropologist and historian, Bangalore (Theme 13)

Anil Sethi (Theme 14)

Sumit Sarkar, *Formerly Professor of History,* University of Delhi, Delhi (Theme 15)

Muzaffar Alam, *Professor of South Asian History,* University of Chicago, Chicago, USA

C.N. Subramaniam, *Eklavya,* Kothi Bazar, Hoshangabad

Rashmi Paliwal, *Eklavya,* Kothi Bazar, Hoshangabad

Prabha Singh, *P.G.T. History,* Kendriya Vidyalaya, Old Cantt., Telliarganj, Allahabad, UP

Smita Sahay Bhattacharya, *P.G.T. History,* Blue Bells School, Kailash Colony, New Delhi

Beeba Sobti, *P.G.T. History,* Modern School, Barakhamba Road, New Delhi

MEMBER-COORDINATORS

Anil Sethi, *Professor,* DESSH, NCERT, New Delhi

Seema Shukla Ojha, *Lecturer,* DESSH, NCERT, New Delhi

ACKNOWLEDGEMENTS

Themes in Indian History, Part II has, like *Part I*, benefited from the enthusiastic participation and help of many people and institutions, whom it is a pleasure to thank.

For valuable and extensive comments on draft chapters we are immensely grateful to John Fritz, Sunil Kumar and Supriya Varma. We would also like to thank Meena Bhargava, Ranabir Chakravarti, Ranjeeta Datta, Bharati Jagannathan and Nandita Prasad Sahai for their prompt help in clarifying issues. The suggestions made by the members of the Monitoring Committee, Prof. J. S. Grewal and Shobha Bajpai have been very useful.

Visual material for the book was provided by different individuals and institutions. Above all we wish to thank George Michell and John Fritz for their generosity in allowing us to draw upon their rich pool of resources on Vijayanagara.

For careful copy-editing and reading of proofs we gratefully acknowledge the efforts of Shyama Warner. Thanks are equally due to Ritu Topa and Animesh Roy of Arrt Creations, New Delhi, who designed the book with patience and skill. K. Varghese of Jawaharlal Nehru University provided the maps. Albinus Tirkey and Manoj Haldar offered technical support. Samira Varma has been a help in many valuable ways, not least by remaining cheerful throughout.

Finally, we look forward to feedback from the users of the book, which will help us improve it in subsequent editions.

সূচিপত্র

ভাগ II *

বিষয়বস্তু পঞ্চম

পর্যটকদের নজরে — 115
সমাজ সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি
(আনুমানিক দশম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

বিষয়বস্তু ষষ্ঠ

ভক্তি ও সুফিবাদের ঐতিহ্য — 140
ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিবর্তন এবং ভক্তিমূলক গ্রন্থ
(আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

বিষয়বস্তু সপ্তম

একটি সাম্রাজের রাজধানী বিজয়নগর — 170
(চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী)

বিষয়বস্তু অষ্টম

কৃষক, জমিদার এবং রাষ্ট্র — 196
কৃষি ভিত্তিক সমাজ এবং মোগল সাম্রাজ্য
(আনুমানিক ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী)

বিষয়বস্তু নবম

সম্রাট এবং তাঁদের ইতিহাস — 224
মোগল দরবার
(ষোড়শ - সপ্তদশ শতাব্দী)

ভাগ III*

বিষয়বস্তু দশম

ঔপনিবেশবাদ এবং গ্রামাঞ্চল
সরকারি নথিপত্রের অনুসন্ধান তথা বিশ্লেষণ

বিষয়বস্তু একাদশ

ব্রিটিশ রাজত্ব এবং বিদ্রোহীরা
1857 -এর মহাবিদ্রোহ এবং এর বিবরণ

* Part III will follow

বিষয়বস্তু দ্বাদশ
ঔপনিবেশিক নগরগুলো
নগরায়ণ, পরিকল্পনা এবং স্থাপত্য

বিষয়বস্তু ত্রয়োদশ
মহাত্মা গান্ধি এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন
আইন অমান্য এবং তার পরবর্তী ঘটনা

বিষয়বস্তু চতুর্দশ
বোঝাপড়ার মাধ্যমে দেশবিভাগ
রাজনৈতিক, স্মৃতিশক্তি, অভিজ্ঞতা

বিষয়বস্তু পঞ্চদশ
সংবিধান প্রণয়ন
এক নতুন যুগের সূচনা

ভাগ I

বিষয়বস্তু এক
ইট, পুঁতি ও অস্থিসমূহ
হরপ্পা সভ্যতা

বিষয়বস্তু দুই
রাজা, কৃষক এবং শহর
প্রারম্ভিক রাজ্য এবং অর্থনীতি
(600 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে 600 খ্রিস্টাব্দ)

বিষয়বস্তু তিন
সম্পর্ক, বর্ণ এবং শ্রেণি
প্রারম্ভিক সমাজ
(আনুমানিক 600 খ্রি. পূ. থেকে 600 খ্রীষ্টাব্দে)

বিষয়বস্তু চার
চিন্তাবিদ, বিশ্বাস এবং ইমারতসমূহ
সাংস্কৃতিক বিকাশ
(আনুমানিক 600 খ্রিস্ট পূর্বাব্দ
থেকে 600 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

HOW TO USE THIS BOOK

This is Part II of *Themes in Indian History*. Part III will follow.

☑ Each chapter is divided into numbered sections and subsections to facilitate learning.

☑ You will also find other material enclosed in boxes.

These contain:

Short meanings	**Additional information**	**More elaborate definitions**

These are meant to assist and enrich the learning process, but are ***not intended for evaluation.***

☑ Each chapter ends with a set of ***timelines***. This is to be treated as background information, and ***not for evaluation***.

☑ There are ***figures, maps*** and ***sources*** numbered sequentially through each chapter.

(a) **Figures** include illustrations of artefacts such as tools, pottery, seals, coins, ornaments etc. as well as of inscriptions, sculptures, paintings, buildings, archaeological sites, plans and photographs of people and places; visual material that historians use as sources.

(b) Some chapters have **maps**.

Sources

(c) **Sources** are enclosed within separate boxes: these contain excerpts from a wide variety of texts and inscriptions. Both visual and textual sources will help you acquire a feel for the clues that historians use. You will also see how historians analyse these clues. **The final examination can include excerpts from and/or illustrations of identical/similar material, providing you with an opportunity to handle these.**

☑ There are *two* categories of ***intext questions:***

(a) those within a yellow box, which may be used for practice for ***evaluation***.

(b) those with the caption ➲ Discuss... which are ***not for evaluation***

☑ There are ***four types*** of assignments at the end of each chapter:
These include:

short questions

short essays

map work

projects

These are meant to provide practice for the final assessment and evaluation.

Hope you enjoy using this book.

বিষয়বস্তু
পাঁচ

পর্যটকদের নজরে

সমাজ সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি
(আনুমানিক দশম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

নারী এবং পুরুষরা জীবিকার সন্ধানে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে ব্যবসায়ী, সৈনিক, পুরোহিত, তীর্থযাত্রী হিসেবে অথবা দুঃসাহসিক অভিযানের তাড়নায় ভ্রমণ করত। যারা নতুন জায়গায় বেড়াতে আসে অথবা নতুন জায়গায় বসতি স্থাপন করতে আসে তাদের এমন একটি জগতের মুখোমুখি হতে হয়, যেখানে প্রাকৃতিক ভূমিরূপ এবং পরিবেশের পাশাপাশি সেই জায়গার রীতিনীতি, ভাষা, বিশ্বাস এবং আচার-আচরণও ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এইসব পার্থক্যগুলো মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন, আবার কেউ কেউ একটু ব্যাতিক্রমী হন, সাধারণত যেই সব বিষয়কে তাঁরা অভিনব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে করেন সেইসব বিষয় যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, মহিলাদের দ্বারা লিখিত কোনো ভ্রমণবৃত্তান্ত আমাদের কাছে নেই, যদিও আমরা জানি যে, তারাও ভ্রমণ করত।

চিত্র 5.1a : পানপাতা

যেসব ভ্রমণবৃত্তান্ত আমরা সুরক্ষিত অবস্থায় পেয়েছি, সেগুলো প্রায়শই বিষয় বৈচিত্র্য ভরপুর। কেউ কেউ রাজ দরবারের বিষয় নিয়ে লিখেছেন, আবার কেউ কেউ মূলত ধর্মীয় বিষয়ে বা স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য এবং স্মৃতিস্তম্ভের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয়নগর (সপ্তম অধ্যায়) শহর সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণের মধ্যে একটি হিরাট থেকে আগত আব্দুর রেজ্জাক সমরখন্ডী নামক একজন কূটনৈতিকের বিবরণ থেকে পাওয়া যায়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে, ভ্রমণকারীরা দূরবর্তী অঞ্চলে যান নি। উদাহরণস্বরূপ, মোঘল সাম্রাজ্যের (অষ্টম অধ্যায় ও নবম অধ্যায়) প্রশাসকরা কখনো কখনো সাম্রাজ্যের ভেতরের অঞ্চলেই ভ্রমণ করতেন এবং তাঁরা যা পর্যবেক্ষণ করতেন, তা লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের নিজেদের দেশের জনপ্রিয় রীতিনীতি তথা লোকাচারবিদ্যা এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন।

এই অধ্যায়ে আমরা ভারতীয় উপমহাদেশে বেড়াতে আসা ভ্রমণকারীদের দ্বারা প্রদত্ত সামাজিক জীবনের বিবরণের অধ্যয়ন করে কীভাবে আমাদের অতীত সম্পর্কে জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে পারি। এ বিষয়ে তিনজন ব্যক্তির ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রতিও আমরা আলোকপাত করব। এদের মধ্যে একজন 'আলবিরুনী', যিনি উজবেকিস্তান থেকে এসেছিলেন (একাদশ শতাব্দী), অপরজন – 'ইবন বতুতা' যিনি উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার মরোক্কো থেকে এসেছিলেন (চতুর্দশ শতাব্দী) এবং তৃতীয় জন – ফ্রাঙ্কোয়িস বার্নিয়ার (সপ্তদশ শতাব্দী) যিনি ফ্রান্স থেকে এসেছিলেন।

চিত্র 5.1b
অনেক পর্যটকেরই দৃষ্টি আকর্ষন করে।

উৎস 1

আল বিরুনীর উদ্দেশ্য

আল-বিরুনী এভাবে তাঁর কাজের বর্ণনা দিয়েছেন :

যারা তাদের (হিন্দুদের) সাথে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চায় এই বইটি তাদের সাহায্য করবে এবং যারা এদের (হিন্দুদের) সাথে মেলামেশা করতে চায় তাদের জন্য তথ্য প্রদান তার লক্ষ্য।

➲ আল-বিরুনীর (উৎস পাঁচ) উদ্ধৃতাংশটি পাঠ করো এবং আলোচনা কর যে তার লক্ষ্য পূরণ হয়েছে কি?

গ্রন্থের অনুবাদ, মতের আদান প্রদান

বিভিন্ন ভাষার দক্ষতা থাকার দরুন আল-বিরুণী বিভিন্ন ভাষার তুলনা এবং গ্রন্থেরও অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি পতঞ্জলীর ব্যাকরণ সহ অনেক সংস্কৃত রচনা আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তার ব্রাহ্মণ বন্ধুদের জন্য তিনি ইউক্লিডের (একজন গ্রীক গণিতজ্ঞ) রচনাগুলো সংস্কৃত ভাষায় করেছেন।

এই লেখকরা বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে এসেছেন, ফলে এইসব লেখকরা দৈনন্দিন কাজকর্ম ও রীতি সম্পর্কে আরো বেশী মনোযোগী ছিলেন। তবে দেশীয় লেখকদের জন্য এই সব বিষয় ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় যা তাদের মতে লিপিবদ্ধ করার মত উপযুক্ত বিষয় নয়। দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যগুলোই পর্যটকদের বিবরণকে অধিক আকর্ষনীয় করে তোলে। এই পর্যটকরা কাদের জন্য লিখেছিলেন? যেমন আমরা দেখতে পাব, এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম উত্তর পাওয়া যাবে।

1. আল-বিরুনী এবং *কিতাব-উল-হিন্দ*

1.1 খোয়ারিজম থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত

আল-বিরুনী 973 খ্রিস্টাব্দে খোয়ারিজম-এ জন্মগ্রহণ করেন, যা বর্তমানে উজবেকিস্তান নামে পরিচিত। খোয়ারিজম একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল এবং আল-বিরুনী সেই সময়ে বিদ্যমান সব শিক্ষাই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে পারতেন। যেমন- সিরিয়, আরবী, ফার্সী, হিব্রু এবং সংস্কৃত ভাষা। যদিও তিনি গ্রিক ভাষা জানতেন না, তবুও আরবী অনুবাদের মাধ্যমে তিনি প্লেটো সহ অপরাপর গ্রীক দার্শনিকের তত্ত্ব ও চিন্তার সাথে পরিচিত হন। 1017 খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ যখন খোয়ারিজম আক্রমণ করেন, তখন তিনি সেখানকার বেশ কয়েকজন পণ্ডিতব্যক্তি ও কবিদের তাঁর সাথে তাঁর রাজধানী গজনীতে নিয়ে এসেছিলেন। আল-বিরুনী ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি বন্দী হয়ে গজনী এসেছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে এই শহরটিকে পছন্দ করতে শুরু করেন এবং সত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি নিজের বাকী জীবন গজনীতেই কাটিয়েছেন।

গজনীতে থাকাকালীণ আল-বিরুনীর ভারতের প্রতি আগ্রহ গড়ে ওঠে। এটি কোন আশ্চর্য ঘটনা ছিল না। অষ্টম শতাব্দী থেকে সংস্কৃত ভাষায় জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত এবং চিকিৎসা সম্পর্কিত রচনাগুলো আরবী ভাষায় অনুবাদ শুরু হয়। যখন পাঞ্জাব গজনভী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে স্থানীয় জনগণের সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যা পারস্পরিক আস্থা ও বোঝাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। আল-বিরুনী ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও পণ্ডিতদের সাথে অনেক বছর অতিবাহিত করেন এবং সংস্কৃত, ধর্ম এবং দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। যদিও তাঁর ভ্রমণ পথের সঠিক দিশা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, সম্ভবত তিনি পাঞ্জাব এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছেন।

যে সময়ে আলবিরুনী তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন, আরবী ভাষায় তখন ভ্রমণ সাহিত্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার করে নিয়েছে। এই সব ভ্রমণবৃত্তান্তগুলো পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি থেকে উত্তরে ভল্গা নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা সম্পর্কিত ছিল। তাই 1500

খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ভারতের খুব কম লোকই আল-বিরুনীর রচনা পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। তবে ভারতের বাইরের অনেকেই ততদিনে তা পড়ে ফেলেছেন।

1.2 কিতাব-উল-হিন্দ

আরবী ভাষায় লিখিত আল-বিরুনীর 'কিতাব-উল-হিন্দ'-এর ভাষা সহজ এবং সুস্পষ্ট। এটি একটি বিশাল গ্রন্থ, যা ধর্ম এবং দর্শন, উৎসব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মধ্যযুগীয় রসায়ন-শাস্ত্র, আচার-আচরণ, সামাজিক জীবন, ওজন ও পরিমাপ, মূর্তিশিল্প, আইনবিদ্যা, পরিমাপবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে আশিটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

সাধারণত, (যদিও সব সময় নয়), আল-বিরুনী প্রত্যেক অধ্যায়ে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যেখানে শুরুতে একটি প্রশ্ন করা হত, তারপর সংস্কৃতি গ্রন্থাদিতে এর উত্তর অনুসন্ধান করেছেন আবার পরিশেষে ভিন্নতর সংস্কৃতির সাথে এর তুলনা করেছেন। বর্তমান যুগের কিছু পণ্ডিত যুক্তি দেখিয়েছেন যে এই ধরনের প্রায় জ্যামিতিক কাঠামোর ব্যবহার যা নিজের যথার্থতা এবং পূর্বানুমান যোগ্যতার জন্য উল্লেখযোগ্য, তার মুখ্য কারন হচ্ছে আল-বিরনীর গণিতের প্রতি অধিক ঝোঁক।

আল-বিরুনী, সম্ভবত সেই সমস্ত লোকেদের কথা মাথায় রেখে আরবি ভাষায় গ্রন্থ লেখেন যারা উপমহাদেশের এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। তিনি সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত গ্রন্থের আরবী ভাষায় অনুবাদ ও গ্রহণ করা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এর মধ্যে রূপকথা থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু, এই গ্রন্থগুলোর লিখন-শৈলী সম্পর্কে তিনি সমালোচনা করেছেন এবং তিনি নি:সন্দেহে সেগুলোর উন্নতিসাধন করতে চেয়েছিলেন।

পরিমাপের বিজ্ঞান হল পরিমাপনবিদ্যা (*Metrology*)।

হিন্দু

'হিন্দু' শব্দটি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে ব্যবহৃত একটি প্রাচীন ফার্সী শব্দ থেকে নেওয়া, যার দ্বারা সিন্ধু নদীর (Indus) পূর্ব অংশকে বোঝানো হত। আরবীয়রা ফার্সী ভাষাই ব্যবহার করত এবং এই অঞ্চলকে 'অল-হিন্দ' তথা এখানকার বাসিন্দাদের 'হিন্দী' বলে অভিহিত করত। পরবর্তীকালে তুর্কীরা সিন্ধু নদের পূর্বদিকের অধিবাসীদের 'হিন্দু' তথা তাদের বাসভূমিকে হিন্দুস্তান এবং তাদের ভাষাকে 'হিন্দবি' নামে অভিহিত করত। এই শব্দগুলোর কোনটাই তাদের ধর্মীয় পরিচয় বহন করত না। বহুবছর এই শব্দটি ধর্মীয় অর্থে ব্যবৃহত হতে শুরু হয়।

➲ আলোচনা কর ....

আল-বিরুনী যদি একবিংশ শতাব্দীতে বেঁচে থাকতেন এবং তাঁর যদি সেই একই ভাষাগুলো জানা থাকত তবে বিশ্বের কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই ভাষাগুলো সহজে বুঝতে পারা যেত?

চিত্র 5.2

ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরবী পাণ্ডুলিপির একটি চিত্র যেখানে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর এথেন্স এর রাষ্ট্রনেতা এবং কবি সোলানকে তার ছাত্রদের পাঠদানরত অবস্থায় দেখানো হচ্ছে সোলান এবং ছাত্রদের পোশাকগুলো ভাল করে লক্ষ্য করো।

➲ এই পোশাকগুলো গ্রীক না আরবীয়?

উৎস 2

নীড় ছেড়ে যাওয়া পাখী

এটি 'রিহ্‌লা' থেকে নেওয়া একটি উদ্ধৃতাংশ

> আমার জন্মস্থান তাঞ্জিয়ার থেকে আমার প্রস্থান হয়ে বৃহস্পতিবারে ..... আমি একাই রওয়ানা হয়েছি সহযাত্রীও কেউ নেই, না কোনও মরু অভিযাত্রী যাদের দলে আমি যুক্ত হতে পারি, কিন্তু আমার মধ্যে অদম্য আকাঙ্খা এবং সেই পুণ্যস্থানগুলো ঘুরে দেখার ইচ্ছা অনেকদিন ধরেই ছিল। তাই আমি আমার সব প্রিয় পুরুষ ও নারীদের ছেড়ে যাওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিই এবং যেভাবে পাখী তার নীড় ছেড়ে যায় সেভাবেই আমি আমার গৃহ ত্যাগ করি.... সেই সময় আমার বয়স ছিল বাইশ বছর।

বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করার আনুমানিক 30 বছর পর ইবন বতুতা 1354 খ্রিস্টাব্দে বাড়ি ফিরে আসেন।

চিত্র 5.3
ষোড়শ শতাব্দীর একটি মুঘল চিত্র, যেখানে দেখা যাচ্ছে ডাকাতরা যাত্রীদের উপর আক্রমন করছে।

➲ তুমি ডাকাতদের থেকে যাত্রীদের কীভাবে আলাদাকরে চিহ্নিত করবে?

2. ইবন বতুতার রিহ্‌লা

2.1 এক প্রারম্ভিক বিশ্বঅভিযাত্রী (globe-trotter)

ইবন বতুতার দ্বারা আরবী ভাষায় রচিত তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তের বই 'রিহলা'-তে চতুর্দশ শতাব্দীর ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং আকর্ষণীয় বিবরণ পাওয়া যায়। মরক্কোর এই পর্যটক তাঞ্জিয়ারের এক অতি সম্মানীয় এবং শিক্ষিত পরিবারে জন্ম করেছিলেন, যে পরিবার ইসলামী ধর্মীয় আইন বা শরিয়তে বিশেষজ্ঞতার জন্য পরিচিত ছিলেন। তাঁর পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী ইবন বতুতা খুব অল্প বয়সেই সাহিত্য ও শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যেপূর্ণ শিক্ষা অর্জন করেছিলেন।

তিনি জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার চাইতে ভ্রমণের উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি ভ্রমণ করতে পছন্দ করতেন এবং নতুন নতুন দেশ এবং মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য দূর দূরান্তে গিয়েছিলেন। 1332-33 খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতে আসার আগে মক্কায় হজ যাত্রা করেন এবং সিরিয়া, ইরাক, পার্সিয়া, ইয়েমেন, ওমান এবং পূর্ব আফ্রিকার কিছু উপকূলীয় বাণিজ্যিক বন্দরেও ভ্রমণ করেন।

মধ্য এশিয়া হয়ে ইবন বতুতা 1333 খ্রিস্টাব্দে স্থলপথে সিন্ধ-এ পৌঁছান। তিনি দিল্লীর সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের কথা শুনেছিলেন এবং কলা ও সাহিত্যের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাঁর খ্যাতিতে আকর্ষিত হয়ে বতুতা মুলতান এবং উচ-এর রাস্তার হয়ে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, সুলতান তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দিল্লীর কাজী বা বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি বেশ কয়েকবছর এই পদে ছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি সুলতানের আনুকূল্য হারান এবং তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। পরবর্তীকালে সুলতান এবং তাঁর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়ে গেলে তাকে রাজকীয় সেবাতে পুন:নিয়োগ করা হয় এবং 1342 খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মোঙ্গল শাসকের কাছে সুলতানের দূত হিসেবে চিন যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর ইবন বতুতা মধ্য ভারত হয়ে মালাবার উপকূলে গিয়ে পৌঁছান। মালাবাল থেকে তিনি মালদ্বীপ যান যেখানে তিনি কাজী বা বিচারক হিসেবে আঠারো মাস অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীকালে তিনি আবার মালাবার উপকুল এবং মালদ্বীপে যান এবং চিনের উদ্দেশ্যে আবার তাঁর যাত্রা শুরু করার আগে তিনি বাংলা এবং আসামও সফর করেছিলেন। তিনি জাহাজে সুমাত্রা গিয়েছিলেন এবং সুমাত্রা থেকে তিনি অন্য একটি জাহাজে চিনের একটি বন্দর নগর জায়তুন (বর্তমানে

চিত্র 5.4
যাত্রীবহনকারী একটি নৌকা, বাংলার একটি মন্দিরের পুরামাটির ভাস্কর্য (আনুমানিক সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর)।

কোয়ানঝু নামে পরিচিত) পৌছান। তিনি চিনে বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করতে করতে বেজিং পর্যন্ত গিয়েছিলেন, তবে তিনি বেশীদিন সেখানে অবস্থান করেননি। 1347 খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর লেখা ভ্রমণ বৃত্তান্তটি প্রায়শই মার্কোপোলোর বৃত্তান্তের সাথে তুলনা করা হয়, যিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নিজের বাসভূমি ভেনিস থেকে চিন (এবং ভারতবর্ষ) যাত্রা করেছিলেন।

ইবন বতুতা নতুন সংস্কৃতি, জনগণের, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণকে সাবধানতার সাথে নথিভুক্ত করেছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে এই বিশ্ব অভিযাত্রী চতুর্দশ শতাব্দীতে ভ্রমণ করেছিলেন, যা বর্তমান যুগে ভ্রমণ করার থেকে অনেক বেশী কষ্টকর এবং বিপজ্জনক ছিল। ইবন বতুতার বর্ণনা অনুযায়ী মুলতান থেকে দিল্লী যেতে চল্লিশ দিন এবং সিন্ধ থেকে দিল্লী যেতে পঞ্চাশ দিন সময় লেগেছিল। দৌলতাবাদ থেকে দিল্লী যেতে চল্লিশদিন সময় লাগত, যেখানে গোয়ালিয়র থেকে দিল্লী দশদিনে যাওয়া যেত।

➲ কোন কোন পর্যটকের অস্ত্র বহন করা সম্পর্কে তোমার কী ভাবনা?

নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী

দীর্ঘ ভ্রমণপথে ডাকাতরাই একমাত্র ভয়ের কারণ ছিল না, যাত্রীরা দেশে ফেরার জন্য কাতর বা অসুস্থ হয়ে পড়তো। এটি 'রিহলা' থেকে নেওয়া একটি উদ্ধৃতাংশ :

> আমি জ্বরে আক্রান্ত হই এবং আমার ভয় ছিল সে নিজের শারীরিক দুর্বলতার কারণে আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে নীচে পড়ে যেতে পারি, তাই নিজেকে রক্ষা করার জন্য পাগড়ির কাপড়কে ঘোড়ার সাথে বেঁধে নিয়েছিলাম .... শেষ পর্যন্ত আমরা টিউনিস পৌঁছলাম এবং সেখানকার শহরবাসীরা, শেখ ..... এবং ..... কাজীর পুত্রকে স্বাগত জানাতে আসে...... তারা একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে লাগল সম্ভাষন জানালো এবং কুশল বিনিময় করল, তাদের মধ্যে কেউই আমাকে শুভেচ্ছা জানায়নি, কারণ তাদের কারোর সাথে আমার পরিচয় ছিল না। নিজের একাকিত্বের কারণে আমার মনে এত দুঃখ হল যে আমার চোখের জল আটকাতে পারিনি এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। তবে একজন তীর্থযাত্রী আমার কষ্টের কারণ বুঝতে পেরে আমার কাছে এগিয়ে আসেন এবং আমাকে শুভেচ্ছা জানান।

মানচিত্র 1 :
আফগানিস্তান, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে ইবন বতুতার দ্বারা পরিদর্শন করার স্থানসমহূ। অনেক জায়গার নামের বানান এমনভাবে লেখা হয়েছে যেমনভাবে ইবন বতুতা জানতেন।

➲ সুলতান এবং দিল্লীর মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করতে মানচিত্রের স্কেলটি ব্যবহার করো।

ভ্রমণ করাও অনেক অসুরক্ষিত ছিল : ইবন বতুতা অনেকবার ডাকাতদলের আক্রমণের শিকার হন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে একটি যাত্রীদলের সাথে ভ্রমণ করতে পছন্দ করতেন, তবে তাতেও রাজপথের ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়নি। মুলতান থেকে দিল্লী যাত্রার সময় তার যাত্রীদল আক্রান্ত হয় এবং তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই প্রাণ হারান। ইবন বতুতা সহ যারা প্রাণে বেঁচে যান, তারা গুরুত্বর আহত হয়েছিলেন।

2.2 কৌতূহল উপভোগ (enjoyment of curiosities)

আমরা দেখেছি, ইবন বতুতা একজন দৃঢ়চেতা অভিযাত্রী ছিলেন যিনি উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় তাঁর জন্মভূমি মরোক্কোতে ফিরে যাওয়ার আগে উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া এবং মধ্য এশিয়ার কিছু অংশ (হয়ত তিনি রাশিয়াতেও গিয়েছিলেন), ভারতীয় উপমহাদেশ এবং চিন ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি যখন তাঁর নিজ দেশে ফিরে এসেছিলেন তখন সেখানকার স্থানীয় শাসক তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন।

উৎস 3

শিক্ষা এবং বিনোদন

ইবন জুযাই, যাকে ইবন বতুতার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, তিনি ভূমিকায় লিখেছিলেন :

> (রাজা কর্তৃক) একটি উদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তিনি (ইবন বতুতা) তাঁর ভ্রমণকালে যে শহরগুলো দেখেছিলেন তাঁর বিবরণ এবং তাঁর স্মৃতিতে থাকা বিভিন্ন আকর্ষণীয় ঘটনাবলী, তিনি যেসব দেশের শাসকদের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন তাদের কথা বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এবং তাদের ধর্মীয় সাধু সন্তদের সম্পর্কে বিবরণ দেবেন। তদানুসারে, তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে থাকলেন, যা শুধু শ্রুতি-সুখকরই নয়, দৃষ্টিগ্রাহ্যও তার বর্ণনায় উজ্জ্বল ছবির মতো চোখের সামনে সব ফুটে উঠে। নানান কৌতুকপূর্ণ তথ্য সহ তিনি রোমাঞ্চকর সব বর্ণনা দিতে লাগলেন, যা সবার উৎসুক্য আরও বাড়িয়ে দিল।

ইবন বতুতার পদচিহ্নের অনুসরণ

1400 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1800 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতে আসা অভিযাত্রীগণ ফার্সি ভাষায় বেশ কয়েকটি ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন। একই সময়ে, ভারত থেকে যারা মধ্য এশিয়া, ইরান এবং অটোমান সাম্রাজ্য যাত্রা করেছিল তাঁরাও তাঁদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছিলেন। এই লেখকরা আল-বিরুনী এবং ইবন বতুতার পদচিহ্ন অনুসরণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্ববর্তী লেখকদের বিবরণও পড়েছিলেন।

এই লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন আবদুর রাজ্জাক সমরখন্দী যিনি 1440 এর দশকে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। মাহম্মদ ওয়ালি বল্কী, যিনি 1620 এর দশকে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন এবং শেখ অলী হাজিন যিনি 1740-এর দশকে উত্তর ভারতে এসেছিলেন। এদের মধ্যে কোনো কোনো লেখক ভারতের প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে মহম্মদ বাল্খী নামে একজন কিছু সময়ের জন্য এক ধরনের সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। আবার হাজিনের মতো ব্যক্তিরা প্রত্যাশিত রাজকীয় অভ্যর্থনা না পেয়ে হতাশ হয়েছিলেন, এমনকি বিরক্তিও প্রকাশ করেছিলেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতকে 'বিস্ময়ের দেশ' হিসেবে দেখেছেন।

চিত্র 5.5 : অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি চিত্র যেখানে অগ্নিকুণ্ডের (campfire) চারদিকে একত্রিত হওয়া যাত্রীদের দেখানো হয়েছে।

⇐ আলোচনা কর

আল-বিরুনী এবং ইবন বতুতার লিখিত বিবরণের উদ্দেশ্যের তুলনা করো।

চিত্র 5.6 :
সপ্তদশ শতাব্দীর একটি চিত্রে বার্নিয়েরকে ইউরোপীয় পোশাকে দেখানো হয়েছে।

3. ফ্রাঙ্কোস বার্নিয়ার : একজন ব্যাতিক্রমী চিকিৎসক

আনুমানিক 1500 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভারতবর্ষে পর্তুগীজদের আগমন হলে তাদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্মীয় প্রথা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিখেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন- জেসুইট রবার্তো নোবিলি ভারতীয় গ্রন্থগুলোকে ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদও করেন।

পর্তুগীজ লেখকদের মধ্যে দুয়ার্তে বারবোসা সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্য ও সমাজ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিখেছেন। পরবর্তীকালে 1600 খ্রিস্টাব্দের পর ভারতে আগত ওলন্দাজ ইংরেজ এবং ফরাসী পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন— স্বর্ণকার জাঁ ব্যাপটিস্ট ট্যাভার্নিয়ার, যিনি কমপক্ষে ছয়বার ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বিশেষ করে ভারতের বাণিজ্যিক পরিস্থিতি দেখে মুগ্ধ হন এবং ইরান ও অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে ভারতের তুলনা করেন। এদের মধ্যে কোনো কোনো অভিযাত্রী যেমন- ইতালীয় চিকিৎক মানুচ্চী ইউরোপে ফিরে যান নি এবং ভারতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

ফ্যাঙ্কোস বার্নিয়ার নামে একজন ফরাসী ব্যক্তি যিনি একাধারে একজন চিকিৎসক, রাজনৈতিক, দার্শনিক তথা ইতিহাসবিদও ছিলেন। অন্যান্যদের মতো তিনিও মুঘল সাম্রাজ্যে সুযোগের সন্ধানে এসেছিলেন। তিনি 1656 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1668 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বারো বছর ভারতে অবস্থান করেন এবং মুঘল রাজদরবারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথমে সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ দারা শিকোর চিকিৎসক হিসেবে এবং পরবর্তীকালে মুঘল দরবারের একজন আর্মেনিয়ান অভিজাত ড্যানিশম্যাণ্ড খানের সাথে একজন বুদ্ধিজীবি এবং বিজ্ঞানী হিসেবে যুক্ত হন।

3.1 পূর্ব ও পশ্চিম তুলনা

বার্নিয়ার দেশের বেশ কয়েকটি জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন এবং তিনি যা দেখেছিলেন তা তিনি লিপিবদ্ধ করেন এবং তা ইউরোপের পরিস্থিতির সাথে তুলনা করতেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলো লেখা ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং তাঁর অন্যান্য রচনাসমূহ প্রভাবশালী কর্মকর্তা এবং মন্ত্রীদের নিকট প্রেরিত চিঠির আকারে লিখেছিলেন বার্নিয়ার তাঁর প্রায় প্রতিটি বিবরণে ভারতের পরিস্থিতিকে ইউরোপের উন্নয়নের তুলনায় বিবর্ণ হিসেবে দেখিয়েছেন। আমরা দেখব যে তাঁর এই মূল্যায়ন সব সময় সঠিক ছিল না। যাই হোক, যখন বার্নিয়ারের রচনাগুলো প্রকাশিত হয়, তখন সেগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়।

চিত্র 5.7 :
ভারতীয় পোশাকে টেভার্নিয়র—এর একটি চিত্র

উৎস 4

মোঘল সেনাবাহিনীর সাথে ভ্রমণ

বার্নিয়ার প্রায়শই সেনাবাহিনীর সাথে ভ্রমণ করতেন। এখানে সেনাবাহিনীর কাশ্মীর যাত্রা সম্পর্কে লেখা তাঁর বর্ণনার একটি অংশ দেওয়া হল :

> এই দেশের প্রথা অনুযায়ী এটা প্রত্যাশা করা হয় যে আমার দুটো তেজী তুর্কি ঘোড়া থাকবে এবং আমি নিজের সাথে একটি শক্তিশালী পার্সিয়ান উট তথা চালক, আমার ঘোড়ার জন্য একজন সহিস, একজন পাচক তথা একজন সেবক রাখব যে হাতে জলের পাত্র নিয়ে আমার ঘোড়ার সামনে যাবে। আমাকে সব রকমের ব্যবহার্য জিনিস দেওয়া হয়েছে যেমন, মাঝারি আকারের একটি তাঁবু, একটি গালিচা চারটিহালকা বেতন দিয়ে তৈরি একটি মজবুত খাটিয়া, একটি বালিশ, একটি তোষক, খাওয়ার সময় ব্যবহার করার জন্য গোলাকৃতি চামড়ার টেবিল ঢাকনা, রঙিন কয়েকটি রুমাল, তিনটি ছোট ব্যাগে রান্না করার পাত্র। এইসবগুলো একটি বড় ঝোলায় রাখা এবং এই ঝোলাটি আবার খুব সুদৃঢ় এবং দুটি প্রকোষ্টযুক্ত বা জাল এর মধ্যে রাখা যা চামড়ার ফালি দিয়ে তৈরী। এই দুই প্রকোষ্ঠ যুক্ত থলেতে মনিব এবং চাকর উভয়েরই খাদ্য সামগ্রী, পট্টবস্ত্র পোশাক পরিচ্ছদ রাখা। আমি পাঁচ-ছয়দিনের খাওয়ার জন্য ভালো চাল, মৌরিক (এক ধরনের গাছ) গন্ধযুক্ত মিষ্টি বিস্কুট, লেবু এবং চিনি মজুদ রেখেছি। আমি দই জল বের করার জন্য ছোটো লোহার হুক যুক্ত ঝোলা নিতেও ভুলিনি। এই দেশের লেবুর শরবত এবং দই এর মতো চনমনে পানীয় আর নেই।

➲ আজকাল ভ্রমণের সময় বার্ণিয়ার দ্বারা তালিকাভুক্ত কোন্ কোন্ জিনিস তুমি সঙ্গো নিয়ে যাবে ?

ভারত বিষয়ক তত্ত্ব সৃষ্টি এবং প্রচার

গ্রন্থমুদ্রণ ও প্রচারের মাধ্যমে ইউরোপীয় পর্যটকরা ইউরোপীয় দেশবাসীর মনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে 1750 খ্রিস্টাব্দের পর যখন শেখ ইতিসামসুদ্দিন এবং মির্জা আবু তালিবের মতো ভারতীয়রা ইউরোপ সফর করেন তখন তাঁরা ইউরোপীয়দের মনে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে এই ধারণার মুখোমুখি হন এবং তাঁরা নিজস্ব যুক্তির মাধ্যমে ধারণাগুলোকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

বার্ণিয়ারে রচনাসমূহ 1670-71 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যেই ইংরেজী, ওলন্দাজ, জার্মান এবং ইতালিয় ভাষায় তা অনুমোদিত হয়। 1670 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1725 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর রচনা ফরাসী ভাষায় আটবার এবং 1684 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজী ভাষায় তিনবার পুনঃমুদ্রিত হয়। অন্যদিকে আরবী ও ফরাসী গ্রন্থগুলোর সঙ্গো পার্থক্য ছিল যে, এই বৃত্তান্তগুলো পাণ্ডুলিপি হিসেবে প্রচারিত হয়েছিল। সেগুলো সাধারণত 1800 খ্রিস্টাব্দের আগে মুদ্রিত আকারে প্রকাশত হয়নি।

➲ আলোচনা করো :

ভারতীয় ভাষায় প্রচুর সমৃদ্ধ ভ্রমণ সাহিত্য রয়েছে। তুমি বাড়িতে যে ভাষায় কথা বল সে ভাষার ভ্রমণ কাহিনীর লেখকদের খুঁজে বের করো। এই জাতীয় একটি বৃত্তান্ত পড় এবং পর্যটক দ্বারা পরিদর্শন করা অঞ্চলগুলো অর্থাৎ তিনি যা দেখেছেন এবং তিনি কেন এই বৃত্তান্ত লিখেছেন, সে সম্পর্কে লিখো।

4. এক অপরিচিত বিশ্বের অনুধাবন আল-বিরুনী এবং সংস্কৃত ঐতিহ্য

4.1 উপলব্ধির ক্ষেত্রে বাধা অতিক্রমণ

আমরা দেখেছি, পর্যটকরা এই উপমহাদেশে যা দেখেছিলেন, প্রায়শই সেগুলোর তুলনা সেইসব প্রথাগুলোর সাথে করেন যেগুলোর সাথে তারা পরিচিত ছিলেন। পর্যটকদের মধ্যে প্রত্যেকেই তারা যা দেখেছেন তা বোঝার জন্য পৃথক কৌশল অবলম্বন করতেন। উদাহরণস্বরূপ, আল-বিরুনী নিজের জন্য নির্ধারিত কাজের সাথে যুক্ত অনুষঙ্গিক সমস্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি 'প্রতিবন্ধকতা' নিয়ে আলোচনা করেছিলেন যেগুলো তাঁর মতে উপলব্ধির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। এর মধ্যে প্রথম প্রতিবন্ধকতা ছিল ভাষা। তাঁর মতে সংস্কৃত ভাষা আরবী ও ফারসি থেকে এতটাই ভিন্ন ছিল যে এক ভাষার ধারণা ও মতামত কে অন্য একটি ভাষায় অনুবাদ করা সহজ ছিল না।

তাঁর দ্বারা চিহ্নিত দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হল ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রীতি নীতির পার্থক্য। তাঁর মতে তৃতীয় প্রতিবন্ধকতা হল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্ব-অভিমান এবং সংকীর্ণমানসিকতা। মজার বিষয় হল, যদিও এই সব সমস্যাগুলো সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন, তা সত্ত্বেও আল-বিরুনী প্রায় সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণদের রচনার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি ভারতীয় সমাজকে বোঝাবার জন্য প্রায়শই বেদ, পুরাণ, ভগবত গীতা, পতঞ্জলীর রচনাসমূহ, মনুস্মৃতি ইত্যাদির উদ্ধৃতাংশ তুলে ধরতেন।

4.2 বর্ণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে আল-বিরুণীর বিবরণ ঃ

ভিন্নতর সমাজের উদাহরণ সামনে রেখেই আল বিরুণী এ দেশের জাতিভেদ প্রথার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে প্রাচীন পারস্য দেশের চারটি সামাজিক শ্রেণিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, যথা- অভিজাত এবং শাসক শ্রেণি সন্ন্যাসী, আনুষ্ঠানিক পুরোহিত ও আইনজীবী, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ তথা অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ এবং পরিশেষে কৃষক এবং কারিগর। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি বলতে চেয়েছেন যে সামাজিক বর্ণ বিভাজন শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমিত ছিল না। এর সাথে তিনি এটিও উল্লেখ করেছিলেন যে, ইসলাম ধর্মে যেখানে সব মানুষকে সমান মর্যাদা দেওয়া হত সেখানেও শুধুমাত্র তাদের ধর্মনিষ্ঠার উপর নির্ভর করে তাদের পার্থক্য করা হত।

বর্ণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যাখ্যা মেনে নিলেও আল-বিরুণী এই ব্যবস্থাকে সামাজিক দূষণ হিসেবেই দেখেছেন যা কিছুতেই প্রদূষণ ঘটে তা বিশুদ্ধতার জন্য আবার পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে চায়। সূর্য আবহাওয়া শোধন করে, সমুদ্রের

বিশাল পরিশ্রম যুক্ত একটি ভাষা

সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে আল-বিরুনী বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

> যদি তুমি এই প্রতিবন্ধকতা (সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা) থেকে উত্তীর্ণ হতে চাও তবে তা খুব সহজ সাধ্য হবে না?। কারণ সম্ভাবনাপূর্ণ এই ভাষা বিচিত্র শব্দ সম্ভার এবং পদবৈচিত্র্য পরিপূর্ণ। আরবি ভাষার মত এই ভাষাতেও অনেক সহজ একটি জিনিস বোঝাতে একাধিক শব্দের ব্যবহার রয়েছে এবং এতে মূল শব্দ ছাড়াও রূপান্তরিত শব্দের বিভিন্ন রকমের আছে। আবার কখনো একটি মাত্র শব্দ দিয়ে বহু কিছু বোঝানো হয়েছে। সব কিছু সম্যকভাবে অনুধাবন করতে গেলে ভাষাটিকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং জটিলতা থেকে মুক্ত করতে হবে।

ঈশ্বরই জানেন!

পর্যটকদের যা বলা হত তারা সব সময় তা বিশ্বাস করতেন না। আল-বিরুণী যখন এমন একটি কাঠের মূর্তির কাহিনী জানতে পাললেন যা তথাকথিতভাবে 216,432 বছরের পুরানো ছিল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

> তাহলে এত দীর্ঘ সময় ধরে এই কাঠটির অস্তিত্ব কীভাবে রয়েছে, বিশেষত এমন জায়গায় যেখানে বাতাস এবং মাটি অনেকটাই স্যাঁতসেতে। তিনি নিজেই উত্তরে বলেন, ঈশ্বরই জানেন!

লবণ জলকে দূষিত হতে দেয় না। আল-বিরুণী জোর দিয়ে বলেছিলেন যদি তা না হত তাহলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব হত। তাঁর মতে, সামাজিক দূষণের ধারণা, বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত, এটি প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ।

উৎস 5

বর্ণ ব্যবস্থা

আল-বিরুণী বর্ণ ব্যবস্থাকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

সবচেয়ে উঁচু বর্ণ হল ব্রাহ্মণ, যাদের সম্পর্কে হিন্দুদেব গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে তাঁরা ব্রহ্মার মস্তক থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন এবং যেহেতু ব্রহ্মা প্রকৃতি নামক শক্তির অপর নাম এবং মাথা ....শরীরের সবচেয়ে উপরের অংশ, তাই ব্রাহ্মণ হচ্ছে সব বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই হিন্দুরা সমগ্র মানবজাতির মধ্যে তাদের সবচেয়ে উত্তম বলে মনে করে পরবর্তী বর্ণ হল ক্ষত্রিয়, বলা হয়ে থাকে তাদের উৎপত্তি হয়েছে ব্রহ্মার কাঁধ এবং হাত থেকে। তাদের স্থান ব্রাহ্মণদের থেকে খুব নীচু ছিল না।

তাদের পরে রয়েছে বৈশ্য বর্ণ যারা ব্রহ্মার উরু থেকে সৃষ্টি।

শূদ্র, যাদের উৎপত্তি হয়েছিল ব্রহ্মার পা থেকে।

শেষোক্ত দুই বর্ণের মধ্যে খুব বেশী ব্যবধান ছিল না। কিন্তু এই বর্ণগুলো একে অপরের থেকে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও, তারা একই শহর ও গ্রামে একই রকম বাড়িতে একসাথে মিলেমিশে বসবাস করে।

➲ আল-বিরুণী যা লিখেছেন তার সাথে তৃতীয় অধ্যায়ের 6 নং উৎসের তুলনা করো। তুমি কি কোনো মিল এবং পার্থক্য লক্ষ্য করেছ? তুমি কি মনে কর আল-বিরুণী ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে জানা ও বোঝার জন্য কেবল সংস্কৃত গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছিলেন।

আমরা দেখেছি, বর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে আল-বিরুণীর বিবরণ তাঁর আদর্শস্থাপনকারী সংস্কৃত গ্রন্থগুলোর অধ্যয়নের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল, এই সব গ্রন্থগুলোতে ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার বিধিগুলো লিপিবদ্ধ ছিল। তবে, বাস্তব জীবনে এই ব্যবস্থা এতটা অনমনীয় ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, অন্ত্যজ (আক্ষরিকভাবে, নিয়মের বাইরে জমানো) নামক শ্রেণি থেকে প্রত্যাশা করা হত যে তারা কৃষক ও জমিদার উভয়কেই সস্তায়শ্রম দান করার (অষ্টম অধ্যায় দেখে)। অন্যভাবে বলা যায়, যদিও প্রায়শই তাদের সামাজিক নীপিড়নের শিকার হতে হত। তবু তারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

➲ আলোচনা করো ঃ

অন্য অঞ্চল থেকে আসা ভ্রমণকারীদের জন্য আঞ্চলিক ভাষার জ্ঞান থাকাটা কতটুকু জরুরী?

5. ইবনবতুতা এবং অজানাকে জানার আগ্রহ

ইবনবতুতা যখন দিল্লিতে আসেন সেই চতুর্দশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশ একটি আন্তর্জাতিক সংযোগ ব্যবস্থার আওতায় চলে আসে, যা পূর্বে চিন থেকে উত্তর পশ্চিমে আফ্রিকা এবং পশ্চিমে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। যদিও আমরা দেখেছি, ইবনবতুতা নিজেই ঐসব স্থান ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন। পবিত্র মন্দিরগুলো পরিদর্শন করেন, বিদ্বান ব্যক্তি এবং শাসকদের সান্নিধ্যে আসেন, অনেকবার কাজীর দায়িত্ব পালন করেন এবং শহুরে কেন্দ্রস্থলে থেকে নাগরিক সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হন, যেখানে আরবী, ফার্সী, তুর্কী এবং অন্য ভাষাভাষীর লোকেরা, নিজেদের মধ্যে চিন্তাধারা তথ্য ও নানাবিধ কাহিনী আদান প্রদান করত। এই কাহিনীগুলোতে ধর্মনিষ্ঠায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের কথা একাধারে নিষ্ঠুর ও দয়াবান রাজাদের কথা এবং সাধারণ পুরুষ ও নারীদের জীবনযাপনের বিবরণ ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যা কিছু তার চোখে অপরিচিত ছিল বিশেষত সেগুলোর উপর আলোকপাত করেন, এটা নিশ্চিত করার জন্য যে তাঁর শ্রোতা এবং পাঠকও এইসব দূরদেশকে কাছে পেয়ে অবিভূত।

5.1 নারিকেল এবং পান

ইবনবতুতার উপস্থাপনের কৌশল কিছু সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয় যেভাবে তিনি নারিকেল এবং পান এই দুই ধরনের উদ্ভিজ পণ্য সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যেগুলো তাঁর পাঠকদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।

উৎস- *6*

একজন মানুষের মাথার মত দেখতে ফল (নারিকেল)

ইবনবতুতা এভাবে নারিকেলের বর্ণনা করেন :

এই গুলো সবচেয়ে অদ্ভুত এবং গুণগতভাবে বিস্ময়কর গাছ। এটি দেখতে হুবহু খেজুর গাছের মত, তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু একটাই নারিকেল এক একটি গোটা একএকটি বীজ আর অন্যটিতে ছড়ায় ছড়ায় খেজুর ধরে। নারিকেল ফল মানুষের মাথার অনুরূপ, কারণ এতেও দুটি চোখ এবং একটি মুখ আছে এবং কাঁচা অবস্থায় এর ভিতরটা দেখতে মস্তিস্কের মত মনে হয় এবং ছিবড়াগুলো চুলের মত। তারা এর দ্বারা দড়ি তৈরি করে। জাহাজ সেলাইয়ের জন্য লোহার পেরেকের পরিবর্তে তারা এটি ব্যবহার করে এবং পাত্রের জন্যও দড়ি তৈরি করে।

➲ কোন ধরনের তুলনার মাধ্যমে ইবনবতুতা তার পাঠকদের নারিকেল দেখতে কেমন এই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ? তুমি কি মনে কর তুলনাগুলো উপযুক্ত ? তিনি কিভাবে দেখিয়েছেন যে নারিকেল একটি ভিন্ন ধরনের ফল ? তার বিবরণ কতটুকু বাস্তব সম্মত।

উৎস *7*

পান

ইবনবতুতার দেওয়া পানের বিবরণ ঃ

পান এমন একটি গাছ যা আঙ্গুর লতার মত চাষ করা হয়, পানের কোন ফল হয় না এবং এটি শুধু পাতার জন্যই চাষ হয়..... এটা ব্যবহার করার বিধি হল খাবার পূর্বে সুপারী মুখে নিতে হয়; যা অনেকটা জায় ফলের মত কিন্তু এটিকে টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা হয় এবং একে মুখে রেখে চিবানো হয়। তারপর পান পাতা নেওয়া হয়, তাতে অল্প চুন লাগানো হয় এবং পানের সঙ্গে চিবানো হয়।

➲ এটি কেন ইবনবতুতার মনযোগ আকর্ষণ করেছিল বলে তোমার মনে হয় ? তুমি কি এই বিবরণে আরও কিছু যুক্ত করতে চাও ?

5.2 ইবনবতুতা এবং ভারতীয় নগরসমূহ

ইবনবতুতা দেখতে পান উপমহাদেশের শহরগুলো সেইসব লোকদের জন্য ব্যাপক সম্ভাবনাময় ছিল যাদের প্রয়োজনীয় উদ্যম , সম্পদ এবং দক্ষতা আছে। সামরিক যুদ্ধ বিগ্রহ, বিদেশী আক্রমণ বাদ দিলে সাধারণত নগরগুলো ঘনবসতিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী ছিল। ইবন বতুতার বিবরণী থেকে জানা যায়, শহরের রাজপথ ছিল জনাকীর্ণ। জমজমাট আলোকোজ্জ্বল বাজারগুলো নানাবিধ জিনিসে ঠাসা। জনসংখ্যার নিরিখে বতুতা বলেন, দিল্লি প্রকৃতই ভারতের একটি বিশাল নগরী। দৌলতাবাদও (মহারাষ্ট্রে) আকারের দিক থেকে দিল্লির তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না।

➲ ইবনবতুতা স্থাপত্যরীতির কোন্ বৈশিষ্টগুলো উল্লেখ করেছেন ? চিত্র 5.8 এবং 5.9 এ এই বর্ণনার তুলনা কর।

উৎস- 8

দিল্লি

এটি ইবনবতুতার দিল্লি সম্পর্কিত বিবরণের একটি অংশ, যাকে তৎকালীন সময়কার গ্রন্থগুলোতে প্রায়ই দেহলী নামে উচ্চারণ করা হতো:

দিল্লি শহরটি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত এবং এর বিশাল জনসংখ্যা রয়েছে ... শহরের চারদিকের তৈরি প্রাচীর অতুলনীয়। দেওয়ালগুলো ১১ হাত প্রশস্থ ছিল; এবং এর ভিতরে নৈশপ্রহরী এবং দারোয়ান ছিল। প্রাচীরের ভিতরে খাদ্য সামগ্রী, বিশাল ভাণ্ডার অস্ত্র শস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র, দেওয়াল ভাঙ্গার যন্ত্র মজুত রাখার গুদাম ঘর রয়েছে। শস্যগুলো দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা হত যাতে পচন না ধরে। প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে টহল দিত। প্রাচীরে যে জানালাগুলো রয়েছে, সেগুলো শহরের দিকে মুখ করে খোলে। এই জানালাগুলোর মাধ্যমে ভেতরে আলো প্রবেশ করত। প্রাচীরের নিম্নভাগ পাথর দ্বারা এবং উপরিভাগ ইট দ্বারা তৈরি। এতে পাশাপাশি তৈরি মিনার রয়েছে। এই শহরে আটাশটি দ্বার রয়েছে যাকে সরওয়াজা বলা হয়। আর মধ্যে বদায়ুনওয়াজা সবচেয়ে বড়; মান্ডী দরওয়াজার ভিতরে একটি বাজার রয়েছে; গুল দরওয়াজার সন্নিকটে একটি বাগিচা রয়েছে..... এতে (দেহলী শহর) একটি সুন্দর কবরখানা রয়েছে, কবরসমূহের উপরে একটি করে গম্বুজ রয়েছে এবং যে কবরসমূহে গম্বুজ নেই সেটাতে নিশ্চিতভাবে তোরণ রয়েছে। কবরখানাতে রজনীগন্ধা, জুঁই, বুনো গোলাপ ইত্যাদি ফুলের গাছ বপন করা হত এবং সকল ঋতুতে এই ফুল প্রস্ফুটিত হত।

চিত্র 5.8 (উপর)
তুঘলকবাদে দিল্লির একটি তোরণ,

চিত্র 5.9 (বাম) বসতির দুর্গের প্রাচীরের একটি অংশ।

চিত্র 5.10
চিত্রে প্রদর্শিত ইকত বয়ন পদ্ধতি উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি উপকূলীয় উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে গ্রহণ করা হয় এবং ওই শৈলীকে আরও উন্নত করা হয়।

বাজারগুলো শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিনিময়ের স্থানই ছিল না, এছাড়াও এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র ছিল। অধিকাংশ বাজারেই একটি মসজিদ এবং একটি মন্দির ছিল। এদের মধ্যে অন্ততপক্ষে কয়েকটিতে নর্তকী সংগীতকার এবং গায়কদের দ্বারা সর্বজনীন প্রমোদানুষ্ঠানের জন্য স্থান নির্দিষ্ট থাকত।

যদিও ইবনবতুতা শহরের সমৃদ্ধি নিয়ে ব্যাখ্যায় বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন না, ঐতিহাসিকরা বতুতার বর্ণনার সূত্র থেকে উল্লেখ করেন যে, গ্রাম থেকে উদ্বৃত্ত সম্পদের মাধ্যমে নগরগুলো তাদের সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অর্জন করেছিল। ইবনবতুতা লক্ষ্য করেন যে ভারতে মাটির উর্বরতার কারনে এখানকার কৃষকরা বছরে দুবার ফসল ফলাতে পারত। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে উপমহাদেশের সাথে আন্তঃএশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের খুব ভাল যোগাযোগ ছিল। পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া উভয় স্থানেই ভারতের জিনিসপত্রের অত্যাধিক চাহিদা ছিল। যার ফলে কারিগর ও ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণে মুনাফা লাভ করতে পারত। ভারতীয় বস্ত্র বিশেষ করে সুতি বস্ত্র, সুক্ষ্ম মসলিন, রেশমবস্ত্র, জরি এবং রঙিন হালকা ঝলমলে বাহারি কাপড়ের চাহিদা ছিল অত্যাধিক। বতুতা জানিয়েছেন, এ দেশীয় কিছু মসৃণ মসলিন কাপড়টি এত মূল্যবান ছিল যে, কেবলমাত্র অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিরাই পরিধান করতে পারত।

উৎস 9

বাজারে সংগীত

দৌলতাবাদ সম্পর্কে ইবনবতুতার দেওয়া বিবরণ পড় ঃ

> দৌলতাবাদ পুরুষ ও মহিলা গায়কদের জন্য একটি বাজার রয়েছে যা তারবাবাদ নামে পরিচিত। এটা ছিল বৃহৎ এবং সুন্দর বাজারগুলোর মধ্যে অন্যতম। এতে অনেক দোকান রয়েছে এবং প্রত্যেক দোকানে একটি দরজা রয়েছে যার মধ্য দিয়ে মালিকের ঘরের ভিতরে যাওয়া যায় ... দোকানগুলো গালিচা দ্বারা সুসজ্জিত এবং দোকানের মাঝখানে রয়েছে দোলনা যেখানে মহিলা গায়িকা বসে থাকেন। তিনি নানা অলঙ্কারে সজ্জিত এবং তার পরিচারিকাগণ মাঝে মাঝে তাকে দোলায়। বাজারের মাঝখানে একটি বিশাল গম্বুজ রয়েছে, যা গালিচা দ্বারা সাজানো এবং এতে প্রতি বৃহস্পতিবার ভোরের প্রার্থনার পর মুখ্য গায়ক তার সেবক এবং দাসদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আসন গ্রহণ করেন। গায়িকারা একের পর এক দলবেধে এখানে আসে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত নাচগান করে তারপর তারা চলে যান। এই বাজারে নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ রয়েছে। জনৈক হিন্দু শাসকও প্রত্যেক বার বাজারে যাওয়ার সময় গম্বুজে অবতরণ করতেন এবং গায়িকারা তার সামনে গান গাইতেন। এমনকি বেশ কিছু মুসলিম শাসকও এমনটাই করতেন।

➲ তোমার মতে ইবনবতুতা তার বিবরণে কেন এসব ক্রিয়াকলাপকে তুলে ধরেন?

5.3 যোগাযোগের এক অনন্য পদ্ধতি

ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করার জন্য রাজ্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করত। প্রায় সব বাণিজ্যিক রাস্তায় সরাইখানা এবং বিশ্রামের সুবন্দোবস্ত ছিল। ইবনবতুতা ডাক ব্যবস্থার কার্যকারিতা দেখেও বিস্মিত হয়েছিলেন যা দ্বারা বণিকরা কেবলমাত্র অনেক দূরবর্তী স্থানে তথ্য আদান প্রদানই করতেন না বা বাণিজ্যিক লেনদেনই করতেন না আপৎকালীন অবস্থায় প্রয়োজনীয় পণ্য প্রেরণেও তা সহায়ক ছিল। ডাক ব্যবস্থা এতই কার্যকরী ছিল যে সিন্ধু থেকে দিল্লি যাত্রা যদিও পঞ্চাশ দিন লাগত সেখানে ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে সুলতানের কাছে গুপ্তচরদের সংবাদ মাত্র পাঁচ দিনে পৌঁছে যেত।

উৎস 10

ঘোড়ায় চড়ে এবং পায়ে হেঁটে

ইবনবতুতা নিম্নলিখিতভাবে ডাক ব্যবস্থার বিবরণ দিয়েছেন :

> ভারতে দুই ধরনের ডাক ব্যবস্থা রয়েছে। ঘোড়ায় চড়া ডাক ব্যবস্থা যা 'উলুক' নামে পরিচিত, প্রত্যেক চার মাইল দূরত্বে রাখা রাজকীয় ঘোড়ার দ্বারা পরিচালিত হয়। পদাতিক ডাক ব্যবস্থায় প্রতি মাইলে তিনটি অবস্থানস্থল রয়েছে, যা 'ধাবা' নামে পরিচিত যা এক মাইলের এক তৃতীয়াংশ..... এখন প্রতি এক তৃতীয়াংশ অন্তর একটি ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম রয়েছে যার বাইরে তিনটি মঞ্চ রয়েছে যেখানে লোকেরা কাজ করার জন্য প্রস্তুত বসে থাকে। প্রত্যেকের হাতেই দুহাত লম্বা একটি দন্ড থাকে যেগুলোর উপর দিকে তামার ঘন্টা লাগানো। যখন সংবাদ বাহক শহরের দিকে যাত্রা শুরু করে তখন আর এক হাতে পত্র এবং অন্য হাতে ঘন্টা লাগানো দন্ড নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্রুত বেগে ছুটত। মঞ্চে অপেক্ষমান লোকেরা ঘন্টার শব্দ শোনামাত্র তারা তৈরি হয়ে যেত। যখনই সংবাদবাহক তাদের কাছে পৌঁছত তখন তাদের মধ্যে একজন এক হাতে পত্র নিয়ে দণ্ডটি নাড়িয়ে খুব দ্রুত .... দৌড়ত যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী ধাবাতে না পৌঁছায়। পত্রের গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই পদাতিক ডাক ব্যবস্থা ঘোড়ায় চড়া ডাক ব্যবস্থা থেকে অধিক গতিশীল; এবং এর প্রায়ই খোরাসানের ফল পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হত। ভারতে যার চাহিদা খুব বেশি।

➲ পদাতিক ডাক ব্যবস্থা সমস্ত উপ-মহাদেশে পরিচালনা করা যেত বলে কি তুমি মনে কর?

➲ আলোচনা করো ঃ

ইবনবতুতা কি করে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয়ে এবং ভিন্ন প্রেক্ষিতে তাঁর শ্রোতার কাছে উস্থাপন করতেন?

এক বিচিত্র দেশ ?

1440 এর দশকে লেখা আব্দুর রাজ্জাকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত আবেগ ও উপলব্ধির এক কৌতুহল উদ্দীপক দলিল ছিল। একদিকে কেরলের কালিকট (বর্তমান কোজিকোড) বন্দরে তিনি যা দেখেছেন তিনি তার প্রশংসা করতে পারেননি। এখানে বসবাসকারী মানুষেরা এরকম হতে পারে, আমি কখনো কল্পনা করতেই পারিনি। এই লোকদের তিনি 'অদ্ভুত জাতি' বলে বর্ণনা করেছেন।

পরে তিনি ভারত ভ্রমণের সময় ম্যাঙ্গালোরে পৌঁছান এবং পশ্চিমঘাট অতিক্রম করেন। এখানে তিনি একটি মন্দির দেখতে পান, যা দেখে তার মন প্রশংসায় ভরে যায় :

> ম্যাঙ্গালোরের তিন লীগ (প্রায় নয় মাইল) এর ভিতর আমি একটি দেবতার মন্দির দেখেছিলাম, যা বিশ্বের কোথাও দেখিনি। সেটি ছিল বর্গাকার। যার প্রত্যেক বাহু দশ গজ, উচ্চতা পাঁচ গজ এবং চারদিকের বারান্দাওয়ালা প্রবেশ পথ ব্রোঞ্জ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। প্রবেশদ্বারের দ্বারমন্ডপে স্বর্ণের তৈরি একটি মূর্তি ছিল। যা মানুষের অবয়ব মতো এবং উচ্চতাও মানুষের মত ছিল। মূর্তির চোখে বসানো রয়েছে দুটি রক্তিম পাথর, রুবি। এটা এমন চমৎকারভাবে নির্মিত যে ভ্রম হয় চোখদুটি সত্যিই বুঝি তাকিয়ে আছে, কী অপরূপ শৈল্পিক দক্ষতা।

6. বার্নিয়ার এবং "অধ:পতিত" প্রাচ্য

যেখানে ইবনবতুতা এ সমস্ত জিনিস বর্ণনা করার জন্য বেছে নেন যেগুলো তাদের অভিনবত্বের জন্য প্রভাবিত ও উৎসাহিত করত, তুলনায় ফ্রাঙ্কোইস বার্নিয়ার ছিলেন ভিন্ন মতাদর্শী। তিনি যা কিছু ভারতে দেখেন সেগুলোর সঙ্গে সাধারণভাবে ইউরোপ এবং বিশেষভাবে ফ্রান্সের পরিস্থিতির তুলনা তথা ভিন্নতা কে প্রকাশ করার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন। বিশেষ করে ওই সব পরিস্থিতিগুলো যেগুলো তার কাছে হতাশাজনক বলে মনে হয়। তাঁর চিন্তাধারা নীতি নির্ধারক এবং বুদ্ধিজীবী মহলকে প্রভাবিত করার জন্য ছিল যাতে এটা সুনিশ্চিত করা যায় যে তারা যেন সেই সিদ্ধান্তই নিতে পারেন, যা তারা সঠিক বলে মনে করে।

বার্নিয়ারের গ্রন্থ 'ট্র্যাভেলস ইন দ্য মোগল এম্পয়ার' পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষন, সমালোচনামূলক অন্তর্দৃষ্টি এবং গভীর বিশ্লেষণের প্রতিফলন রয়েছে। তাঁর বর্ণনায় মোগল ইতিহাসকে এক প্রকার সার্বজনীন রূপ দেওয়ার চেস্টা করেছেন। তিনি প্রতিনিয়ত মোগল আমলের ভারতের সাথে তৎকালীন ইউরোপের তুলনা করে ইউরোপীয় শ্রেস্টতার উপরই জোর দিতেন। এ যেন এক বিরোধীপক্ষের দৃষ্টিতেই ভারতবর্ষের উপস্থাপনা। যেখানে ভারতের অবস্থান ইউরোপের বিপরীতে দেখানো হয়। তিনি যে পার্থক্যগুলো অনুভব করেন তাকেও ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করে যাতে পাশ্চাত্য জগতের কাছে ভারত হেয় প্রতিপন্ন হয়।

6.1 জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয় ঃ

বার্নিয়ারের মতানুসারে, মোগল আমলে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিল যে ভারতে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানার অভাব। তিনি ব্যক্তিগত মালিকানার গুনাবলীর উপর বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি ভূমি ও রাজকীয় মালিকানা রাজ্য এবং জনগণের জন্য ক্ষতিকারক বলে মনে করতেন। তাঁর ধারনায় মোগল সাম্রাজ্যে সম্রাটই সমস্ত ভূমির মালিক ছিলেন এবং তিনি তা অভিজাতদের মধ্যে বন্টন করতেন, যা অর্থব্যবস্থা ও সমাজে ধ্বংসাত্মক পরিনতি নিয়ে আসে। এই উপলব্ধি শুধু বার্নিয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অধিকাংশ ভ্রমণকারীদের বিবরণেও তা পাওয়া যায়।

রাজাই সমস্ত জমির মালিক হওয়ায় তিনি যাদেরকে জমি বণ্টন করেন তাদের সন্তানগণ স্বাভাবিক নিয়মে সেই জমির উত্তরাধিকারী হতে পারত না বলে বার্নিয়ার উল্লেখ করেন। অতএব তারা জমির উর্বরতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে বিমুখ ছিল। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতি, "উন্নত" জমিদার

সর্বগ্রাসী দরিদ্র

সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে ওলন্দাজ পর্যটক পেলসার্ট এই উপমহাদেশ পরিভ্রমণে আসেন। বার্নিয়ারের মতো তিনিও এখানকার সর্বগ্রাসী দারিদ্র্যের দৃশ্য দেখে দুঃখিত হন। তিনি বলেন, এই দারিদ্র যে কত বিশাল এবং শোচনীয়। এইসব মানুষের জীবন এককথায় বর্ণনা করতে হলে বলতে হবে, এ হল অভাবের সংসার, বিষাদের আবাস, রাষ্ট্রশক্তিকে অভিযুক্ত করে তিনি বলেন চাষীদের সমস্ত সম্পদই এখানে কেড়ে নেওয়া হয়। তাদের পেট ভরার জন্য এক টুকরো শুকনো রুটির সংস্থান পর্যন্ত রাখা হয়নি।

শ্রেণির উত্থানে বাধা প্রদান করে, যার ভূমির রক্ষণাবেক্ষণ বা উন্নতির জন্য উদ্বিগ্ন থাকবে। এর ফলে একমাত্র শাসকবর্গ ছাড়া কৃষির ধ্বংস, কৃষকদের উপর অকথ্য নিপীড়ন এবং ধারাবাহিকভাবে সমাজের সকল শ্রেণির জীবনযাত্রার অবনতি ঘটে।

উৎস 11

দরিদ্র কৃষক

গ্রামাঞ্চলে কৃষক সম্প্রদায়ের উপর বার্নিয়ারের বিবরণ থেকে নেওয়া একটি উদ্ধৃতাংশ ঃ

> হিন্দুস্তান সামাজ্যের বিশাল গ্রামীণ অঞ্চলে অনেক স্থান রয়েছে যা কেবল বালুকাময় অথবা অনুর্বর পর্বত, স্বল্প চাষাবাদ যোগ্য এবং বিরল জনপদ। এমনকি কৃষি যোগ্য ভূমির একটা বড় অংশ শ্রমিকের অভাবে উৎপাদনহীন হয়ে পড়ে থাকে, ভূস্বামীদের দুর্ব্যবহারের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই সর্বশান্ত হয়। গরীব লোক যখন তাদের লোভী প্রভুর চাহিদা পূরণে অসমর্থ হত তখন তারা কেবলমাত্র জীবন জীবিকা থেকেই বঞ্চিত হত না, এমনকি তাদের সন্তানদেরও হারাতে হত, কারণ তাদের দাস বানানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হত। এভাবে কৃষক সম্প্রদায় অত্যাধিক নিপীড়নে হতাশ হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যেত।

এই প্রেক্ষাপটে বার্নিয়ের তৎকালীন ইউরোপে রাজ্য ও সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে তৈরি হওয়া বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল মোগল আমলে ভারত সম্পর্কিত তাঁর বিবরণ ইউরোপের সেই সব মানুষের সতর্কবাণী হিসাবে কাজ করুক যারা ব্যক্তিগত মালিকানার গুণাবলীকে স্বীকার করে না।

➲ বার্নিয়ারের মতানুসারে উপমহাদেশের কৃষকরা কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হত? তার বিবরণ তার যুক্তিকে সুদৃঢ় করেছে বলে তুমি কি মনে কর?

চিত্র ঃ 5.11
ঊনবিংশ শতাব্দীর এমন চিত্র অপরিবর্তনশীল গ্রামীণ সমাজের রূপকে তুলে ধরে।

তাঁর বক্তব্যকে সম্প্রসারিত করে বার্নিয়ার ভারতীয় সমাজকে হত দরিদ্র অবিচ্ছিন্ন জনসমষ্টি হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যে জনসমষ্টির উপর মুষ্টিমেয় ধনী ও শক্তিশালী শাসক শ্রেণি আধিপত্য চালায়। দরিদ্র হতে দরিদ্রতম এবং সম্পদশালী শ্রেণির মধ্যবর্তী সামাজিক গোষ্ঠী বা শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না। বার্নিয়ার আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছেন "ভারতে কোন মধ্যবর্তী শ্রেণির লোক নেই।"

উৎস 12

ইউরোপের জন্য সতর্কতা

বার্নিয়ার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে ইউরোপীয় রাজারা যদি মোগল আদর্শ অনুসরণ করেন তবে :

তাদের রাজ্যগুলো এত সুসভ্য এবং জনাপূর্ণ, এত সুন্দরভাবে নির্মিত, আভিজাত্যপূর্ণ, মার্জিত এবং উন্নয়নশীল থাকবে না, যেমনটা আমরা তাদের দেখি, পক্ষান্তরে আমাদের শাসক যথেষ্ট বিত্তবান ও শক্তিশালী এবং এটা স্বীকার করতেই হবে যে তারা যথেষ্ট আনুগত্য লাভ করেন। তারা অচিরেই মরুভূমি অথবা নির্জন ভূমি, ভিখারী এবং বর্বর লোকদের রাজা হয়ে থাকবে, যাদের বিষয়ে আমি বর্ণনা দিয়েছি। (মোগলের মত)

আমরা দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশের কারণে বিশাল নগর ও শহরগুলো জনশূণ্য ও ভঙ্গুর অবস্থায় দেখতে পাব, এদের রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব নেওয়ার ও কেউ থাকবে না, টিলাগুলো পরিত্যক্ত হবে। শস্য ক্ষেত্র ক্ষতিকারক ঝোপঝাড় জলাভূমিতে পরিনত হবে। সেভাবে আগে বর্ণনা করা হয়েছে।

➲ বার্নিয়ার ধ্বংসের চিত্রকে কিভাবে বর্ণনা করেন? অষ্টম এবং নবম অধ্যায় পড় এবং এই অধ্যায়ে ফিরে এসে বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

বার্নিয়ার মোগল সাম্রাজ্যকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন— তাদের রাজা "ভিক্ষুক ও বর্বর" লোকদের রাজা ছিলেন; তাদের শহর ও নগর একেবারেই বিনষ্ট এবং দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশের জন্য কুলুষিত এবং ক্ষেতগুলো ছিল "ঝোপঝার" এবং ক্ষতিকারক "জলাভূমি পূর্ণ" এবং এর পেছনে একটি কারণ ছিল জমির রাজকীয় মালিকানা।

আশ্চর্যজনকভাবে কোন সরকারি মোগল দলিল দস্তাবেজ এটা ইঙ্গিত করে না যে রাজাই ছিলেন সমস্ত ভূমির মালিক। উদাহরণ হিসেবে ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের রাজত্বে সরকারি ঐতিহাসিক আবুল ফজল ভূমিরাজস্বকে "সার্বভৌমত্বের পারিতোষিক" হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা রাজার দ্বারা প্রজাকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য রাজদরবারের প্রদত্ত শুল্ক, যা ভূমির উপভোগের উপর ধার্য্য কোন কর নয়। এটাও সম্ভব যে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা এমন চাহিদাকে খাজনা বলে মনে করে, কেননা ভূমি রাজস্বের পরিমাণ সর্বদাই বেশী ছিল। প্রকৃতপক্ষে এটি কোন রাজস্ব বা ভূমিকর ছিল না বরং উৎপাদিত ফসলের উপর কর ছিল। (আরও জানার জন্য অষ্টম অধ্যায় দেখ)।

বার্নিয়ারের বর্ণনা অষ্টম শতাব্দী থেকে পশ্চিমি চিন্তাবিদ্‌দের প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, ফরাসী দার্শনিক মন্তেস্কু এই বর্ণনা উপর ভিত্তি করে প্রাচ্য দেশে প্রচলিত স্বৈরতন্ত্রের ধারণা বিকশিত করেন। যার দ্বারা এশিয়ার (প্রাচ্য বা পূর্ব) রাজাগণ প্রজাদের উপর চরম কর্তৃত্ব করতেন, তাদের দারিদ্র্য এবং দাসত্বের অবস্থায় রাখত, যুক্তি ছিল সমস্ত সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক রাজাই এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল না। এই অভিমত অনুসারে রাজা এবং তার অভিজাতবর্গ ছাড়া, অন্যরা কোন ক্রমে জীবন ধারণ করতে পারতেন মাত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কার্ল মার্ক্স এই ধারণাকে এশিয় উৎপাদন ধারা তত্ত্বকে আরও বিশদ রূপ দেন। তিনি যুক্তি দেখান যে ভারতে (এবং অন্য এশিয় দেশগুলো) ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বে উদ্ধৃত্ত শস্য রাষ্ট্র শক্তি দ্বারা অধিগৃহীত হয়ে যেত। এর ফলে সমাজে এক প্রকার সায়ত্বশাসিত ও সমাজের উদ্ভব হয়। এই গ্রামীণ জনগণের উপর রাজকীয় দরবারের নিয়ন্ত্রণ থাকত, যতক্ষণ উদ্ধৃত্ত সম্পদ রাজকোষ পূর্ণ করে চলেছে ততক্ষণ এই অবস্থা বজায় থেকেছে, একে বলা হয়েছে স্থিতাবস্থা।

যাই হোক আমরা দেখব (অধ্যায় আট) এই চিত্র গ্রামীণ সমাজের যথার্থ প্রতিফলন ছিল না। বস্তুত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্রামীণ সমাজে ব্যাপক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পার্থক্য ছিল। একদিকে ছিল প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী বড় জমিদারগণ।

অন্য দিকে অস্পৃশ্য ভূমিহীন কৃষক। এই দুই শ্রেণির মাঝখানে স্বচ্ছল কৃষক যারা ভাড়াটে শ্রমিক কাজে লাগাত এবং পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত করত এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কৃষক শ্রেণি যারা বড় জোর নিজেদের জীবন ধারণের জন্য উৎপাদন করতে পারত।

6.2 একটি কঠিন সমাজের বাস্তবতা ঃ

যদিও বার্নিয়ার মোগল শক্তিকে অত্যাচারী রূপে উপস্থাপন করতে উৎসাহী ছিলেন কিন্তু তাঁর বিবরণ অনেক সময় এক জটিলতর সামাজিক সত্যতারও ইঙ্গিত দেয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন যে কারিগরদের উৎপাদনের গুণমান বৃদ্ধির জন্য কোন উৎসাহ ছিল না, কেননা মুনাফা রাজা দ্বারা অধিগৃহীত হত। ফলস্বরূপ সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন ছিল নিম্নমুখী। একই সময়ে তিনি এও স্বীকার করেন যে সমস্ত বিশ্ব থেকে বহু মূল্যের ধাতু ভারতে আসত, কারণ উৎপাদনকারীরা সোনা ও রূপোর বিনিময়ে এগুলো রপ্তানি করত। এছাড়াও তিনি এক সমৃদ্ধশালী বণিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও লক্ষ্য করেন যারা দূরবর্তী অঞ্চলে বিনিময় বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিল।

চিত্র ঃ 5.12
সোনার চামচ যা পান্না এবং মানিক দ্বারা খচিত। মোগল কারিগরি দক্ষতার একটি উদাহরণ।

উৎস 13

এক ভিন্ন আর্থ-সামাজিক দৃশ্য

বার্নিয়ারের বিবরণ থেকে নেওয়া উদ্ধৃতাংশটি পড়, যেখানে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন উভয়েরই বর্ণনা রয়েছে :

> এটা পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই দেশের বিস্তৃত ভূ-ভাগের অধিকাংশ ভাগ খুবই উর্বর, উদাহরণ হিসেবে বাংলার বিশাল অঞ্চল (বেঙ্গাল) যা ধান, ভুট্টা ও জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন কেবল মিশরকে অতিক্রম করেছিল তাই নয় বরং এমন অসংখ্য বাণিজ্যিক বস্তু যেমন— রেশম, তুলা এবং নীল উৎপাদিত হত, যা মিশরের উৎপাদিতই হত না। ভারতের এমন আরও অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে জনসংখ্যা ছিল প্রচুর এবং চাষাবাদও ভাল হত, আর অন্যদিকে কারিগর যারা স্বভাবে আলস্য পরায়ণ ছিল তারা প্রয়োজন বা অন্য কোন কারণে কার্পেট, জরির কাজ, সূচিকর্ম (Embroideries) সোনা ও রূপোর বস্ত্র এবং বিভিন্ন প্রকার রেশম ও সূতি বস্ত্র তৈরিতে বাধ্য হয় যা দেশে ব্যবহৃত হত এবং বিদেশে রপ্তানি করা হত।
>
> এটা ভুলে গেলে চলবে না যে সোনা এবং রূপো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সঞ্চালিত হবার পরে হিন্দুস্তানে এসে কিছু পরিমাণ আটকে যেত।

➲ এই উদাহরণে দেওয়া বিবরণের সঙ্গে উৎস-11 তে দেওয়া বিবরণের পার্থক্য কি?

উৎস 14

রাজকীয় কারখানা সমূহ

সম্ভবত বার্নিয়ার একমাত্র ঐতিহাসিক যিনি রাজকীয় কারখানার কার্যপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন :

> অনেক স্থানেই বড় বড় কক্ষ দেখতে পাওয়া যায় যাকে কারখানা বা শিল্পীদের কর্মশালা বলা হয়। একটি কক্ষে একজন তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানে সূচি শিল্পীরা তৎপরতার সঙ্গো কাজ করত। অপর কক্ষে ছিল স্বর্ণকার, তৃতীয়টিতে চিত্রকার, চতুর্থটিতে বার্ণিশ করার কাজেরত লোক, পঞ্চমটিতে কাঠের মিস্ত্রি, কুম্ভকার দর্জি ও জুতা তৈরির লোক, ষষ্ঠটিতে রেশম, জরি এবং মসলিনের কারিগর কাজ করত......
>
> কারিগররা কারখানায় প্রতিদিন সকাল বেলায় আসত এবং সারাদিন সেখানে তারা কাজ করত; এবং সন্ধ্যাবেলায় তারা ঘরে ফিরে যেত। এরকম নিয়মিতভাবে তারা সময় অতিবাহিত করত। যে পরিস্থিতিতে তাদের জন্ম হয়েছিল সেই পরিস্থিতির উন্নতির ইচ্ছা তাদের কারোরই ছিল না।

➲ বার্নিয়ার কিভাবে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন, এখানে সমস্ত ক্ষেত্রে সক্রিয়তা বিস্তার কিন্তু উন্নতি কম।

সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রায় 15 শতাংশ লোক শহরে বসবাস করত। এই গড় একই সময়ের পশ্চিম ইউরোপের নগরের জনসংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা অধিক ছিল। তা সত্ত্বেও বার্নিয়ার মোগল শাসনাধীন নগরকে ‘শিবির নগর’ (Camp Towns) হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যার দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এই শহরগুলো তাদের কার্য নির্বাহ এবং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য রাজকীয় শিবিরের উপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি মনে করতেন রাজ দরবার প্রতিষ্ঠার সঙ্গো সঙ্গো এই শহরগুলোর আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটে এবং রাজ দরবার স্থানান্তরের সঙ্গো সঙ্গো এর দ্রুত পতন ঘটে। তিনি আরও মনে করেন মোগল শহরগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর গড়ে উঠেনি। শুধুমাত্র রাজকীয় আনুকুল্যের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ভূমির মালিকানার প্রশ্নে বার্নিয়ার এক অতি সরলীকৃত চিত্র তুলে ধরেন। সেখানে বিভিন্ন প্রকার নগর ছিল, উৎপাদনকেন্দ্র, বাণিজ্য নগর, বন্দর-নগর, ধর্মীয় কেন্দ্র, তীর্থস্থান ইত্যাদি। এই শহরগুলো সমৃদ্ধশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং পেশাদারী শ্রেণির অস্তিত্বকে সূচিত করে।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রায়ই শক্তিশালী সম্প্রদায় অথবা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং তারা নিজস্ব জাতি তথা পেশাদারী সংস্থা দ্বারা সংগঠিত হত। পশ্চিম ভারতে তাদের মহাজন বলা হত। আহমেদাবাদের মত নগর কেন্দ্রে সব মহাজনদের সম্মিলিতভাবে প্রতিনিধিত্ব করত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রধান যাকে ‘নগর শেট’ বলা হত।

অন্য শহুরে গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবসায়ী শ্রেণির অন্তর্গত ছিল চিকিৎসক (হাকিম অথবা বৈদ্য), শিক্ষক (পন্ডিত এবং মোল্লা), আইনজীবী, চিত্রকার, সঙ্গীতকার, লিপিবিশারদগণ প্রমুখ। এদের মধ্যে কেউ কেউ রাজকীয় আনুকুল্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, কেউ কেউ আবার পৃষ্ঠপোষকদের সেবা করে জীবন নির্বাহ করত যেখানে অন্যরা জনবহুল বাজারে সাধারণ মানুষের সেবা করে জীবন অতিবাহিত করত।

➲ আলোচনা করো ঃ

তোমার মতে বার্নিয়ারের মত পন্ডিতরা ভারতকে ইউরোপের সঙ্গো কেন তুলনা করেছেন ?

7. নারী ঃ ক্রীতদাসী, সতী এবং শ্রমিকরা

এই যেসব পর্যটকরা যারা লিখিত বিবরণ রেখে গেছেন সাধারণত তারা পুরুষ ছিলেন এবং তারা উপমহাদেশের মহিলাদের অবস্থা নিয়ে আগ্রহী ছিলেন এবং অনেক সময় তাদের অবস্থা সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন। অনেক সময় তারা সামাজিক বৈষম্যকে 'স্বাভাবিক' পরিস্থিতি হিসাবে মনে করেন । বাজারে দাসদের অন্যান্য বস্তুর মত সরাসরি বিক্রি করা হত এবং নিয়মিতভাবে উদাহরণস্বরূপ বিনিময় করা হত। উদাহরণস্বরূপ যখন ইবনবতুতা সিন্ধুতে পৌঁছান তখন তিনি সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলককে উপহার দেওয়ার জন্য ঘোড়া, উট এবং দাস ক্রয় করেন। যখন তিনি মুলতানে পৌঁছান তখন তিনি সেখানকার শাসনকর্তাকে কিসমিস ও বাদামের সঙ্গে ঘোড়া এবং ক্রীতদাস উপহার দেন। ইবনবতুতা জানান যে মহম্মদ বিন তুঘলক নাসিরুদ্দিন নামক এক ধর্ম প্রচারকের ধর্মোপদেশে খুব খুশী হয়ে তাকে "এক লক্ষ টাকা" (মুদ্রা) এবং দুশত ক্রীতদাস" উপহার দেন।

ইবনবতুতার বিবরণ থেকে জানা যায় যে ক্রীতদাসদের মধ্যে অনেক বিভেদ ছিল। সুলতানের সেবায় কর্মরত দাসীরা সঙ্গীত ও নাচে পারদর্শী ছিল এবং ইবনবতুতা সুলতানের বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানে তাদের প্রদর্শন খুব উপভোগ করেছিলেন। সুলতান নিজের অভিজাতদের উপর নজরদারি করার জন্য ক্রীতদাসীদের নিযুক্ত করেন।

ক্রীতদাসদের সাধারণত গার্হস্থ্য শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করা হত এবং পাল্কি ও দোলনায় চড়া পুরুষ ও মহিলাদের বহন করা ক্রীতদাসদের অপরিহার্য কর্তব্য ছিল বলে ইবনবতুতা উল্লেখ করেন। ক্রীতদাসদের মূল্য বিশেষ করে যে সব দাসী গার্হস্থ কাজে নিযুক্ত তাদের মূল্য খুব কম ছিল। অধিকাংশ পরিবারের কমপক্ষে একজন বা দুইজন ক্রীতদাসীকে রাখার সমর্থ ছিল।

সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটক এবং লেখকরা মহিলাদের প্রতি সামাজিক আচরণকে ভিত্তি করে পূর্ব ও পশ্চিমী সমাজের মধ্যে পার্থক্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে দেখিয়েছেন। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, বার্নিয়ার সতীপ্রথা কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য নির্বাচন করেছেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে অনেক মহিলা স্বেচ্ছায় সহমরণে গেলে ও অনেককে জোর করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হত।

উৎস *15*

ক্রীতদাসী

ইবনবতুতা আমাদের জানান :

> এটা সম্রাটের স্বভাব .... দরবারের সভাসদ, ছোট কিংবা বড়ো সবার পেছনেই নজরদারী করার জন্য একজন ক্রীতদাসী লাগিয়ে রাখতেন। সভাসদদের বাড়িতে বিনা বাধায় ঢুকতে সক্ষম এরকম ক্রীতদাসীই তিনি নিযুক্ত করতেন। এরা এসব বাড়িতে কর্মরতা দাসীদের থেকে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে পারত।

সামরিক অভিযান করেই এইসব কৃতদাসীদের সংগ্রহ করা হত।

উৎস *16*

বালিকা সতী

সম্ভবত বার্নিয়ারের সবচেয়ে রোমহর্ষকর বিবরণগুলোর মধ্যে এটি একটি :

> লাহোরে আমি একটি খুব সুন্দরী অল্পবয়সী বিধবাকে সতী হতে দেখলাম যার বয়স আমার মনে হয় বারো এর বেশি হবে না, সেই ভয়ঙ্কর নরকের দিকে যাবার সময় অসহায় ছোট মেয়েটিকে জীবিত অপেক্ষা থেকে অধিকতর মৃত বলেই মনে হল। তারমনের নিদারুণ যন্ত্রণার বিবরণ দেওয়া যাবে না, সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল; কিন্তু তিন থেকে চার জন ব্রাহ্মণ এবং সঙ্গে একজন বয়স্ক মহিলা যিনি বগলদাবা করে ঐ সতী হতে অনিচ্ছুক মেয়েটিকে প্রাণনাশক অকুস্থলে জোর করে নিয়ে গেল, তাকে লাকড়ির উপর বসাল, তার হাত পা বাধা হল, যাতে সে পালিয়ে যেতে না পারে এবং এই অবস্থায় নিরীহ বালিকাটিকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হল। আমি আমার অনুভূতিকে চাপিয়ে রাখতে এবং তাদের কোহাহলপূর্ণ ও ব্যর্থ ক্রোধকে বাধা দিতে অপারগ ছিলাম...........

➲ আলোচনা করো ঃ

তোমার মতে সাধারণ মহিলা শ্রমিকদের জীবন শৈলী ইবনবতুতা ও বার্নিয়ারের মত পর্যটকদের কেন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি ?

যাই হোক মহিলাদের জীবন সতী প্রথা ছাড়া আর নানাভাবে নিষ্পেষিত হত। তাদের শ্রম কৃষি এবং কৃষি বহির্ভূত উৎপাদন, উভয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ব্যবসায়ী পরিবারের মহিলারা বাণিজ্যিক কার্য্যকলাপে অংশগ্রহণ করত, অনেক সময় বাণিজ্যিক বিরোধকে আদালতে নিয়ে যেতেন। অতএব এটি অসম্ভব বলে মনে হয় যে মহিলারা তাদের বাড়ির কিছু নির্দিষ্ট গন্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল।

বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণী থেকে নিশ্চয়ই তোমরা সেকালের মানুষদের জীবনের চিত্তাকর্ষক কথাগুলো জেনেছ। এই পরিব্রাজকরা যা কিছু দেখেছেন সবই নিজস্ব পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত দৃষ্টিকোণ থেকে, তাদের নিজের মতো করে দেখেছেন। একই সময়ে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

আমাদের এই উপমহাদেশ থেকে সমুদ্র, পর্বত পেরিয়ে বহির্বিশ্ব পর্যটনে যাওয়া পর্যটনের (পুরুষ ও নারী) প্রদত্ত তথ্যাদি তুলনামূলকভাবে আমাদের অজানা। তারা কি দেখেছিল এবং কি শুনেছিল ? সুদূর অঞ্চলের লোকদের সাথে তাদের সম্পর্ক কিভাবে স্থাপিত হয়েছিল ? তার কোন কোন ভাষা প্রয়োগ করত ? আশা করা যায় আগামী দিনে ঐতিহাসিকরা সুনির্দিষ্টভাবে এই প্রশ্নগুলোর উপর আলোকপাত করবে।

Fig. 5.13
মথুরা একটি ভাস্কর্যের নিদর্শণ। ভ্রমণকারীদের যাত্রার ছবি।

➲ যাতায়াতের কোন কোন ধরনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে ?

কালপুঞ্জি
কিছু পর্যটক যারা বৃত্তান্ত

দশম - একাদশ শতাব্দী	
973-1048	মহম্মদ ইবন আহমদ আবু রেহান (উজবেকিস্তান)
ত্রয়োদশ শতাব্দী	
1254-1323	মার্কো পোলো (ইতালী)
চতুর্দশ শতাব্দী	
1304-77	ইবনবতুতা (মরক্কো)
পঞ্চদশ শতাব্দী	
1413-82	অব্দ আল-রাজ্জাক কামাল আল-দিন ইবন ইশাখ আল-সমরখন্দী
1466-72 (ভারতে অতিবাহিত সময়)	অফানাসী নিকিতিচ নিকিতিন (রাশিয়া) (পঞ্চম শতাব্দী)
ষোড়শ শতাব্দী	
1518 (ভারত যাত্রা)	দূরতে বার বৌসা, মৃত্যু (পর্তুগাল)
1562 (মৃত্যুর বছর)	সৈয়দ আলী রইস (তুর্কী)
1536-1600	অ্যান্টোনিয়ো মানসেরেতে (স্পেন)
সপ্তদশ শতাব্দী	
1626-31 (ভারতে অতিবাহিত সময়)	মামুদ বলী বলখী (বলখ)
1600-67	পিটার মুন্ডী (ইংল্যান্ড)
1605-89	জিয়ান-ব্যাপটিস তেভারনিয়ার (ফ্রান্স) / Jean-Baptiste Tavernier
1620-88	ফ্রাঙ্কোইস বার্নিয়ার (ফ্রান্স)

বিঃ দ্রঃ— অন্যভাবে নির্দেশিত না হলে, উল্লিখিত তারিখগুলো হল ভ্রমণকারীদের জীবনকাল।

উত্তর দাও (১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে)

1. কিতাব-উল-হিন্দের উপর একটি টীকা লিখ।
2. ইবনবতুতা ও বার্নিয়ার যে দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে গেছেন এর তুলনা কর।
3. বার্নিয়ারের বিবরণে যে নগর কেন্দ্রের চিত্র পাওয়া গেছে তা আলোচনা কর।
4. ইবনবতুতা দাস প্রথা সমন্ধে যে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন তা বিশ্লেষণ কর।
5. সতীদাহ প্রথার কোন বিষয়গুলো বার্নিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল?

নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ (২৫০-৩০০ শব্দের মধ্যে)

6. জাতি প্রথা সমন্ধে আলবিরুনীর ধারণার আলোচনা কর।
7. তৎকালীন নগর জীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে ইবনবতুতার বৃত্তান্ত কতটা সহায়তা করেছিল?
8. তৎকালীন গ্রামীণ সমাজের ইতিহাস পুনর্গঠনে বার্নিয়ারের বিবরণ ঐতিহাসিকদের কতটা সহায়তা করেছিল?
9. বার্নিয়ারের রচনা থেকে নেওয়া এই অংশটি পড় :

> এমন লোক দ্বারা তৈরি সুদৃশ্য শিক্ষা কারিগরীর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে, যাদের কাছে যন্ত্রসামগ্রীর অভাব ছিল এবং যাদের সমন্ধে এটাও বলা যাবে না যে, তারা কোন দক্ষ কারিগর থেকে কাজ শিখেছে। অনেক সময় ইউরোপে তৈরি বস্তুর সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করত যে আসল ও নকলের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্য বস্তুর মধ্যে ভারতীয়রা খুব ভাল বন্দুক, পক্ষি শিকারের যন্ত্র এবং স্বর্ণের সুন্দর অলঙ্কার তৈরি করত, অনেক সময় সন্দেহ হয় যে, ইউরোপীয় স্বর্ণকার থেকেও কেউ এত ভাল বস্তু তৈরি করতে পারে। আমি প্রায়ই তাদের চিত্রের সৌন্দয্যতা, কোমলতা এবং মাধুর্য্যতার প্রশংসা করি।

উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত কারুশিল্পের তালিকা তৈরি কর। এই অধ্যায়ে বর্ণিত শিল্পের কর্মের সাথে এর তুলনা কর।

মানচিত্র কার্য

10. বিশ্বে মানচিত্রে সেই দেশগুলি চিহ্নিত কর যেখানে ইনবতুতা ভ্রমণ করেছেন। কোন কোন সমুদ্রকে তিনি অতিক্রম করেছেন?

প্রকল্প (যে কোন একটি)

11. তোমার যে কোন একজন বায়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়ের (মাতা/পিতা/ঠাকুরদাদা/ঠাকুরমা/কাকা/কাকী) সাক্ষাৎকার নাও, যিনি তোমার শহর বা গ্রামের বাইরে ভ্রমণ করেছেন। খুঁজে বের কর (a) তারা কোথায় গিয়েছিল? (b) তারা কিভাবে ভ্রমণ করেছিল? (c) তাদের কতটুকু সময় লেগেছিল? (d) তারা কেন ভ্রমণ করেছিল? (e) তারা কি কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল? তারা যেখানে বসবাস করেন এবং যে স্থানে ভ্রমণ করতে গিয়েছিল উভয় স্থানের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি কর, বিশেষ করে ভাষা, বস্ত্র, খাদ্য, রীতিনীতি, ভবন, রাস্তাঘাট, নারী ও পুরুষের জীবন শৈলী, তোমার সংগৃহীত তথ্য নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

12. এই অধ্যায়ে উল্লিখিত যে কোন একজন পর্যটকের জীবন এবং লিখনশৈলীর বিষয়ে আরও তথ্য অনুসন্ধান কর। তার ভ্রমণের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর বিশেষ করে তিনি সমাজকে কিভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এই অধ্যায়ের উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশের সাথে সাথে এর তুলনা কর।

চিত্র 5.14
এই চিত্রে বিশ্রামরত অবস্থায় পর্যটকদের দেখানো হয়েছে।

If you would like to know more, read:

Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam. 2006. *Indo-Persian Travels in the Age of Discoveries, 1400-1800.* Cambridge University Press, Cambridge.

Catherine Asher and Cynthia Talbot. 2006. *India Before Europe.* Cambridge University Press, Cambridge.

François Bernier. nd. *Travels in the Mogul Empire AD 1656-1668.* Low Price Publications, New Delhi.

H.A.R. Gibb (ed.). 1993. *The Travels of Ibn Battuta.* Munshiram Manoharlal, Delhi.

Mushirul Hasan (ed.). 2005. *Westward Bound: Travels of Mirza Abu Talib.* Oxford University Press, New Delhi.

H.K. Kaul (ed.). 1997. *Travellers' India – an Anthology.* Oxford University Press, New Delhi.

Jean-Baptiste Tavernier. 1993. *Travels in India.* Munshiram Manoharlal, Delhi.

For more information, you could visit:
www.edumaritime.org

বিষয়বস্তু ছয়

ভক্তি ও সুফিবাদের ঐতিহ্য

ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিবর্তন এবং ভক্তিমূলক গ্রন্থ (আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত)

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, আনুমানিক প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগে ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-ভাগ বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপত্য যেমন– স্তূপ, বৌদ্ধবিহার এবং মন্দিরগুলোর দ্বারা চিহ্নিত ছিল। যদি এই ধরনের স্থাপত্য সমূহ কোনো বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠানের প্রতীক হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের পুনঃনির্মাণ আমরা পুথিঁগত ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে করতে পারি, যার মধ্যে অন্যতম হল 'পুরাণ'। এর মধ্যে অনেক ধর্মীয় বিশ্বাসের বর্তমান রূপদান প্রায় সেই সময়েই শুরু হয়। এছাড়া এই রকম ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিদ্যমান ছিল, যেগুলো পুথিঁগত এবং দৃশ্যত -এই দুই রকম দলিল দস্তাবেজের মধ্যেই নামমাত্র রক্ষিত ছিল।

সেই সময় হতে প্রাপ্ত নতুন পুথিঁগত উৎস গুলোতে সন্ত -কবিদের রচনা গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ লোকেদের মধ্যে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষায় মৌখিক রূপে নিজেদের চিন্তাভাবনাকে ব্যক্ত করেছিলেন। এই রচনাগুলোকে প্রায়শই সংগীত আকারে রূপ দেওয়া হত, যা সাধারনত সন্ত-কবিদের মৃত্যুর পর শিষ্য অথবা ভক্তদের দ্বারা সংকলিত করা হত। বিশদ ভাবে বলতে গেলে, এই ঐতিহ্য অথবা পরম্পরা গুলো প্রবহমান ছিল। অনুগামীদের পরবর্তী কয়েক প্রজন্মও মূল উপদেশ গুলোকে শুধুমাত্র প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকেনি, উপরন্তু সেইসব বিচারধারা গুলো, যে গুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিত এবং সংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে তখন সমস্যা সৃষ্টিকারী ও অপ্রাসঙ্গিক ছিল, সেগুলোর কিছু কিছুকে হয়তো পরিবর্তন করা হয়েছে, নয়তো পরিত্যক্ত করা হয়েছে। তাই এই ধরনের সূত্র তথা উৎস গুলোকে ব্যবহার করা, ঐতিহাসিকদের জন্য সত্যিই এক কঠিন কাজ।

ঐতিহাসিকরা সাধু-সন্তদের অনুগামীদের (যারা তাদের ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্য ছিল) দ্বারা লিখিত তাদের জীবনীরও ব্যবহার করেন। যদিও আক্ষরিকভাবে এই জীবনী গুলো একেবারে সঠিক না ও হতে পারে। তবুও ভক্তরা এই সমস্ত পথপ্রদর্শক পুরুষ ও মহিলাদের জীবনীকে কীভাবে উপলব্ধি করেছিল, সেই ব্যাপারে একটা আভাস পাওয়া যায়।

আমরা দেখতে পাব যে, এই উৎস গুলি ক্রিয়াত্মক এবং বিবিধ দৃশ্যবিবরণী গুলিকে বোঝার জন্য আমাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। চলো আমরা তার কিছু মূল তত্ত্ব গুলোকে আরোও ভালো করে দেখি।

চিত্র 6.1
দ্বাদশ শতাব্দীর মনিক্কাবচকর (Manikkavachakar) এর একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি। তিনি একজন শিবভক্ত ছিলেন, যিনি তামিল ভাষায় খুব সুন্দর ভক্তিগীতি রচনা করেছিলেন।

1. ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য

সম্ভবত এই পর্বের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে সাহিত্য এবং মূর্তিকলা, দুটো এই অনেক ধরনের দেবদেবীর উপস্থিতি অধিকতরভাবে নজরে আসে। একটি স্তরে এই তথ্যগুলো এটা ইঙ্গিত করে যে, প্রধান দেবদেবীগণ যথা– বিষ্ণু, শিব এবং দেবী, যাদের অনেক রূপে দেখানো হয়েছে, তাদের পূজা- আরাধনা শুধুমাত্র প্রচলিত হয়নি বরং অধিকমাত্রায় বিস্তার লাভও করে।

1.1 ধর্মীয় পূজা পদ্ধতির সমন্বয়

ঐতিহাসিকরা যারা এই বিকাশকে বোঝার চেষ্টা করেছেন, তাদের এই পরামর্শ ছিল যে, এখানে অন্তত দুইটি প্রক্রিয়া কার্যকরী ছিল। এর একটি ছিল ব্রাহ্মন্যবাদী চিন্তাধারার প্রচারের প্রক্রিয়া। এর উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পৌরাণিক গ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোকগুলোর রচনাও সংকলন সমূহকে খুব সহজ সরলভাবে করা হয়েছিল। স্পষ্টতভাবে মহিলা এবং শূদ্রদেরও এখানে বৌদিক শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সাধারণত যাদের পূর্বে অথবা প্রথমদিকে বৌদিক শিক্ষা থেকে দূরে সারিয়ে রাখা হত। ঠিক সেই সময়, সেখানে দ্বিতীয় একটি প্রক্রিয়াও কার্যকর ছিল, যেটা ছেল, মহিলা ও শূদ্র এবং অন্যান্য সামাজিক শ্রেণির আস্থা ও বিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠানকে ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বীকৃতি প্রদান এবং নতুন রূপদান। প্রকৃতপক্ষে, সমাজতত্ত্ববিদ্গণ যারা এই উপমহাদেশের 'মহান' সংস্কৃতিয় পৌরণিক-পরম্পরা এবং 'লঘু' পরম্পরা গুলোকে বর্ণনা করেছেন, বস্তুত এই দুই পরম্পরার মধ্যে চলে আসা অবিরাম ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রীতিনীতি আকার নেয়।

এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে লক্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য উদাহরণটি উড়িষ্যার পুরীতে রয়েছে। যেখানে দেবতার মুখ্য বিগ্রহটিকে দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে বিষ্ণুর অন্য একটি রূপ, জগন্নাথ (আক্ষরিক অর্থ হল সমগ্র বিশ্বের অধিপতি), হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

"মহান" এবং "লঘু" পরম্পরা

'মহান' এবং 'লঘু' এর মতো শব্দগুলি বিংশ শতাব্দীর একজন সমাজতত্ত্ববিদ রোবার্ট রেডফিল্ড, কৃষক সমাজের সাংস্কৃতিক আচার-আচরণকে ব্যক্ত করার জন্য সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। তিনি দেখেন যে, কৃষকেরা সেই সব রীতি নীতি এবং আচার- আচরণ গুলোর অনুকরণ করত, যা সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণি এবং রাজা ও পুরোহিতেরা অনুসরন করত। এই গুলোকে রেডফিল্ড একটি 'মহান' পরম্পরা তথা ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন। ঠিক সেই সময় কৃষকেরাও কিছু স্থানীয় প্রথা তথা আচার অনুষ্ঠানের অনুকরণ করত, যার সাথে ওই সমস্ত 'মহান' ঐতিহ্য তথা পরম্পরা গুলোর কোনো যোগাযোগ ছিল না। এই গুলোকে তিনি 'লঘু' ঐতিহ্য তথা পরম্পরা শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। রেডফিল্ড এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে, 'মহান' এবং 'লঘু' এই দুটো পরম্পরাই সময়ের সাথে সাথে হওয়া পারস্পারিক আদান-প্রদানের কারণে পরিবর্তিত হয়।

যদিও পন্ডিতেরা এই প্রক্রিয়া এবং শ্রেণিকরণের তাৎপর্য গুলোকে স্বীকার করেন, তবুও তারা প্রায়শই 'মহান' এবং 'লঘু' শব্দটির দ্বারা প্রস্তাবিত শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে অস্বস্তিবোধ করেন। 'লঘু' ও 'মহান' শব্দগুলোর উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার দ্বারা এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

চিত্র 6.2
জগন্নাথ (একেবারে ডান দিকে) তাঁর সাথে বোন সুভদ্রা (মাঝখানে) এবং তাঁর ভ্রাতা বলরাম (বাঁদিকে)।

তোমরা যদি চিত্র -6.2 এর সাথে চিত্র-4.26 (অধ্যায়-4) এর তুলনা কর, তবে তোমরা লক্ষ্য করবে যে, দেবতার বিগ্রহগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই উদাহরণে একটি স্থানীয় বিগ্রহ, যেই মূর্তিটিকে অতীতকাল থেকে শুরু করে বর্তমানেও কাঠ দিয়ে স্থানীয় জনজাতির বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রস্তুত করা হচ্ছে। এটাকে বিষ্ণু দেবতারই একটি রূপ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে। বিষ্ণু ভগবানের এই রূপটির সাথে দেশের অন্যপ্রান্তে বিদ্যমান রূপের ভীষণ পার্থক্য রয়েছে।

সমন্বয়ের এইরূপ উদাহরণ দেব দেবীগণদের মধ্যেও স্পষ্টরূপে দেখা যায়। দেবীর আরাধনা, অধিকতর সিদুঁরে লেপা পাথর খন্ডের মাধ্যমে করা হত। পৌরাণিক গ্রন্থে এই স্থানীয় দেবীগণকে প্রধান দেবতাদের পত্নী-রূপে মানা হয়েছে। কখনো তারা লক্ষীমাতা রূপে বিষ্ণুর অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, আবার কখনো শিবের পত্নী পার্বতী রূপে প্রকট হয়েছে।

চিত্র 6.3
বৌদ্ধ দেবী, মারিচী-এর একটি মূর্তি (আনুমানিক দশম শতাব্দীতে, বিহার থেকে প্রাপ্ত) এই মূর্তিটি বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার অনুষ্ঠান সমূহের সমন্বয় প্রক্রিয়ার উদাহরণ।

1.2 বিভেদ এবং দ্বন্দ্ব

প্রায়শই দেবীগণকে আরাধনা তথা পূজা করার পদ্ধতিকে 'মন্ত্রতন্ত্র' নামে জানা যেত। তান্ত্রিক তথা তন্ত্রমন্ত্র পূজা পদ্ধতি উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এই পূজা পদ্ধতিতে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই অংশ গ্রহণ করতে পারত। এই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনকারীরা এই ধরনের পূজা করার সময় প্রায়শই তাদের বর্ণ ও শ্রেণির পার্থক্যকে উপেক্ষা করত। এই পূজা পদ্ধতির অনেক বিচার ধারা শিবধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের দর্শনকেও প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে, উপমহাদেশের পূর্ব, উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্তে এর যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

পরবর্তী সহস্রাব্দতে এই ধরনের ভিন্ন রকমের বিশ্বাস এবং রীতি নীতি 'হিন্দু' রূপে পরিচিতি লাভ করে। যদি আমরা বৈদিক ঐতিহ্যের সাথে পৌরাণিক ঐতিহ্যের তুলনা টানি তবে এই অসম্পূর্ণতা আরো স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। বৈদিকযুগের উপাস্য প্রধান দেবতা–অগ্নি, ইন্দ্র এবং সোম প্রমুখরা পুরোপুরিভাবে গৌণ হয়ে ওঠে এবং ধর্মীয় গ্রন্থে ও মূর্তি শিল্পে এই দেবতাদের উপস্থিতি খুব কম দেখা যায়। যদিও আমরা বৈদিক মন্ত্র গুলোতে বিষ্ণু, শিব এবং দেবীগণের আভাস দেখতে পাই, তথাপি বিস্তৃত আকারে বর্ণিত পৌরাণিক কাহিনির সাথে এই দেবদেবীর খুব কমই মিল রয়েছে। এই অমিল থাকা সত্ত্বেও বেদকে প্রামান্য গ্রন্থ হিসাবে শ্রদ্ধার নজরে দেখা হয়।

এতে কোনো আশ্চার্য ছিল না যে, এগুলোকে নিয়ে কখনো কখনো দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হত। বৈদিক পরম্পরার প্রশংসকেরা সেই সব আচার অনুষ্ঠানের নিন্দা করত, যেগুলি সঠিক মন্ত্র উচ্চারণ ও যাগ-যজ্ঞ ছাড়াই সম্পাদন করা হত। অন্যদিকে, যারা তন্ত্র পূজাতে নিয়োজিত ছিলেন, তারা বৈদিক নিয়ম তথা পূজাপদ্ধতিকে অবহেলা করতেন।

এছাড়াও ভক্তগণেরা প্রায়শই তাদের ইষ্টদেবতা বিষ্ণু অথবা শিবকে সর্বোচ্চ আসনে বসাতেন। বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের মতো অন্য ধর্মীয় বিশ্বাস ও পরম্পরার সাথে তাদের সম্পর্ক প্রায়শই উত্তেজনায় ভরা ছিল। যদিও প্রকাশ্যে বিরোধীতা হত না।

এই প্রসঙ্গে ভক্তি পরম্পরার অবস্থান ও খুঁজে দেখতে হবে। ভক্তিপূর্ণ উপাসনার একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে যা আমাদের বিবেচনার থেকেও প্রায় হাজার বছর পুরোনো। সেই সময়ে ভক্তগণেরা মন্দিরের মধ্যে দেবদেবীর নিত্য পূজার্চনা থেকে শুরু করে, ভাবময় উপাসনাতে বিলীন হয়ে যেত। প্রতিনিয়ত ভক্তিমূলক গান গাওয়া এবং ভগবানের নামজপ করা প্রমুখ পূজা পদ্ধতিরই একটি অঙ্গ ছিল। বৈষ্ণব এবং শিব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই কথাগুলো বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল।

➲ আলোচনা করো ঃ

তোমাদের শহরে অথবা গ্রামে পূজিত দেব-দেবীদের সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের করো। তাদের নাম এবং দেবদেবীগুলোকে কীভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তা লক্ষ্য করো। তাদের উপাসনার সাথে সম্পর্কিত আচার অনুষ্ঠানগুলোর বর্ণনা করো।

2. উপাসনার কবিতা সমূহ প্রারম্ভিক ভক্তি-বাদের ঐতিহ্য

উপাসনার ধরনের ক্রমবিকাশ চলাকলীন বহুবার সন্ত-কবিদের মতো পথপ্রদর্শকের আবির্ভাব হয়, যাদের কেন্দ্র করে অনুগামীদের একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। উপরন্তু, বিভিন্ন ভক্তি পরম্পরায় ব্রাহ্মণেরা, দেবদেবী এবং ভক্তবৃন্দের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতা কারীর ভূমিকা পালন করত। এই পরম্পরা গুলোতে মহিলা এবং তথা কথিত ‘নিচু’ শ্রেণির লোকেদের অন্তভুক্ত করা হয়। যাদের গোড়া ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় মুক্তি লাভের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিনা করা হত। ভক্তি পরম্পরার আর একটি বৈশিষ্টতা ছিল, তার চমকপ্রদ বৈচিত্র্য।

অন্যদিকে ধর্মীয় ঐতিহাসিকরা, ভক্তি পরম্পরাকে দুটো মুখ্য শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন, যথা ঃ- স্বগুন এবং নির্গুন। স্বগুন ভক্তি পরম্পরায়, শিব, বিষ্ণু তথা তাঁর বিভিন্ন অবতার এবং দেবী প্রমুখদের আরাধনা করা হত, যাদের জীবন্ত তথা মূর্ত ধারনা করা হত। অন্যদিকে, নির্গুন ভক্তি পরম্পরায়, ভগবানের নিরাকার তথা বিমূর্ত রূপের উপাসনা করা হত।

2.1 তামিলনাড়ুর বিষ্ণু এবং শিব উপাসক আলভার এবং নায়ানার

প্রারম্ভিক কিছু ভক্তি আন্দোলনের (আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে) নেতৃত্ব দিয়েছিল আলভার (বিষ্ণু ভক্তিতে যারা ভীষনভাবে নিমগ্ন থাকত) এবং নায়নাররা (আক্ষরিক অর্থে, শিবের উপাসকদের যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল)। তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ভ্রমন করতে করতে তামিল ভাষায় ভগবানের প্রশস্তিতে ভজনগীত তথা স্তবগান করত।

উৎস 1

চতুর্বেদী (চারটিবেদের জ্ঞান সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ) এবং 'অস্পৃশ্য'

এই উদ্ধৃতাংশটি তোন্দারাডিপ্পোদি () নামক এক আলভারের রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে, যিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ :

হে-বিষ্ণু, যারা চতুর্বেদী কিন্তু অপরিচিত এবং আপনার সেবার প্রতি নিষ্ঠাবান নয়, আপনি তাদের থেকেও সেই সব 'দাসদেস' বেশি পছন্দ করেন, যারা আপনার চরণ তলে প্রেমভক্তি বর্ষণ করে। এমনকি, যারা নিচু সম্প্রদায় জন্মেছে, তাদেরও ।

➲ তোমাদের কী মনে হয়, যে তোন্দারাডিপ্পোদি বর্ণ প্রথার বিরোধীতা করেছিলেন?

আলভার এবং নায়নাররা তাদের ভ্রমনকালে কিছু পুণ্যভূমিকে নিজেদের ইষ্টদেবতার নিবাস স্থল হিসেবে নির্বাচন তথা বাছাই করে। এই পুণ্যভূমি গুলোতেই পরবর্তী সময়ে বৃহদাকারের মন্দির নির্মাণ হতে দেখা যায়। এইস্থান গুলো তীর্থযাত্রার কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়। সন্ত-কবিদের রচিত ভজনগুলো মন্দির অনুষ্ঠানের সময় গাওয়া হত। এবং তার সাথে সাথে এইসব সন্তদের প্রতিমাগুলোর পূজা করা হত।

2.2 বর্ণ ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

কিছু ঐতিহাসিকদের মতে,আলভার এবং নায়ানার সাধকেরা বর্ণপ্রথা ও ব্রাহ্মণ সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, অথবা তারা এই ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের প্রচেস্টা করেছিলেন। আংশিকভাবে, এই কথাগুলো নির্ভরযোগ্য বলে প্রতীত হত। কেন না ভক্তজনেরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। যেমন ঃ ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে শিল্পকার, কৃষক প্রভৃতি সম্প্রদায়, এমনকি কিছু এমন জাতিভুক্ত ছিল যাদের 'অস্পৃশ্য' বলে জানা যেত।

আলভার এবং নায়ানার সাধকদের রচনা সমূহকে মাঝে মধ্যে বেদ শাস্ত্র এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত দাবী করা হত। এই রূপ দাবির মধ্যেই এই ঐতিহ্যের গুরুত্ব সম্পর্ক ইঙ্গিত করা হত। উদাহরণস্বরূপ আলভার সাধকদের একটি মুখ্য রচনার সংকলন 'নলরিয়াদিব্য প্রবন্ধম্'টি প্রায়শই তামিল বেদ রূপে বর্ণনা করা হত। এইভাবে গ্রন্থটির তাৎপর্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা লালিত সংস্কৃতে রচিত চতুর্বেদ -এর মতো বলে দাবি করা হয়।

উৎস 2

শাস্ত্র অথবা ভক্তি?

এটি, আপ্পার নামক নায়ানার সাধকের রচিত একটি স্তবক :

হে ধূর্তজন, তোমরা যে শাস্ত্র উদ্ধৃত করছ, তোমাদের গোত্র এবং কূল কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

তুমি কেবলমাত্র মাপেরুর প্রভুকে (শিব ঠাকুর, যিনি তামিলনাড়ুর তাজ্জুর জেলার মার্পেরুতে বিরাজমান) নিজের একমাত্র আশ্রয় দাতা হিসেবে মনে করে নতজানু হও।

➲ব্রাহ্মণদের প্রতি তোন্দারাডিপ্পোদি এবং আপ্পার এর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনো সাদৃশ্য অথবা বৈশাদৃশ্য রয়েছে কী?

2.3 মহিলা ভক্তবৃন্দ

সম্ভবত এই ঐতিহ্যের অন্যতম একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট ছিল, এখানে মহিলাদের উপস্থিতি। উদাহরণস্বরূপ, অঞ্জাল নামক মহিলা আরভার এর ভক্তিগীতি ব্যাপকভাবে গাওয়া হত (এবং বর্তমানে ও গাওয়া হয়)। অন্দাল নিজেকে ভগবান বিষ্ণুর প্রেয়সী বলে মনে করতেন। তাঁর রচিত স্তবকগুলো, ভগবানের প্রতি তাঁর গভীর প্রেমকে ব্যক্ত করে। অন্য একজন মহিলা শিব ভক্ত ছিলেন করা ইক্কাল অম্মাইয়ার, তিনি লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য কঠোর, তপস্যার পথকে বেছেনিয়েছিলেন। তাঁর রচনাগুলো নায়ানার

ভক্তিমূলক সাহিত্যের সংকলন

দশম শতাব্দীর দিকে 12 জন আলভার এর রচনা সমূহকে একত্রে সঙ্কলিত করা হয়, যা 'নলরিয়া দিব্য প্রবন্ধম্' (চার হাজার পবিত্র রচনা সমূহ) নামে জানা যায়।

দশম শতাব্দীতেই অপ্পার, সম্বন্দার এবং সুন্দরারদের কবিতা গুলোকে 'তেভরম্' নামক সংকলনে রাখা হয়। যেখানে কবিতা সমূহকে গানের সুরের উপরভিত্তি করে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।

পরম্পরার মধ্যে সুরক্ষিত ছিল। এই মহিলারা তাদের সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য সমূহকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু তারা কোনো বিকল্প ব্যবস্থা অথবা মঠবাসিনী সম্প্রদায়ের সদস্যা হিসেবে যুক্ত হয়নি। এই মহিলাদের জীবন প্রণালী এবং তাদের রচনা সমূহ পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

উৎস 3

এক রাক্ষসী ?

এই উদ্ধৃতাংশটি করাক্কাল অম্মাইয়ার-এর কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে, যেখানে তিনি নিজেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

ধমনী স্ফীত হওয়া রাক্ষসী,
বাহিরের দিকে প্রসারিত চক্ষু,
শ্বেত দন্ত এবং সংকোচিত
রক্তিম চুল এবং সন্মুখভাগে বার হওয়া দন্ত।
গোড়ালি পর্যন্ত প্রশস্ত থাকা দীর্ঘাকার পা, নিয়ে
জঙ্গালে বিচরণের সময় চিৎকার ও বিলাপ করে।
এটা অলনকাটুর জঙ্গাল,
যেটা আমাদের পরমপিতা (শিব) এর আবাস স্থল।
তিনি নৃত্যরত অবস্থায় আটদিকেই তাঁর জঠ পাকানো চুল ছড়িয়ে থাকে।
কিন্তু তাঁর অঙ্গা প্রত্যঙ্গা শান্ত থাকে।

➲ কারইক্কাল অম্পাইয়ার যেই উপায়ে নিজেকে উপস্থাপিত করেছে, তার একটি তালিকা তৈরী করো। তাঁর এই বর্ণনাটি তা নারী সৌন্দর্য্যর। পারম্পারিক ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ?

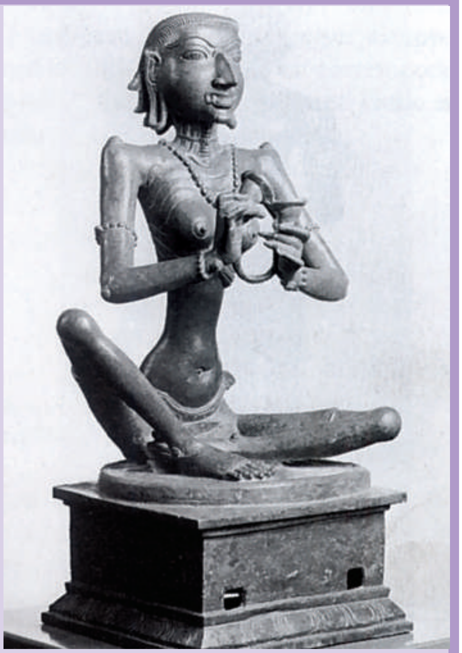

চিত্র 6.4
দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত করাইক্কাল অম্পাইয়ার -এর একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি।

2.4 রাজ্যের সাথে সম্পর্ক

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিছি যে, খ্রি.পূ. প্রথম সহস্রাব্দের শুরুর দিকে তামিল ও অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ অনেক মহাজন পদ ছিল। খ্রি. পূ। প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ভাগে রাজ্যগুলোর সূচনা এবং বিকাশ হয়। সেই রাজ্যগুলো মধ্যে পল্লব এবং পান্ডুরাজ্য ও (আনুমানিক খ্রি. পূ. ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দী) অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম কয়েক শতাব্দী ধরেই বিদ্ধ মান ছিল, এবং এতে কারিগর শ্রেণি ও বণিক সম্প্রদায়ের ও সমর্থন ছিল; কখনো কখনো এই ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলো রাজকীয়, পৃষ্ঠপোষকাত লাভ করত।

মজার বিষয় হচ্ছে যে, ভক্তিমূলক তামিল রচনাগুলো অন্যতম একটি বিষয় বস্তু ছিল বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রতি বিরোধীতা। এই বিরোধীতাগুলো বিশেষ করে নায়ানার সাধকদের রচনা সমূহে লক্ষ্য করা যায়। এই বিরোধীতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গো

ঐতিহাসিকদের প্রস্তাব ছিল যে, পরস্পর বিরোধী ধর্মীয় সম্প্রদায়দের মধ্যে রাজকীয় পৃষ্টপোষকতা লাভ করাকে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে থাকত। এটা স্পষ্ট যে, শক্তিশালী চোল শাসকেরা (নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী) ব্রাহ্মণ্য এবং ভক্তি বাদের ঐতিহ্যগত ছিলেন এবং শাসকেরা বিষ্ণু ও শিবের মন্দির নির্মাণের জন্য ভূমিদান করতেন।

এমনকি চিদাম্বরম্, তাঞ্জাভুর এবং গঙ্গাইকোন্ড চোলাপুরম্ -এর বেশ কয়েকটি দর্শনীয় বিশালকার শিব মন্দির চোল সম্রাটদের সহায়তায় নির্মিত হয়। এই সময়েই ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যে শিবের কিছু দর্শনীয় মূর্তি তৈরী হয়। নিঃসন্দেহে নায়ানার সাধকদের দর্শন গুলি কারুশিল্পীদের অনুপ্রাণিত করে।

ভেল্লা কৃষকদের দ্বারা নায়ানার এবং আলভার সাধকেরা সম্মানিত হত। এতে কোনো আশ্চর্য ছিল না যে, শাসকেরাও তাদের সমর্থন আদায় করার জন্য সচেষ্ট ছিল। উদাহরণস্বরূপ চোল রাজারা ঐশ্বরিক সমর্থন পাওয়ার দাবি করে, এবং নিজেদের ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য সুন্দর ও মনোরম মন্দির সমূহের নির্মাণ করে, সেই মন্দিরগুলোর মধ্যে পাথর এবং ধাতু নির্মিত মূর্তি সুসজ্জিত ছিল। এইভাবে সেই জনপ্রিয় সন্ত-কবিদের পরিকল্পনা তথা চিন্তাধারাগুলো, যা আঞ্চলিক ভাষাতে রচিত ও গাওয়া হত সে গুলোকে বাস্তবায়িত করা হয়।

চিত্র 6.5
নষ্টরাট রূপে শিবের একটি মূর্তি।

এই সম্রাটরা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত মন্দিরগুলোতে তামিল ভাষায় রচিত গাওয়ার শৈবস্তোত্রগুলো প্রচলন করেছিলেন। তাঁরা এই শিবস্তোত্রগুলো গাওয়ার একটি গ্রন্থের (তেভরাম) আকারে প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাছাড়া 945 খ্রিষ্টাব্দের শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, চোল সম্রাট প্রথম পরন্তক সন্তকবি আপ্পার, সাম্বন্দর এবং সুন্দরারদের ধাতু নির্মিত মূর্তি গুলোকে একটি শিব মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাধু সন্তদের উৎসব চলাকালীন এই মূর্তি গুলোকে নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হত।

➲ আলোচনা করো ঃ

তোমাদের কেন মনে হয় যে, রাজারা ভক্তদের সাথে তাদের সংযোগ স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন?

3. কর্ণাটকের বীরশৈবের ঐতিহ্য

দ্বাদশ শতাব্দীতে কর্ণাটকে একটি নতুন আন্দোলনের উদ্ভব হয়, যার নেতৃত্ব দেয় বাসাবন্না (1106-68) নামক একজন ব্রাহ্মণ। বাসাবন্না ছিলেন কালাচুরি সাম্রাজ্যের রাজসভার একজন মন্ত্রী। তাঁর অনুগামীদের বীর শৈব (শিবের আদর্শ পুরুষ) অথবা লিঙ্গায়ত (লিঙ্গাধারনকারী) নামে জানা যেত।

আজও এই অঞ্চলে লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা শিবের আরাধনা লিঙ্গ রূপে করে। এই সম্প্রদায়ের পুরুষেরা বাম কাঁধে রৌপ্যের একটি পাত্রে রাখা ছোট আকারের একটি শিবলিঙ্গকে ধারন করে। যাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে 'জঙ্গাম' অর্থাৎ যাযাবর ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়রা বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর ভক্তবৃন্দগণ ভগবান শিবের সাথে একাত্ম হবে, এবং এই পৃথিবীতে আর ফিরে আসবে না। ধর্মশাস্ত্রতে উল্লিখিত রীতি অনুযায়ী শবদেহকে তারা দাহ করেনা, এর পরিবর্তে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা তাদের মৃত পরিজনদের সমাধিস্থ করে।

লিঙ্গায়তেরা ব্রাহ্মণদের দ্বারা আরোপিত বর্ণ ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায়কে 'দূষিত তথা আচ্ছুত' আখ্যা দেওয়ার ধারনার অস্বীকার করেছিল। পুনর্জন্ম সংক্রান্ত তত্ত্বের উপরও তারা প্রশ্ন তোলে। সমাজে যেইসব সম্প্রদায়দের স্থান গৌণ ছিল, তারা এই সমস্ত কারণে লিঙ্গায়তদের অনুগামী হতে শুরু করে। ধর্মশাস্ত্র যে সব সামাজিক প্রথা অস্বীকৃত ছিল, যেমন– প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর বিবাহ, এবং বিধবাদের পুর্ণবিবাহ প্রভৃতি, লিঙ্গায়তেরা সেইসব সামাজিক রীতি গুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই আন্দোলনে যোগদানকারী মহিলা এবং পুরুষদের কন্নড় ভাষায় রচিত 'বচন সমূহ' থেকে আমরা বীর শৈব ঐতিহ্য সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারি।

উৎস 4

আচার অনুষ্ঠান এবং বাস্তব জগৎ

এটি বাসাবন্নার রচিত একটি বচন :

যখন তারা পাথরে খোদাই করা সাপকে দর্শন করে, তখন তারা এর উপর দুধ ঢালে।
আর যদি সত্যিকারের সাপ চলে আসে, তবে তারা বলে 'মারো মারো'।
ভগবানের সেই সেবক, যাদের কিছু দিলে খেতে পারে।
তাদের তারা বলে 'যাও ভাগো', 'যাও ভাগো'।

কিন্তু ভগবানের মূর্তির সামনে তারা খাদ্য অপর্ণ করে, যা সেই ভগবান খেতেওপারব না।

➲ শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি বাসবন্নার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে। তিনি কীভাবে নিজের কথা শ্রোতদের বোঝানোর প্রয়াস করেন?

নতুন ধর্মীয় বিকাশ

মধ্যযুগীয় সময়ে দুটো মুখ্য বিকাশকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রথমতঃ তামিল ভক্তদের বিচার ধারণাকে সংস্কৃত পরম্পরার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পরিমাণ স্বরূপ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ পুরাণের মধ্যে অন্যতম ছিল 'ভগবান পুরাণে'-এর রচনা। দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখেছি, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রে ভক্তি পরম্পরার বিকাশ হয়।

4. উত্তর ভারতে ধর্মীয় উন্মাদনা

ঠিক একই সময়, উত্তর ভারতে আরাধ্য দেবতারদের (যেমন - বিষ্ণু, শিব ঠাকুর) মন্দিরের নির্মাণ শাসক গোষ্ঠীদের অর্থানুকূল্যে হতো। যদিও ঐতিহাসিকগণ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত, আলভার এবং নায়ানার সন্তদের রচিত গ্রন্থের সাথে মিল রয়েছে, এমন কোনো প্রশাসনিক তথ্য খুঁজে পাননি। এই ভিন্নকার ব্যাখ্যা আমরা কীভাবে করব?

কিছু ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেছেন যে, তৎকালীন সময়ে উত্তর ভারতে বহু রাজপুত রাজ্যের উত্থান হয়। এই রাজ্যগুলোর অধিকাংশেই ব্রাহ্মণদের অবস্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা বৈষয়িক এবং শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত উভয় কার্যই সম্পাদন করত। ব্রাহ্মণদের প্রভূত্বকে সরাসরি প্রশ্ন করার প্রয়াস কেউ করেনি বলে মনে করা হয়।

চিত্র 6.6
কোরান শরীফের একটি পৃষ্টখন্ড। এই পৃষ্ঠখন্ডটি অস্টম অথবা নবম শতাব্দীর কোনো এক লেখা থেকে নেওয়া হয়েছে।

ঠিক সেই সময়, অন্যান্য ধর্মীয় গুরু , যারা গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ছিল না, তারা প্রভাববিস্তার করেছিল। এই ধর্মীয়গুরুদের মধ্যে নাথ, যোগী এবং সিদ্ধ সম্প্রদায় অন্তর্ভূক্ত ছিল। এদের মধ্যে অনেকলোক ছিল কারিগর শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। সন্মিলিত তথা সংগঠিত কারুশিল্প উৎপাদনের বিকাশের সাথে সাথে তাদের গুরুত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নতুন শহুরে কেন্দ্র গুলির উত্থানের সাথে সাথে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সাথে দূরবর্তী দেশগুলোর বাণিজ্যের মধ্যে এই জাতীয় উৎপাদনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

অনেক নব্য ধর্মীয় গুরুরা বেদ শাস্ত্রের প্রভূত্বকে নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, এবং নিজেদের বিচার ধারাকে সহজ সরল ভাষায় জনগণের কাছে নিয়ে গেছেন। সময়ের সাথে সাথে এই ভাষাগুলো এমনভাবে বিকশিত হয়েছে, যে এগুলো কালের বিবর্তনে আমাদের বর্তমানে সময়ে ব্যবহৃত ভাষায় বিকশিত হয়েছে। নিজেদের জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও নব্য ধর্মীয় গুরুরা শাসক গোষ্ঠীর সমর্থন আদায় করার অবস্থানে ছিলেন না।

এই পরিস্থিতিতে নতুন একটি ঘটনা ছিল ভারতবর্ষে তুর্কিদের আগমন, যার চূড়ান্ত পরিণতি ছিল, দিল্লি সুলতানি প্রতিষ্ঠা (ত্রয়োদশ শতাব্দীতে)। দিল্লিতে সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ফলে রীজপুত রাজ্য এবং এই রাজ্যগুলোর সাথে জড়িত ব্রাহ্মণদেরও প্রভাব প্রতিপতি হ্রাস পায়। এইসব পরিবর্তনের প্রভাব সংস্কৃতি ও ধর্মের উপরও পড়ে। এই পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল (অনুভাগ -6) ভারতবর্ষে সুফিদের আগমন।

5. নতুন কাঠামোগত পরিবর্তন ঃ ইসলামি ঐতিহ্য

বস্ত্র বুননের নতুন প্রস্তুত প্রণালী ঃ ইসলামি ঐতিহ্য (নতুন সংস্কৃতির আবির্ভাব) যেই রকমভাবে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলগুলো একে অপর থেকে আলাদা ছিল না, ঠিক তেমনই সমুদ্র এবং পাহাড় পর্বত সমূহের পাশ্ববর্তী অঞ্চল গুলোর সাথে যোগযোগ স্থাপনের অস্তিত্ব বহু সহস্রাব্দ ধরেই ছিল।? উদাহরণ স্বরূপ প্রথম সহস্রাব্দের দিকে আরব ব্যবসায়ীরা সমুদ্রপথে ভারতের পশ্চিমী উপকূল বন্দর পর্যন্ত আসে। ঠিক সেই সময়েই মধ্য এশিয়ার লোকেরা উপমাহাদেশের উত্তর পশ্চিম অংশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে সপ্তম শতাব্দী হতে, ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের সাথে সাথে এই অঞ্চলগুলো প্রায়শই ইসলামিক বিশ্বের অংশ হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে।

5.1 শাসক এবং শাসিতের ধর্মীয় বিশ্বাস

এই সম্পর্কগুলোর তাৎপর্যকে বোঝার জন্য একটি মানদন্ড যা প্রায়শই ব্যবহৃত হয়, তা হল বিশিষ্ট শাসক গোষ্ঠীর ধর্মের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ। 711 সালে মহম্মদ -বিন-কাসিম নামের একজন আরব সেনাপতি সিন্ধু বিজয় করে এবং এই অঞ্চলটিকে খলিফারদের এক্তিয়ারে অন্তর্ভুক্ত করে। পরবর্তীতে (আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) তুর্কি এবং আফগানেরা দিল্লিতে সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। সময়ে সাথে সাথে দক্ষিণাত্য এবং অন্যান্য অঞ্চলেও সুলতানি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। অনেক অঞ্চলে, ইসলাম, শাসক শ্রেণিদের একটি স্বীকৃত ধর্ম ছিল। এই অবস্থা যোড়শ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময়েও বহাল ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেই সব দেশীয়রাজ্যের উদয় হয়, তার মধ্যে অনেক রাজ্যের শাসকেরাও ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

উলেমারা (আলিমের বহুবচন) হল ইসলাম ধর্মের গুরু। ইসলাম ধর্মের পন্ডিত হওয়ার কারণে, তারা ধর্মীয় আইন-কানুন এবং অধ্যায়ণ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করে থাকে।

তত্ত্বগতভাবে, মুসলিম শাসকদের উলেমাদের নির্দেশ অনুসারে চলতে হত। উলেমাদের থেকে এইরকম আশা কার হত যে, শাসন প্রণালী শরীয়ৎ অনুযায়ী চলছে কিনা, এটা তারা নিশ্চিত করবে। স্পষ্টতই, উপমহাদেশে এই পরিস্থিতি ছিল জটিল, কারণ একটি বিশাল জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না।

এই প্রসঙ্গো জিম্মি (জিম্মি শব্দটি আরবী শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ সুরক্ষা) অর্থাৎ সংরক্ষিত শ্রেণির আবির্ভাব হয়। জিম্মি সম্প্রদায়ের লোকেরা উৎখাটিত ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাসী ছিলেন, যেমন ইসলাম শাসকদের অধীনে বসবাস করা ইহুদি ও খ্রিষ্টনরা। তারা জিজিয়া নামক কর প্রদান করত, এবং বিনিময়ে মুসলিম শাসকদের থেকে সুরক্ষা পেত। ভারতবর্ষে হিন্দু সম্প্রদায়দের থেকেও এই কর আদায় করা হত। 9 নং অধ্যায়ে তোমরা দেখবে যে, মোগল শাসকেরা নিজেদেরকে শুধুমাত্র মুসলিমদের অধিপতি নয়, বরং সমস্ত সম্প্রদায়দের সম্রাট এই মনোভাব পোষণ করত।

প্রকৃতপক্ষে, শাসকেরা প্রজাদের জন্য মোটামুটি ভাবে নমনীয় নীতি গ্রহণ করে। উদাহরণ স্বরূপ অনেক শাসকেরা–হিন্দু, জৈন, জোরাস্ট্রিয়ান, খ্রিস্টান এবং ইনেদি

শরিয়া

শরিয়া হল মুসলিম সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রক আইন। এটি কোরান শরীফ এবং হাদিসের উপর ভিত্তি করে রচিত। হাদিস হল পয়গম্বর মহম্মদের সাথে জড়িত পরম্পরা, যার মধ্যে তাঁর স্মৃতি কথা তথা তাঁকে স্মরণ রাখার কথা গুলো এবং কর্মকান্ড সমূহ নথিবন্ধ রয়েছে।

আরব প্রদেশের বাইরে ইসলাম ধর্মের প্রসারের সাথে সাথে এমন অঞ্চল গুলো, যেখানে রীতি নীতি এবং ঐতিহ্য সমূহ পৃথক ছিল, সেখানে কিয়াজ (সাদৃশ্যের দ্বারা যুক্তি-তর্ক) এবং ইজমাকে (সম্প্রদায়ের সর্বসম্মতি) আইনের উৎস হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। এই ভাবে কোরান, হাদিশ কিয়াজ এবং ইজমা প্রভৃতি থেকেই শরিয়ার উৎপত্তি হয়।

সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভূমি প্রদান করে এবং এদের কর ও মুকুব করে। এছাড়া অ-মুসলিম ধর্মীয় গুরুদের তারা শ্রদ্ধাও প্রদর্শন করত। আকবর সহ অনেক মোগল সম্রাটরাই এই সকল অনুদান করত।

উৎস 5

খম্বাটের একটি গির্জা

এই উদ্ধৃতাংশটি 1598 সালে সম্রাট আকবরের দ্বারা জারি করা, ফরমানের (রাজকীয় আদেশনামা) একটি অংশ ঃ

এটা আমাদের মহান এবং পবিত্র নজরে এসেছে যে, পবিত্র গির্জার পাদ্রি প্রভু যিশুর আদেশানুসারে গুজরাটের খাম্বেট শহরে একটি প্রার্থনা সভার ঘর (গির্জা) নির্মাণ করতে চান। এই জন্যই রাজকীয় আদেশনামা (ফরমান) ...... জারি করা হচ্ছে .... যাতে খম্বায়তের বিশিষ্ট জনেরা কোনোভাবেই তাদের পথে বাধা সৃষ্টি না করে এবং অবশ্যই যাতে তাদের গির্জা ঘর নির্মাণ করতে দেওয়া হয়, যাতে করে তারা নিজেদের প্রার্থনা সম্পন্ন করতে পারে। সম্রাটের এই আদেশটি সর্বতোভাবে পালন করা দরকার।

➲ এই সব ব্যক্তিরা কারা ছিলেন ? যাদের কারণে আকবর তার জারি করা আদেশ নামাটির বিরোধীতা পূর্বানুমান করেছিলেন ?

চিত্র 6.7
সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে একজন যোগীর প্রতিকৃতির একটি মোগল চিত্র।

উৎস 6

যোগীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

উদ্ধৃতাংশটি 1661-62 সালে ঔরঙ্গাজেবের দ্বারা একজন যোগীকে লিখিত পত্রের একটি অংশ বিশেষ ঃ

সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, শিব মুরত, গুরু আনন্দনাথ জী !

জানাব- এ- মুহতরম (শ্রদ্ধেয়) যাতে সুখে ও শান্তিতে সর্বদা শ্রী শিব জী-এর আশ্রয়ে থাকতে পারেন। এই আশা করি।

পরিধানের জন্য বস্ত্র এবং পঁচিশ টাকা, যা উপহাররূপে প্রেরণ করা হয়েছে, তা আপনার নিকট পৌঁছে যাবে ....। জনাব-এ- মুহতরম, যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আপনি আমাকে চিঠি লিখে জানাতে পারেন।

➲ যোগী দ্বারা পুজিত দেবদেবীগুলোকে চিহ্নিত করো। যোগীর প্রতি সম্রাটের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বর্ণনা করো।

5.2 ইসলাম ধর্মের জনপ্রিয় রীতি-নীতি সমূহ

ইসলাম ধর্মের আগমনের পর যেই সমস্ত পরিবর্তন সংগঠিত হয়, তা শুধুমাত্র অভিজাত শাসক শ্রেণি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না। বস্তুত উপমহাদেশ জুড়ে দূর দূরান্তে পরিব্যাপ্ত ছিল এবং বিভিন্ন সামাজিক সম্প্রদায় যেমন— কৃষক, কারুশিল্পী, যোদ্ধা এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যেও প্রসারিত ছিল। যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা নীতিগতভাবে ইসলামের মুখ্য পাঁচটি নীতি মেনে চলত, যথা– আল্লাহ হল একমাত্র ঈশ্বর, পয়গম্বর মহম্মদ হল তার একমাত্র দূত (সাহাদা); দিনে পাঁচবার নামাজ পাঠ করতে হবে, সম্পত্তির সামান্য অর্থ দান করতে হবে (জাকাত); রমজান মাসে রোজা রাখতে হবে, হজ যাত্রার জন্য মক্কায় যেতে হবে।

কিন্তু এই সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায়ই সাম্প্রদায়িক সম্পৃক্ততা (শিয়া, সুন্নি) থেকে প্রাপ্ত আচার অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিল। এছাড়া স্থানীয় নিয়মনীতির প্রভাবের কারণেও ধর্মান্তরিত লোকেদের ব্যবহারের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। উদাহরনস্বরূপ, ইসমাইলি (শিয়া) সম্প্রদায়ের একটি ছোটো শাখা হল খোজা। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা কোরানের ধারনাগুলি প্রকাশের জন্য দেশীয় সাহিত্যিক ধারার আশ্রয় নেয়। এই দেশীয় সাহিত্যিক ধারার মধ্যে জিনানও (শব্দটি সংস্কৃত শব্দজ্ঞান থেকে এসেছে) অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাঞ্জাবি, মুলতানি, সিন্ধি, কাচ্চ, হিন্দি এবং গুজরাটি ভাষায় জিনান নামের ভক্তিমূলক গান গাওয়া হত। এছাড়া প্রাত্যহিক প্রার্থনা সভায় ভক্তিমূলক গান গাওয়ার সময় একটি বিশেষ 'রাগ' ব্যবহার করা হত।

অন্যদিকে, মালাবার উপকূলবর্তী (কেরালা) অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী আরব মুসলিম ব্যবসায়ীরা স্থানীয় মালায়ালাম ভাষাকে রপ্ত করে নেয়। এছাড়া তারা স্থানীয় প্রথা যেমন মাতৃকুলতা প্রথা (অধ্যায়-3) এবং মাতৃগৃহতা প্রথাকে গ্রহণ করে।

একটি সার্বজনীন ধর্মবিশ্বাসের সাথে স্থানীয় ঐতিহ্যের জটিল মিশ্রণ, সম্ভবত এটি ছিল মসজিদ্ স্থাপত্য শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মসজিদ্ গুলোর স্থাপত্য সম্পর্কিত কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল সার্বজনীন, যেমন–মসজিদ্গুলোকে মক্কার অভিমুখে স্থাপন করা

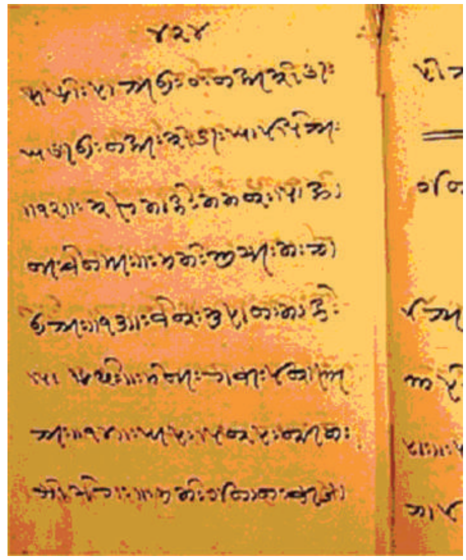

চিত্র 6.8
খোজকি পান্ডুলিপির একটি ছবি। খোজকি লিপিতে নথিভুক্ত করার আগে জ্ঞানের আদান-প্রদান মৌখিকভাবে চলত। খোজকি লিপি স্থানীয় 'লন্ডা' থেকে উৎপন্ন হয়। (বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে এই লিপির ব্যবহার হত) পাঞ্জাব ,সিন্ধু এবং গুজরাটের খোজা সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থানীয় লন্ডার প্রয়োগ করত।

> মাতৃগৃহতা হল এক ধরনের প্রথা, যেখানে মহিলারা বিবাহের পর নিজের মা-এর বাড়িতে তার সন্তানের সাথে থেকে যায় এবং মহিলার স্বামীও তাদের সঙ্গে একসাথে থাকতে পারে।

চিত্র 6.9
সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দী সময়ের, কেরালার একটি মসজিদ্। এই মসজিদ্রে শিখর আকৃতির ছাদের দিকে নজর দাও।

চিত্র 6.10
1609 সালে, বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলাতে ইষ্টক নির্মিত অতিয়া মসজিদের একটি ছবি।

চিত্র 6.11
শ্রীনগরে ঝিলাম নদীর তীর নির্মিত শাহ হামদান মসজিদ্‌টি কাশ্মীরে অবস্থিত সমস্ত মসজিদের "মুকুটরত্ন" বলে গণ্য করা হয়। এই মসজিদটি 1395 সালে নির্মিত হয়, এবং এটি কাশ্মীরি কাঠের স্থাপত্য কলার সর্বশ্রেষ্ট একটি উদাহরণ। এর উঁচু এবং একসাকরা বারান্দার দিকে লক্ষ করো। এটি কাগজের মন্ড দিয়ে সুসজ্জিত।

হত, যা মিহরাব (প্রার্থনাসভা) এবং মিনরাব (ব্যাসপীঠ) এর স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা যেত। মসজিদ্‌ নির্মাণে আবার কিছু বিষয় এমনও ছিল, যাতে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যেমন– মসজিদের ছাদ ও নির্মাণ সামগ্রী। (চিত্র- 6.9, 6.10 এবং 6.11)

5.3 বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম

আমরা প্রায়শই হিন্দু এবং মুসলমান এই শব্দগুলোকে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একটি নির্দিষ্ট পরিভাষা হিসেবে বিবেচনা করি। অথচ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই শব্দগুলোর কোনো প্রচলন ছিল না। ঐতিহাসিকরা যারা অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সংস্কৃত গ্রন্থ এবং শিলালিপির অধ্যয়ন করেছেন তারা উল্লেখ করেছেন যে, 'মুসলমান' অথবা মুসলিম শব্দটি তখন কার্যত কোনও স্থানে ব্যবহৃত হয়নি। তার বদলে জনগনের সনাক্তকরণ করা হতো জন্মস্থানের উপর ভিত্তি করে। এই ভাবে তুর্কি অঞ্চলের মুসলমানদের তাজিক, এবং পারস্য দেশের মানুষদের পারসিক নামে সম্ভোধন করা হত। কখনো কখনো অন্যলোকেদের ক্ষেত্রে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হতো। সেগুলো নতুন অভিবাসীদের ক্ষেত্রে ও প্রয়োগ করা হত। উদাহরণস্বরূপ, তুর্কি এবং আফগানিদের জন্য 'শক' (অধ্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয়) গ্রিকবাসীদের ক্ষেত্রে 'যবন' শব্দটি ব্যবহার করা হত।

এই অভিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবহৃত একটি আরোও সাধারণ শব্দ ছিল 'ম্লেচ্ছ'। এই শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, তারা সমাজে প্রচলিত বর্ণ ব্যবস্থার নিয়ম পালন করত না। এছাড়া এমন ভাষায় তারা কথা বলতেন, যা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হয় নি। মাঝে মধ্যে এমন শব্দগুলোর মধ্যে হীনভাবনা তথা অবমাননাকর ধারণা নিহিত ছিল। কিন্তু হিন্দুদের বিপরীতে মুসলিমদের একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে খুবকমই ম্লেচ্ছ কথাটির প্রয়োগ করা হত। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা লক্ষ করেছি যে, "হিন্দু" শব্দটিকে বিভিন্নভাবে তথা অনেক ভাবে ব্যবহার করা হত, এটি শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় ধারণার মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল না।

➲ আলোচনা করো ঃ

তোমার শহর অথবা গ্রামে অবস্থিত মসজিদের স্থাপত্য কলা সম্পর্কে ভাল করে তথ্য সংগ্রহ করো। এই মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে কী ধরনের সামগ্রী ব্যবহৃত হয়েছে? এই সামগ্রীগুলো কী স্থানীয় অঞ্চলে সহজ লভ্য? এই স্থাপত্য শিল্পের কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে কী?

6. সুফিবাদের বিকাশ

ইসলামের প্রারম্ভিক কয়েক শতাব্দীতে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সংস্থারূপে ইসলাম জগতের ধর্ম গুরু খলিফাদের ক্রমবর্ধমান বিষয়াসক্তির বিরুদ্ধে কিছু আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, রহস্য বাদ ও বৈরাগ্যের দিকে মনোনিবেশ করেন। এই সমস্ত সম্প্রদায়দের সুফি বলে জানা যেত। এই সমস্ত ব্যক্তিরা ধর্মতত্ত্ববিদদের ধারা গৃহীত কোরান এবং সুন্নাহের (পয়গম্বর মহম্মদের পরম্পরা) বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা দেন। পরিবর্তে তারা মুক্তি প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভক্তি প্রদর্শণ করে এবং তাঁকে আদেশ পালন করতে থাকে। তারা হজরত-মহম্মদকে সর্বগুণ সম্পন্ন মানব হিসেবে বর্ণনা করে। তাঁকে অনুসরণ করতে শেখান। সুফিরা এইভাবে তাদের ব্যক্তিগত অনুভরের উপর ভিত্তি করে কোরানের ব্যাখ্যা দেন।

6.1 খানকাহ এবং সিলসিলা

একাদশ শতাব্দীর দিকে সুফিবাদ একটি পূর্ণ বিকশিত আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়। এই আন্দোলনের সাহিত্যটি কোরান এবং সুফিপ্রথা এর সাথে জড়িত ছিল। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, সুফিগণ খানকাহ (পার্সিয়ান) -এর কাছাকাছি নিজেদেরকে সংগঠিত করতে শুরু করে। আবার এই খানকাহ গুলোকে মুসলমান শিক্ষা গুরুরা নিয়ন্ত্রণ করত, শিক্ষা গুরুদের শেখ (আরবী ভাষায়) পির অথবা মুরশিদ (ফার্সি ভাষায়) নামে জানা যেত। তাঁরা অনুগামী শিষ্যদের (মুরিদ) ভরতি করাত এবং নিজদের উত্তরসূরী (খলিফা) দের নিয়োগ করত। তারা আধ্যাত্মিক রীতিনীতি তথা আচরণের বিধিবিধান নির্ধারণের পাশাপাশি খানকাহকে বসবাসরত লোকদের মধ্যে সম্পর্ক এবং শেখ তথা পীর ও সাধারণ লোকজনদের মধ্যে পারম্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করত।

দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে ইসলাম জগতে বিভিন্ন প্রান্তে সুফি 'সিলসিলার' উৎপত্তি হতে থাকে। 'সিলসিলা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল শিকল, যা ধর্মগুরু এবং অনুগামীদের মধ্যে ধারাবাহিক একটি সম্পর্ককে নির্দেশ করে। এছাড়াও পয়গম্বর সহম্পদের সাথে তাদের অটুট আধ্যাত্মিক সম্পর্ককে বোঝায়। এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি এবং আশীর্বাদ পুণ্যর্থীদের কাছে পৌঁছত। দীক্ষিত তথা ব্রতীকে নিষ্ঠার শপথ দিতে হতো এবং মস্তক মুন্ডন করে, তাপ্পি (patched) লাগানো বস্ত্র পরিধান করতে হত।

পির তথা শেখ এর মৃত্যুর পর, তাঁর দরগাহ তাঁর অনুগামীদের জন্য উপাসনার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হত। তাঁর সমাধিতে তাঁর অনুগামীরা ধর্ম চর্চা করত, বিশেষ করে তাঁর মৃত্যু বার্ষিকীতে এই অনুষ্ঠান রীতিকে উৎস (বিবাহ, যার অর্থ পিরের আত্মার সাথে ঈশ্বরের মিলন) বলা হত। কারণ জনগণ বিশ্বাস করতেন যে, মৃত্যুর পর পিরদের ঈশ্বরের সাথে মিলন ঘটত। এই ভাবে জীবিত থাকার চেয়েও মৃত্যুর পর পিরগণ ঈশ্বরের আরোও নিকটে চলে যেত। মানুষ আধ্যাত্মিক এবং পর্থিব জগতের কামনা বাসনাকে পরিপূর্ণ করার জন্য উনার আশীর্বাদ চাইত। এইভাবে শেখ অথবা পিরকে ওয়ালী (সিদ্ধপুরুষ) হিসেবে সম্মান করার প্রথা শুরু হয়।

সুফিবাদ এবং তাসাউফ

সুফিবাদ হল একটি ইংরেজি শব্দ যা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত হয়। ইসলামীয় গ্রন্থে উল্লেখিত 'তাসাউফ' শব্দটি সুফিবাদের জন্য ব্যবহৃত হয়। ঐতিহাসিকেরা এই শব্দটিকে বিভিন্ন উপায়ে উপলব্ধ করেছেন। অনেক পন্ডিত ব্যক্তিদের মতে, এই সুফি শব্দটি 'সুফ' থেকে এসেছে, যার অর্থ হল উল। এটা সেইসব মোটা উলের কাপড়কে নির্দেশ করে, যা সুফিরা পরিধান করত। অন্যদের মতে, সুফি শব্দটির এসেছে 'সাফা' থেকে। যার অর্থ হল শুদ্ধতা। আবার 'সুফ্ফা' নামক শব্দ থেকেও এর উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে। যা ছিল পয়গম্বরের মসজিদের বাইরে একটি পাটাতন, যেখানে ঘনিষ্ঠ -অনুগামীদের একটি গোষ্ঠী আস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য একত্রিত হতো।

সিলসিলাগুলোর নাম

অধিকাংশ সুফি বংশের নামকরণ তাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে হয়েছিল। উদাহরণ স্বরুপ, কাদিরি সিলসিলাটি শেখ আব্দুল কাদির জিলানি এর নামানুসারে হয়। এছাড়া অন্য সিলসিলা গুলোর নামকরণ তাদের জন্মস্থান অনুসারে হয়। যেমন-চিস্‌তি নামটি মধ্য আফগানিস্থানের চিস্‌তি শহর থেকে নেওয়া হয়।

ওয়ালি (বহুবচন 'আউলিয়া'র) অর্থাৎ ঈশ্বরের মিত্র হলেন সেই সুফি যিনি নিজেকে ভগবানের (Allah) সান্নিধ্য হওয়ার দাবি করেন, এবং ঈশ্বরের কৃপাতে তারা অনেক কিছু করা মত তথা চমৎকার করতে পারতেন।

➲ আলোচনা করো ঃ

তোমাদের শহরে অথবা গ্রামে কী কোনো ঘানবাহ বা দরগা আছে? এইগুলো কবে নির্মিত হয়েছিল, এবং এই দরগা বা ঘানবাহ গুলোর সাথে কী কী ক্রিয়াকলাপ জড়িত তা সন্ধান করো। এমন অন্যকোনো জায়গা আছে কী, সেখানে ধার্মিক পুরুষ ও মহিলারা মিলিত হয় অথবা বসবাস করে?

6.2 খানকাহ ব্যাতীত অন্য সম্প্রদায়গণ

কিছু রহস্যবাদীরা সুফি আদর্শগুলোর মৌলিক ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে নতুন আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁরা খানবাহগুলোকে তিরস্কৃত করে ফকির তথা ভিক্ষুর জীবন অতিবাহিত করত। তাঁরা ধর্মানুষ্ঠান তথা ক্রিয়াকান্ডকে উপেক্ষা করত, এবং ব্রহ্মচর্য পালন ও কঠোর তপস্যা সাধন করত। তাদের বিভিন্ন নামে জানা যেত। যেমন– কলন্দর, মাদারি, মালঙ্গ , দায়দারি প্রভৃতি। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে শরিয়া-এর অবজ্ঞা করার কারণে তাদের 'বে শরিয়া' বলা হত। এইভাবে শরিয়া এর পালনকারীদের 'বা-শরিয়া' বলা হত, যাদের সুফিদের থেকে আলাদা করে দেখা হত।

7. উপমহাদেশে চিসতি সিলসিলা

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতবর্ষে পাড়ি দেওয়া সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে চিস্‌তি গোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ছিল। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, এই গোষ্ঠীর লোকেরা শুধুমাত্র স্থানীয় আদব কায়দাই রপ্ত করেনি, সাথে সাথে তাঁরা ভারতীয় ভক্তি পরম্পরার অনেক বৈশিষ্ট্য গুলোকেও রপ্ত করেছিল।

7.1 চিস্‌তি খানকাহাদের জীবনী

খানবাহ সামাজিক জীবনের কেন্দ্র বিন্দু ছিল। আমরা শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া (আনুমানিক চর্তুদশ শতাব্দী) -এর খানকাহ (ধর্মশালা) সম্পর্কে অবগত অছি , যেটা তৎকালীন দিল্লী শহরের উপকণ্ঠে যমুনা নদীর তীর গিয়াসপুরে অবস্থিত ছিল। সেখানে অনেক ছোটো ছোটো কক্ষ এবং একটি বড়ো হলঘর (জমাতখানা) ছিল যেখানে আবাসিক ও অতিথিরা থাকতেন এবং প্রার্থনা করতেন। এই হল ঘরের নিবাসী তথা আবাসিকদের মধ্যে শেখ তথা পরি এর নিজের পরিবারের সদস্যগণ, সেবক এবং শিষ্যবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিল। শেখ তথা পরি, হল ঘরের ছাদের উপর একটি ছোটো কক্ষে বাস করতেন, সেখানে তিনি অতিথিদের সাথে সকাল সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ করতেন। প্রাঙ্গাণটিকে ঘিরে একটি বারান্দা ছিল এবং ঘানবাহ এর চর্তুদিক একটি পাচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। একবার মোঙ্গাল আক্রমনের ভয়ে প্রতিবেশী অঞ্চলের জনগণ খানবাহ-তে আশ্রয়ের জন্য দলবেঁধে ছুটে আসে।

চিস্‌তি সিলসিলার প্রধান ধর্মগুরুগণ

সুফিধর্মগুরু	মৃত্যু বর্ষ	দরগা এর অবস্থান
শেখ মৈনুদ্দিন চিস্‌তি	1235	আজমীর (রাজস্থান)
খাজা কুতবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী	1235	দিল্লী
শেখ ফরিদউদ্দিন গজ-ই-শাকর	1265	অজোধান (পাকিস্থান)
শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া	1325	দিল্লী
শেখ নাসীরুদ্দিন চিরাগ-ই-দেহলী	1356	দিল্লী

সেখানে একটি উন্মুক্ত রন্ধনশালা (লঙ্গার) ছিল যা, 'ফুতুহ' বা অযাচিত দানের উপর নির্ভর করে চলতো। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সমাজের সকল অংশের জনগণ—সৈন্য, দাস, গায়ক, বণিক, কবি, যাত্রী, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু যোগীর, তথা কলন্দরগণ শিষ্যত্ব গ্রহণ, আরোগ্য লাভের জন্য তাবিজ-সংগ্রহ অথবা অন্যান্য বিভিন্ন ব্যাপারে শেখ-এর মধ্যস্থতা লাভের জন্য তাঁর কাছে আসত। শেখ-এর সাথে দেখা করতে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে আমীর হাসান সিজ্জী এবং আমীর খসরুর মত কবিগণ এবং রাজদরবারের ইতিহাসকার জিয়াউদ্দিন বারুনীর মতো ব্যক্তিত্বও ছিলেন। এরা সবাই শেখ সম্পর্কে লিখে গেছেন। শেখ-এর সামনে মাথা নোয়ানো, দর্শনার্থীদের জলপান করানো, দীক্ষালাভকারীদর মাথা ন্যাড়াকরা এবং যোগ-ব্যায়ামের মতো প্রথা বা রীতি-নীতিগুলোর দ্বারা বোঝা যায় যে, স্থানীয় ঐতিহ্যের সাথে একত্রিত হওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছিলো।

শেখ নিজামুদ্দিন তাঁর বেশ কয়েকজন উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন এবং উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে ধর্মশালা স্থাপন করার জন্য তাঁদের নিযুক্ত করেন। এই কারণে চিস্তিদের উপদেশ, রীতি-নীতি এবং সংগঠন তথা শেখ-এর খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে পরবর্তীকালে তাঁর দরগা সহ তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীদের দরগাগুলোতেও অনেক তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটে।

7.2 চিস্তি ভক্তিবাদ ঃ জিয়ারত এবং কাওয়ালী

সুফিসন্তদের সমাধীক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে করা তীর্থযাত্রা, যা জিয়ারত (*ziyarat*) নামে পরিচিত, তা সমস্ত মুসলিম জগতে লক্ষ্যণীয় ভাবে বিদ্যমান। এই প্রথার মাধ্যমে সুফিদের অধ্যাত্মিক আশীর্বাদ বা 'বরকত' প্রার্থনা করা হয়। সাতশ বছরেরও অধিক সময় ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণি তথা সমাজের সমস্ত অংশের মানুষ পাঁচজন মহান চিস্তি সন্ত-এর (পৃষ্ঠা নং 154 -এ দেওয়া সূচী দেখো) দরগার নিজেদের আস্থা প্রকাশ করে আসছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধেয় হল খাজা মইনউদ্দিনের দরগা, যিনি 'গরীব নওয়াজ' (দরিদ্রদের সান্তনাদাতা) নামে জনপ্রিয়।

চতুর্দশ শতকের গ্রন্থগুলোতে খাজা মইন উদ্দিন চিস্তির দরগার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। শেখ মইন উদ্দিনের নিষ্ঠা তথা ধার্মিকতা, তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীগণের মহানুভবতা এবং রাজকীয় অতিথিদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দরগা

দাতা গঞ্জ বক্স -এর কাহিনী

আফগানিস্থানে গজনীর নিকটবর্তী হুজবির এর এক বাসিন্দা আবুল-হাসান-অল-হুজবিরি 1039 খ্রিস্টাব্দে হানাদার তুর্কি সৈন্যদের বন্দি হিসেবে সিন্ধুনদ পার হতে বাধ্য হন। তিনি লাহোরে বসবাস করতে শুরু করেন এবং পার্সী ভাষায় ''কস্ক-উল-মহজুব'' (অবগুণ্ঠিতের আবরণ উন্মোচনে) শিরোনামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তসওফ-এর অর্থসহ এটা পালনকারী অর্থাৎ সুফিদের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা।

1073 খ্রিস্টাব্দে হুজবিরি মারা যান এবং তাঁকে লাহোরে সমাধিস্ত করা হয়। সুলতান মাহম্মদ গজনীর প্রপৌত্র তাঁর সমাধিস্থলে একটি দরগা নির্মাণ করান এবং এই দরগাটি তাঁর অনুগামীদের কাছে, বিশেষতঃ তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে, এক তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে। আজও হুজবিরি 'দাতা গঞ্জ বক্স' রূপে সন্মানিত হন এবং তাঁর দরগা "দাতারদরবার" নামে পরিচিত।

চিত্র 6.12
শেখ নিজাম উদ্দিন আউলিয়া এবং তাঁর শিষ্য আমীর খসরুর একটি চিত্র যা সতেরশো শতাব্দীতে আঁকা।

➲ চিত্রশিল্পী তাঁর চিত্রে নিজাম উদ্দিন এবং তাঁর শিষ্যের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য দেখিয়েছেন– তা বর্ণনা করো।

বস্তুতই ঃ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মহম্মদ-বিন-তুঘলক ছিলেন প্রথম সুলতান যিনি এই দরগায় আসেন। কিন্তু পনেরশ শতাব্দীর শেষের দিকে শেখ মইনউদ্দিনের সমাধীতে মালাবের সুলতান গিয়াসউদ্দিন খলজি। প্রথম ইমারত নির্মাণে অর্থ সাহায্য করেন দিল্লী এবং গুজরাটের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী বাণিজ্য-পথের পাশে দরগাটি অবস্থিত হওয়ার প্রচুর যাত্রী তাদের যাত্রাপথে এর দ্বারা আকর্ষিত হত।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে এই দরগাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বস্তুত আজমীর ভ্রমণে যাওয়া তীর্থযাত্রীদের সঙ্গীতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্রাট আকবর ঐ দরগা দর্শনে যান। তিনি সেখানে মোট চোদ্দোবার গিয়েছিলেন। নতুন বিজয় অভিযানে যাওয়ার পূর্বে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে, প্রতিজ্ঞাপূরণ করতে এবং পুত্রসন্তান জন্মাবার পর সেখানে বৎসরে কখনও কখনও দুই বা তিনবার ও যান। 1580 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই ধারা বজায় রাখেন। প্রত্যেকবার দর্শনে গিয়ে সম্রাট আকবর প্রচুর দান-দক্ষিণা করতেন। যার বিবরণ রাজকীয় দলিলে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তীর্থযাত্রীদের ভোজন রান্নার জন্য 1568 খ্রিস্টাব্দে তিনি সেখানে একটি বিশাল ডেকচি দান করেন। তিনি দরগা চত্বরে একটি মসজিদ নির্মাণ করান।

চিত্র 6.13
শেখগণ আজমীর -এ তীর্থযাত্রায় আসা সম্রাট জাহাঙ্গীরকে স্বাগত জানাচ্ছেন। এটি আনুমানিক 1615 খ্রিস্টাব্দে মনোহর নামক চিত্রশিল্পীর আঁকা।

➲ চিত্রে চিত্রশিল্পীর হস্তাক্ষর খুঁজে বের করো।

উৎস 7

1643 খ্রিস্টাব্দে মোগল শাহজাদী জাহানারার তীর্থযাত্রা

নিম্নলিখিত উদ্বৃতাংশটি 'মুনিস -অল-অরওয়াহ' (অর্থাৎ আত্মার বিশ্বস্ত সাথী) শিরোনামে জাহানারার রচিত শেখ মইনউদ্দিন চিস্তির জীবনী থেকে নেওয়া :

আল্লার প্রশংসা শেষে...এই ফকির জাহানারা... রাজধানী আগ্রা হতে নিজ পিতার (বাদশাহ শাহজাহান) সাথে পবিত্র এবং অতুলনীয় আজমিরের দিকে যাত্রা শুরু করি... আমি এই ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম যে, প্রতিদিন প্রত্যেক বিরামস্থানে অতিরিক্ত দুইবার প্রার্থনা করব...

বেশ কিছুদিন যাবৎ ...রাত্রিবেলায় আমি চিতাবাঘের চামড়ার উপর ঘুমাইনি, আমার পায়ের পাতা ঐ শ্রদ্ধেয় আশীর্বাদ ধন্য দরগার দিকে রাখিনি এবং তাঁর দিকে পিছন ফিরে থাকিনি। আমি দিনগুলো গাছের নীচে কাটিয়ে দিই।

রমজান মাসের চতুর্থ দিন, বৃহস্পতিবারে চিরাগের আলোয় আলোকিত ও আতরের গন্ধে সুবাসিত দরগায় আমি আমার তীর্থযাত্রার আনন্দলাভ করি। দিনের এক ঘন্টা আলো বাকি থাকতে আমি পবিত্র দরগায় প্রবেশ করে আমার ফ্যাকাশে মুখমন্ডলের উপর প্রবেশস্থলের ধূলো মেখে নিই। চৌকাঠ হতে আশীর্বাদ ধন্য দরগা পর্যন্ত আমি খালি পায়ে সেখানকার মাটিকে চুম্বন করতে করতে যাই। ভেতরে প্রবেশ করার পর সমাধিক্ষেত্রের চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করি... শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় শেখ সাহেবের সুবাসিত সমাধীক্ষেত্রের উপর নিজ হাতে সর্বোৎকৃষ্ট আতর ছড়িয়ে দিই। এবং আমার মাথা থেকে গোলাপী উড়না খুলে সেটি সমাধীর উপর রাখি...

➲ জাহানারা শেখ মইনউদ্দিনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি তথা সম্মান প্রদর্শনের জন্য কী কী করেছিলেন?
তিনি কীভাবে বুঝিয়ে দেন যে দরগা একটি বিশেষ স্থান ছিল?

সমগ্র দেশের চিরাগ
(The lamp of the entire land)

প্রতিটি সুফি দরগার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্য থেকে আগত দরগা কুলি খান নামক এক ব্যক্তি তাঁর মুরক্কা-এ-দেহলী (দিল্লীর অ্যালবাম) নামক পুস্তকে নাসিরুদ্দিন চিরাগ-ই-দিল্লীর দরগা সম্পর্কে লেখেন :

শেখ (যিনি কবরখানায় শায়িত) শুধুমাত্র দিল্লীর চিরাগনন, তিনি সমগ্র দেশের চিরাগ। লোকেরা দলবেঁধে সেখানে যায় -বিশেষতঃ রবিবারে। দিপাবলীর মাসে দিল্লীর সমস্ত জনগণ দরগা দর্শনে আসে এবং ঝর্ণা দীঘির পাশে তাবু খাঁটিয়ে বেশ কয়েকদিন বসবাস করে। তারা দুরারোগ্য ব্যাধী হতে মুক্তিলাভের আশায় স্নান করে। হিন্দু-মুসলিম উভয় অংশের জনগণ একইরকম উৎসাহ নিয়ে দরগা দর্শনে আসে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকজন সেখানে আসে এবং গাছের ছায়ায় হাসি-খুশীতে সময় কাটায়।

সঙ্গীত এবং নৃত্যও 'জিয়ারত' এর অংশ, বিশেষ করে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত সঙ্গিত শিল্পী বা কাওয়ালদের দ্বারা রহস্যময়ী গুণগান যার দ্বারা ঐশ্বরিক পরমানন্দ লাভের ভাবনাকে জাগ্রত করা হয়। সুফিসন্তরা 'জিক্র' (ঈশ্বরের নামাবলি) অথবা 'সমা' (আক্ষরিক অর্থে-শ্রবণ করা) অর্থাৎ রহস্যময়ী সঙ্গিতের দ্বারা ঈশ্বরের উপস্থিতির আহ্বান জানিয়ে তাঁকে স্মরণ করতেন। 'সমা' ছিল চিস্তিদের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটি প্রমাণ করে যে, চিস্তিরা স্থানীয় ভক্তিমূলক ঐতিহ্যের সাথে জড়িত ছিল।

আমির খসরু এবং কওয়াল

শেখ নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার শিষ্য, মহান কবি তথা সঙ্গিতজ্ঞে আমির খসরু (1253-1325 খ্রিঃ) 'কওয়াল' (আরবীতে যার অর্থ 'বাণী') সংযোজন করে চিস্তি 'সমা'কে একটি বিশেষ রূপদান করেন। 'কওয়াল' হল এক ধরনের স্তবগান বা স্তোত্র যা কওয়ালীর শুরু অথবা সমাপ্তির সময় গাওয়া হত। এর পরে পার্সি, হিন্দভি অথবা উর্দু ভাষায় কবিতা পাঠ করা হতো। এবং মাঝে মাঝে এই তিনটি ভাষার শব্দই এতে থাকতো। শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগার কওয়ালরা (যারা এ ধরনের সঙ্গিতে গায়) সবসময় 'কৌল' দিয়েই তাদের সঙ্গিত শুরু করে। বর্তমানে এই উপমহাদেশের সমস্ত অংশেই কওয়ালী গাওয়া হয়ে থাকে।

চিত্র 6.14
নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগার 'কওয়ালী' গাওয়া হচ্ছে।

➲ এই গানটির অভিপ্রায় এবং অভিব্যক্তির পদ্ধতির সাথে জাহানারার 'জিয়ারৎ'-এ (উৎস-7) বর্ণিত অভিব্যক্তির পদ্ধতির কী সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখতে পাও ?

7.3 ভাষা এবং যোগাযোগ

শুধুমাত্র 'সমা'তেই চিস্তিরা স্থানীয় ভাষাতে গ্রহণ করেনি। দিল্লীতে চিস্তি সিলসিলার লোকেরা হিন্দভি ভাষায় কথা বলত যা ছিলো সাধারণ লোকেদের ব্যবহৃত ভাষা। বাবা ফরিদের মতো অন্য সুফিরা স্থানীয় ভাষায় কাব্য রচনা করেন যেগুলো গুরুগ্রন্থসাহেবের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য কিছু সুফি দীর্ঘ-কবিতা বা মস্‌নভি রচনা করেন যেগুলোর উদ্দেশ্য ছিল মানবপ্রেমকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাকে ব্যক্ত করা। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে মালিক মহম্মদ জয়সী রচিত 'পদ্মাবৎ নামক প্রেমকাহিনী চিতোরের রাজা রতনসেন এবং পদ্মিনীর ভালোবাসার মধ্যেই আবর্তিত হয়। তাদের ভালবাসা ছিল পরমাত্মার সাথে আত্মার মিলনের প্রতীকস্বরূপ। এই ধরনের কাব্যধর্মী রচনাগুলো প্রায়শইঃ ধর্মশালাগুলোতে সাধারণত 'সমা'র সময় পাঠ করা হত।

কর্ণাটকের বিজাপুর শহরের আশেপাশে অন্য এক শৈলীর সুফি কাব্য রচিত হয়। এগুলো ছিল দাখানী ভাষায় (উর্দুর অন্য একটি রূপ) রচিত ছোট কবিতা যেগুলোতে চিস্তি সুফিদের গুণগান করা হয়েছে, যারা ওই অঞ্চলে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বসবাস করতেন। সম্ভবত মহিলারা বাড়ি ঘরের টুকিটাকি কাজকর্ম যেমন– শষ্য-পেষন এবং সুতা কাটার সময় এগুলো গাইত। অন্যান্য কিছু রচনা লুরিনামা বা ঘুমপাড়ানি গান এবং শাদীনামা বা বিয়ের গান হিসেবে রচিত হয়। এটাও সম্ভব যে, এই অঞ্চলের সুফিরা এখানে আগে থেকেই চলে আসা ভক্তিপরম্পরা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। লিঙ্গায়েতদের দ্বারা রচিত কন্নড় বচন এবং পন্দোরপুরের সন্তদের দ্বারা রচিত মারাঠী অভঙ্গাগুলোও তাদের প্রভাবিত করে। এর মাধ্যমেই দাক্ষিণাত্যের গ্রামগুলোতে ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করে।

উৎস 8

চরখানামা

চরকার সুরে রচিত একটি গান :

যেমন ভাবে তুমি তুলো নাও, তেমনিভাবে জিক্র-ই -জালি করবে,
যেমনভাবে তুমি তুলো আলাদা করো,
তেমনিভাবে তুমি জিক্র-ই-কাল্বি করবে।
যেমন ভাবে তুমি সুতোকে পেঁচিয়ে ধরো,
তেমনি ভাবে জিক্র-ই-আইনি করবে।
জিক্র পেট থেকে বুকের মধ্য দিয়ে পর্যন্ত উচ্চারণ করা উচিত এবং একে
সুতোর মতো কণ্ঠ দিয়ে নামাও নিঃশ্বাস -প্রাশ্বাসের সুতোগুলো এক এক
করে গুনবে
হে সহোদরা, চব্বিশ হাজার পর্যন্ত গুনবে।
দিন-রাত্র এটা করবে আর একে তোমার পির-এর নিকট সমর্পণ করবে।

7.4 সুফিগণ এবং রাজ্য

চিস্তি সম্প্রদায়ের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল সংযম তথা আড়ম্বরহীন জীবনযাপন নির্বাহ করা এবং শাসন ক্ষমতা থেকে দূরত্ব বজায় রাখা। যদিও এর মানে এই নয় যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা। সুফিরা রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন অভিজাতদের থেকে অযাচিত অনুদান এবং দান গ্রহণ করতেন। এর বিনিময়ে সুলতানগণ তাদের পুণর্বাসনের জন্য ওয়াকফ হিসেবে দাতব্য সংস্থা স্থাপন করেন এবং কর হীন জমি (ইনাম) অনুদান হিসেবে দিতেন।

চিস্তিরা দান হিসেবে অর্থ এবং বস্তু গ্রহণ করতেন। এই সমস্ত দানকৃত অর্থ ও সামগ্রী জমিয়ে রাখার পরিবর্তে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা (যেমন 'সমা') প্রভৃতির জন্য সেগুলো সম্পূর্ণ ব্যায় করে ফেলতেন। এ সমস্ত কারণে 'শেখ' এর নৈতিক অধিকারের ব্যাপারটি উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছতো। যার ফলে সমাজে সর্ব অংশের জনগণ তাদের দ্বারা আকর্ষিত হত। সুফিসন্তদের ধর্মনিষ্ঠা, পান্ডিত্য এবং তাদের অলৌকিক ক্ষমতার উপর জনগণের আস্থা– এসমস্ত কারণে তাঁদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এ সমস্ত কারণে রাজা বা শাসকগণও তাঁদের সমর্থন লাভ করতে চাইতেন।

শাসকদের বা রাজাদের শুধুমাত্র সুফিসন্তদের সাথে তাদের সম্পর্ক প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তাই ছিল না, তাঁদের অনুমোদন বা সমর্থনলাভেরও দরকার হতো। যখন তুর্কীরা দিল্লী সুলতানী প্রতিষ্ঠা করে তখন উলেমাদের দ্বারা শরিয়া আইন কার্য্যকর করার জোরালো দাবীকে নস্যাৎ করে দেয়। কারণ তাদের অধিকাংশ প্রজাই ছিল অমুসলিম সম্প্রদায়ের এবং তাঁরা ধারণা করেন এসব প্রজারা এর নিশ্চিত বিরোধিতা করবে। তখন সুলতানরা উলেমাদের দ্বারা শরিয়ার ব্যাখ্যা শোনার পরিবর্তে (ঈশ্বর থেকে সরাসরি ক্ষমতা-প্রাপ্ত বলে ধরে নেওয়া) সুফিসন্তদের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

পাশাপাশি এটাও মানা হত যে, সাধারণ জনগণের পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির জন্য আউলিয়াগণ ঈশ্বরের সাথে মধ্যস্থতা করতে পারতেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই শাসকরা সুফি দরগা এবং সুফিসন্তদের নিকটবর্তী অঞ্চলে নিজেদের সমাধিক্ষেত্র নির্মাণ করতে চাইতেন।

তবে সুলতান এবং সুফিদের মধ্যে মতবিরোধের উদাহরণও রয়েছে। নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির করতে দুইপক্ষই মাথা নুইয়ে তথা পায়ের পাতা চুম্বনের মতো নির্দিষ্ট কিছু আচরণ প্রত্যক্ষ করত। কখনও কখনও সুফি শেখদের আড়ম্বরপূর্ণ পদবী দিয়ে সম্বোধন করা হত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার অনুগামীরা তাঁকে সুলতান -উল- মশাইখ (আক্ষরিক অর্থে শেখদের মধ্যে সুলতান) বলে সম্বোধন করত।

সুফিগণ এবং রাজ্য

অন্যান্য কিছু সুফিসম্প্রদায়, যেমন–দিল্লী সুলতানী যুগের সুরাবর্দী এবং মোগল আমলের নক্সবন্দীরাও রাজ্যের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। যদিও তাদের সংযোগের ধরন চিস্তিদের থেকে আলাদা ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুফিরা রাজদরবারের পদও গ্রহণ করতেন।

➲ আলোচনা করো ঃ

ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্ভাব্য উৎসগুলো কী কী ছিল ?

➲ এই গল্পে রাজ্য এবং সুফিদের মধ্যে সম্পর্কের কোন্ দিক্‌গুলো খুব ভালোভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে বলে তুমি মনে কর ? শেখ এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সম্পর্কের ধরনগুলোর ব্যাপারে আমরা কী জানতে পারি ?

চিত্র 6.15
আকবরের রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে স্থাপিত শেখ সলিম চিস্তির (বাবা ফরিদ-এর বংশধর) দরগা। এটি চিস্তি সম্প্রদায় এবং মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতীক।

উৎস 9

রাজকীয় উপহার প্রত্যাখ্যান

নিম্নোক্ত উদ্ধৃতাংশটি একটি সুফি গ্রন্থ থেকে নেওয়া যাতে 1313 খ্রিস্টাব্দে শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার ধর্মশালার কার্য্যবিবরণী বর্ণিত হয়েছে :

আমার (আমির হাসার সিজজীর) ভাগ্য ভালো যে, আমি তাঁর (শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার) চরনযুগলে চুম্বন করতে পেরেছি .... সে সময় এক স্থানীয় শাসক দুইটি বাগানসহ আরোও জমির মালিকানাসত্ত্বের দলিল এবং এর সাথে ওই জমি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ এবং যন্ত্রপাতি তাঁর জন্য পাঠিয়েছিলেন। শাসক এ কথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন যে, ওই বাগান এবং জমির সমস্ত অধিকার তিনি পরিত্যাগ করছেন। মালিক ... এই উপহার গ্রহণ করেননি। পরিবর্তে তিনি আক্ষেপ করেন ঃ “বাগান, জমি, ভূমি এগুলো দিয়ে আমি কী করবো ? ... আমাদের কোনও আধ্যাত্মিক গুরুই এধরনের ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত হননি।”

এরপর তিনি একটি যথাযথ গল্প বলেন ঃ ‘সুলতান গিয়াসউদ্দিন, যিনি তখনও পর্যন্ত উলুগ খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি শেখ ফরিদুদ্দিনের সাথে দেখা করতে আসেন এবং কিছু টাকাপয়সা এবং চারখানা গ্রামের মালিকানা স্বত্ব শেখকে দান করেন। টাকাপয়সা ছিলো দরবেশদের (সুফিদের) জন্য এবং জমি ছিলো শেখের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য শেখ-অল-ইসলাম (ফরিদুদ্দিন) বলেন ঃ আমাকে টাকা-পয়সা দাও। আমি এগুলো দরবেশদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। কিন্তু জমির দলিলগুলো রেখে দাও। এমন অনেক লোক আছে যাদের জমির খুবই দরকার। ওই সমস্ত অভাবি লোকেদের এগুলো দিয়ে দাও”।

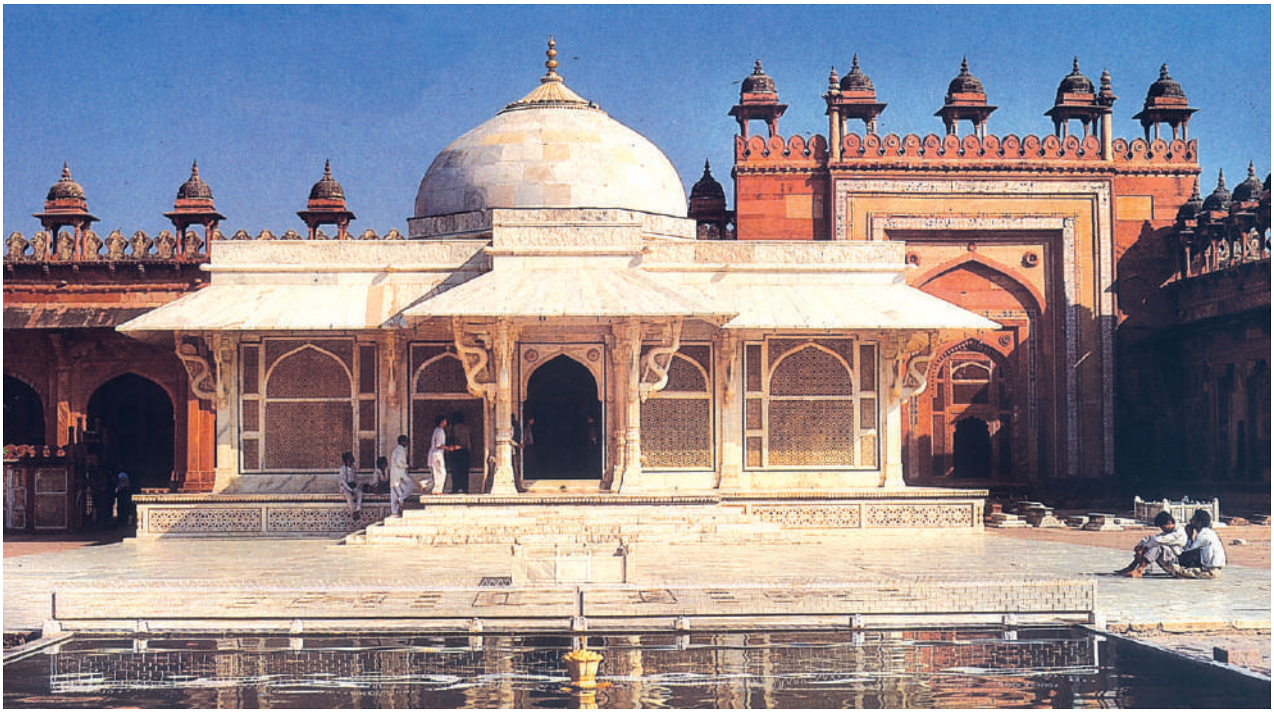

8. নব্যভক্তি পথ
উত্তর ভারতে ভাব-বিনিময় এবং মতবিরোধ

অনেক সন্তকবি নব্য-সামাজিক পরিস্থিতি, চিন্তাধারা এবং সংস্থাগুলোর সাথে স্পষ্ট এবং অন্তর্নিহিত-দুইভাবেই জড়িত ছিলেন। চলো-আমরা এখন দেখি যে এই সম্পর্কগুলো কীভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে? এখানে আমরা ওই সময়ের সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী তিনজন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো।

8.1 এক দিব্য বস্ত্র বয়ন ঃ কবীর

সম্ভবত এই প্রসঙ্গে উদিত হওয়া সন্ত-কবিদের মধ্যে কবীর (আনুমানিক সময়কাল চর্তুদশ-পঞ্চদশ শতাব্দী) ছিলেন অন্যতম। তাঁর জীবন এবং তৎকালীন সময়কে জানার চেস্টায় ঐতিহাসিকগণ কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা করে প্রণয়ন করা রচনা সহ পরবর্তীকালে রচিত উক্ত জীবনগুলো অধ্যয়ন করেন। এই চর্চাগুলো অনেক কারণে বেশ কঠিন কাজ ছিল।

কবীরের বাণীসমূহ তিনটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কিন্তু পরস্পর ব্যাপ্ত ঐতিহ্যে সংকলন করা হয়েছে। বারাণসী সহ উত্তর প্রদেশের কয়েকটি স্থানে কবীর পন্থিদের দ্বারা "কবীর বিজক" সংরক্ষিত করা হয়েছে। 'কবীর গ্রন্থাবলী' রাজস্থানের দাদুপন্থিদের অনুষঙ্গী। উনাঁর রচনা 'আদি গ্রন্থ সাহেব' (ভাগ 8.2 দেখো) দেখতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত পান্ডুলিপিগুলোর সংকলন কবীরের মৃত্যুর অনেক পরে হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে তাঁর পদাবলীর সংকলনের মুদ্রণ বাংলা, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের মতো দূরবর্তী স্থানেও প্রচারিত হয়।

কবীরের দোহাগুলো বেশ কিছু ভাষা এবং উপভাষার প্রচলিত আছে; এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু দোহা নির্গুণ কবিদের বিশেষ ভাষায় রচিত যা 'সন্তভাষা' নামে পরিচিত। অন্যান্য রচনা যেগুলো উলটবাসী (উল্টোবলী বাণী) নামে পরিচিত। অন্যান্য রচনা, এমনভাবে রচিত হয় যে, প্রাত্যহিক জীবনে সব সময় সেগুলো যে অর্থে ব্যবহৃত হয় —সেই অর্থ বিভ্রাট ঘটে। এগুলো পরম সত্যের স্বরূপকে শব্দের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। "যে পদ্ম ফোঁটে ফুল ছাড়া" অথবা "সমুদ্রে লাগা আগুন" -এর মতো অভিব্যক্তি গুলোতে কবীরের রহস্যময়ী অনুভূতি প্রকাশ পায়।

পরম সত্যের বর্ণনা করতে গিয়ে কবীর যে দোহা রচনা করেন, সেগুলো বেশ আকর্ষণীয়। ইসলামী দর্শনের মতোই তিনি পরম সত্যকে আল্লাহ্, খোদা, হজরত এবং পীর বলতেন, বেদান্ত দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি একে অলখ (অদৃশ্য) নিরাকার (আকার বিহীন); ব্রাহ্মণ, আত্মা-প্রভৃতি নামে সম্বোধন করতেন। 'শব্দ' অথবা 'শূন্য' এর মতো যোগী পরম্পরা থেকে নেওয়া অন্যান্য রহস্যময়ী অর্থবহ শব্দ বা পদ তিনি ব্যবহার করেন।

উৎস 10

এক ঈশ্বর

নিম্নোক্ত রচনাটি কবীরের বলে ধরে নেওয়া হয়

ভাই, আমাকে বলো —তা কি করে হয়-
যে, একজন নয়, বিশ্বের দুইজন প্রভু?
কে তোমাকে বিপথে চালিত করেছে?
ঈশ্বরকে অনেক নামে ডাকা হয়,
যেমন আল্লা, রাম, করিম,
কেশব, হরি এবং হজরত।
স্বর্ণকে আংটি বা চুড়ির
রূপ দেওয়া যেতে পারে,
এ সবই কি স্বর্ণ নয়?
বিভিন্নতা তো কেবলমাত্র শব্দে
যেগুলো আমরাই আবিষ্কার করি...
কবীর বলেন যে, দুজনই ভ্রান্ত
এদের মধ্যে কেউই রামকে খুঁজে পায়না।
একজন ছাগল হত্যা করে, তো
অন্যজন করে গোহত্যা
তারা তাদের জীবন বাদানুবাদের মধ্য দিয়েই নষ্ট করে দেয়।

➲ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য করনের বিরুদ্ধে কবীর কী যুক্তি দেখিয়েছেন?

এ ধরনের কাব্যে নানাবিধ এবং কখনো কখনো পরস্পর বিরোধী ভাবধারাগুলোকে প্রকাশ করা হয়েছে। কিছু কিছু কাব্যে হিন্দু ধর্মের বহুত্ববাদ এবং মূর্তিপূজাকে আক্রমণ করার জন্য ইসলামী দর্শনের একেশ্বরবাদ এবং মূর্তিপূজার বিরোধিতার কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য কিছু কাব্যে হিন্দু রীতিনীতির 'নাম-সিমরন' (ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা) অভিব্যক্ত করার জন্য সুফি ধারণার 'জিক্র' এবং 'ইস্ক' (প্রেম) রীতির অনুসরণ করা হয়েছে।

এই সমস্ত কাব্যগুলো কি কবীরের দ্বারা রচিত হয়েছিল? এটা আমরা কখনোই নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না। যদিও এদের মধ্যে কোনগুলো আসলেই কবীরের রচনা এটা নির্ণয় করার জন্য পন্ডিতরা এই পদ্যগুলোর ভাষা, শৈলী এবং বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। কবীরের পদ্যসমূহের সমৃদ্ধ রচনা সংকলনের তাৎপর্য্য এটাই যে, কবীর পূর্বে এবং বর্তমানেও ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য, একটি প্রেরণার উৎস, যারা সত্যের খোঁজে মৌলবাদী, ধর্মীয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধারণা এবং রীতিনীতির উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে।

চিত্র 6.16
পথিপার্শ্বস্থ বাদ্যকারগণ। এটি সপ্তদশ শতাব্দীর একটি মোগল চিত্র। খুব সম্ভবত এ ধরনের গায়কগণ সন্তদের রচনাগুলো সুর করে গাইতেন।

কবীরের চিন্তাধারা সম্ভবতঃ অবধ-এ (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের অংশ) সুফি এবং যোগী পরম্পরার সাথে আলোচনা এবং বিতর্কের (ব্যক্ত এবং অব্যক্ত) মাধ্যমে ঘনীভূত হয়। তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে বেশ কিছু গোষ্ঠী দাবী জানায় যারা তাঁকে মনে রেখেছিলো এবং আজও মনে রেখে চলছে।

তিনি জন্মগতভাবে হিন্দু ছিলেন না মুসলমান পরবর্তীকালে উঠা এই বিতর্ক থেকেও সুস্পষ্ট এবং এই বিতর্ক সমূহ অনেক সন্ত চরিতেও প্রতিফলিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই সপ্তদশ শতাব্দী হতে অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশার প্রায় 200 বছর পর থেকে রচিত হয়।

বৈষ্ণব পরম্পরার মহাপুরুষদের জীবনিগুলোতে কবীরকে ('কবীর' একটি আরবী শব্দ-যার অর্থ মহান) বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে কবীরদাস হিসেবে, যিনি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু পালিত হয়েছিলেন এক দরিদ্র তাঁতি বা জুলাহা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এক মুসলমান পরিবারে, যারা নতুন নতুন ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। জীবনীগুলোতে আরোও বলা হয়েছে যে, খুব সম্ভবতঃ রামানন্দ কবীরকে ভক্তির পথে নিয়ে আসেন।

যদিও কবীরের পদ্যগুলোতে 'গুরু' এবং 'সৎগুরু' শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু এগুলোতে কোনও নির্দিষ্ট গুরুর নাম উল্লেখ করা হয়নি। ঐতিহাসিকগণ দেখিয়েছেন যে, কবীর এবং রামানন্দ একে অপরের সমসাময়িক— এটা প্রমাণ করা খুবই কষ্টসাধ্য, যদি না তাদের উভয়ের বা কোনও একজনের আয়ুষ্কাল অসম্ভব রকমের দীর্ঘ ছিলো। অতএব যেসব পরম্পরা তাদের দু'জনকে সংযুক্ত করে সেগুলো হয়তো গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু এগুলো থেকে এটা অবশ্যই জানা যায় যে কবীরের উত্তরাধিকারীর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

8.2 বাবা গুরুনানক এবং পবিত্র বাণী

বাবা গুরুনানকের (1469-1539 খ্রিঃ) জন্ম এক হিন্দু বণিক পরিবারে হয়েছিল। তাঁর জন্মস্থল ছিল প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত পাঞ্জাবের নানকানা সাহিব গ্রাম, যা রাভী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। তিনি ফার্সি ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং হিসাব পরীক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষন নেন। খুব অল্প বয়সেই তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও তাঁর অধিকাংশ সময় কেটেছিলো সুফি এবং ভক্তদের মাঝেই। তিনি অনেক দূর-দূরান্তেও ভ্রমণ করেছিলেন।

বাবা গুরুনানকের বাণী তাঁর ভজন এবং উপদেশগুলোতে লুকিয়ে রয়েছে। এগুলো থেকে জানা যায় যে, তিনি এক প্রকার নির্গুণ ভক্তির প্রবক্তা ছিলেন। ধর্মের সকল বাহ্যিক আড়ম্বরকে তিনি অস্বীকার করেন। তিনি যজ্ঞ, ধর্মীয় স্নান, মূর্তিপূজা, তপস্যা এবং হিন্দু ও মুসলিম ধর্মগ্রন্থসমূহকে অগ্রাহ্য করেন। গুরুনানকের মতে পরম বা 'রব' এর লিঙ্গ বা আকার ছিল না, তিনি রব এর উপাসনার জন্য সরলপথ নির্দেশ করেন এবং তা ছিলো 'রবের' নিরন্তর স্মরণ বা নাম জপ করা। তিনি তাঁর চিন্তাধারা ওই অঞ্চলের পাঞ্জাবী ভাষায় 'শব্দ' নামক স্তবগানের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। বাবা গুরুনানক ওই সমস্ত 'শব্দ' ভিন্ন ভিন্ন রাগ-এ গাইতেন এবং তাঁর সেবক, যার নাম ছিলো মরদানা, তিনি রবাব বাজিয়ে তাঁকে সঙ্গ দিতো।

বাবা গুরুনানক তাঁর অনুগামীদের একটি সম্প্রদায়ে সংগঠিত করেন। তিনি সমবেত উপাসনা বা 'সঙ্গাত' এর নিয়ম নির্ধারণ করেন। যাতে যৌথভাবে পাঠ করা হতো। তিনি তাঁর এক শিষ্য -অঙ্গাদকে গুরু হিসেবে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন এবং পরবর্তী প্রায় 200 বছর ধরে এই উত্তরাধিকারী মনোনয়নের প্রথা অনুসরণ করা হয়।

এটা প্রতীয়মান হয় যে, বাবা গুরু নানক কোনো নতুন ধর্ম স্থাপন করতে চাননি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর অনুগামীরা তাদের নিজস্ব রীতিনীতি সংবদ্ধ করে এবং নিজেদের হিন্দু তথা মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্র করে রাখে। পঞ্চম শিখ গুরু অর্জুন বাবা গুরুনানক তথা তাঁর চারজন উত্তরাধিকারী, যথা– বাবা ফরীদ, রবিদাস (যিনি রামদাস নামেও পরিচিত) এবং কবীরের বাণীসমূহ 'আদিগ্রন্থ সাহেব'-এ সংকলিত করেন। এগুলোকে 'গুরবাণী' বলা হয়ে থাকে এবং এগুলো বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে দশম শিখ গুরু গুরু গোবিন্দ সিং নবম শিখগুরু তেগ

বাহাদুরের রচনাসমূহও এতে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং এই গ্রন্থকে 'গুরু গ্রন্থ সাহেব' নামে অভিহিত করা হয়। গুরু গোবিন্দ সিং খালসা পন্থ (পবিত্রদের নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের পাঁচটি প্রতীকের বর্ণনা করেন ঃ না ছাঁটা কেশ, কৃপান (ছুরি), কচ্ছা (কৌপিন), কঙ্গা (চিরুনী) এবং লোহার কাড়া (চুড়ি)। গুরু গোবিন্দ সিংয়ের নেতৃত্বে এই সম্প্রদায়টি একটি ধর্মীয়-সামাজিক এবং সামরিক গোষ্ঠীরূপে সুদৃঢ় ভাবে গড়ে ওঠে।

চিত্র 6.17
তামিলনাড়ুতে প্রাপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর একটি পাথরের ভাস্কর্য্য। এতে বাঁশীবাদানরত অবস্থায় কৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে। মীরাবাঈ কৃষ্ণকে এই রূপেই উপাসনা করতেন।

8.3 ভক্ত রাজকুমারী মীরাবাঈ

মীরাবাঈ (আনুমানিক পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী) ভক্তি পরম্পরার সম্ভবত সর্বাধিক সুপ্রসিদ্ধ মহিলা কবি। মূলত তাঁর রচিত ভজন থেকেই তাঁর জীবনী সংকলন করা হয়েছে যেগুলো কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুখে মুখেই চলে আসছিলো। এগুলো থেকে জানা যায় যে, মীরাবাঈ ছিলেন মারওয়াবের মেড়তা অঞ্চলের এক রাজকুমারী। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজস্থানের মেবারের শিশোদিয়া বংশের এক রাজকুমারের সাথে তাঁকে বিয়ে দেওয়া হয়। তিনি তাঁর স্বামীকে মন থেকে মেনে নেননি এবং পত্নী তথা মা-এর চিরাচরিচত দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করেন। পরিবর্তে তিনি বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণকে নিজের একমাত্র স্বামী হিসেবে মনে মনে স্বীকার করেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে বিষ খাওয়াতে চেস্টা করে কিন্তু তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে যান এবং ঘুরে বেড়িয়ে সঙ্গীত রচনা করে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন শুরু করেন। উনার সঙ্গিতগুলোতে গভীর আবেগ ব্যক্ত হয়েছে।

উৎস 11

কৃষ্ণের প্রতি প্রেম

মীরাবাঈ রচিত একটি সঙ্গীতের অংশ নীচে দেওয়া হল :

আমি চন্দনকাঠ এবং ঘৃতকুমারীর একটি চিতা প্রস্তত করবো
আর একে তোমার নিজ হাত দিয়ে জ্বালিও
যখন আমি জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবো
সেই ভস্ম হাতে নিয়ে ঘ্রাণ নিও
অগ্নি শিখাকে অগ্নিশিখায় হারিয়ে যেতে দাও,

অন্য একটি পদ্যে তিনি বলেন

মেবারের শাসক আমার কী করতে পারবে ?
যদি ঈশ্বর রুষ্ট হন তবে সব ধ্বংস হয়ে যাবে,
কিন্তু মেবারের রাণা কী করতে পারে ?

➲ এ থেকে রাজার প্রতি মীরাবাঈয়ের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কী ইঙ্গিত পাওয়া যায় ?

কিছু কিছু পরম্পরা অনুসারে মীরাবাঈয়ের গুরু ছিলেন রাইদাস নামে এক চর্মকার (মুচি)। এ থেকে বোঝা যায় যে, মীরাবাঈ সমাজের প্রচলিত জাতিগত নিয়মকানুন অমান্য করেন। স্বামীর রাজপ্রাসাদের আরাম-আয়েস পরিত্যাগ করার পর সম্ভবত তিনি বিধবার শ্বেত বস্ত্র অথবা সন্ন্যাসীদের জন্য নির্ধারিত গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করেন।

যদিও মীরাবাঈয়ের প্রতি কোনও শিষ্য বা অনুগামীর দল আকর্ষিত হয়নি তবুও তিনি কয়েক শতাব্দী ধরে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন। তাঁর রচিত পদাবলী এখনও পুরুষ ও মহিলাদের দ্বারা গাওয়া হয়। বিশেষতঃ গুজরাট এবং রাজস্থানের ওই সব দরিদ্র শ্রেণির জনগণের দ্বারা-যারা নীচুজাতির লোক বলে গণ্য হয়ে থাকে।

শঙ্করদেব

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আসামে বৈষ্ণব ধর্মের মুখ্য প্রবক্তা হিসেবে শঙ্করদেবের উদ্ভব ঘটে। তাঁর উপদেশকে প্রায়শইঃ 'ভগবতী ধর্ম' নামে অভিহিত করা হয়। কারণ সেগুলো 'ভাগবৎ গীতা' এবং 'ভাগবত পুরাণ' -এর উপর ভিত্তি করে রচিত। এই উপদেশসমূহ সর্ব্বোচ্চ দেবতা বিষ্ণুর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণের উপর কেন্দ্রীভূত। শঙ্করদেব সৎসঙ্গে ভগবানের নামগান বা নাম-কীর্ত্তনের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রচারের জন্য সত্র ও মঠ এবং নামঘর স্থাপনে উৎসাহ দেন। এ সমস্ত অনেক প্রতিষ্ঠান এবং রীতিনীতি এই অঞ্চলে প্রসার লাভ করে চলছে। তাঁর প্রমুখ রচনার মধ্যে কীর্ত্তন-ঘোষাও রয়েছে।

➲ আলোচনা করো ঃ

তুমি কেন মনে কর যে, কবীর, বাবা গুরু নানক এবং মীরাবাঈ একবিংশ শতকেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক?

9. ধর্মীয় ঐতিহ্যের ইতিহাস পুনঃরচনা

আমরা দেখেছি যে, ইতিহাসবিদগণ ধর্মীয় ঐতিহ্যের ইতিহাস পুর্নগঠন করার সময় বিভিন্ন উৎস হতে উপাদান সংগ্রহ করেন। যেমন–ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, ধর্মগুরুদের কাহিনী পরমসত্যকে জানার উদ্দেশ্যে পুরুষ ও মহিলাদের দ্বারা রচিত কাব্য রচনা প্রভৃতি।

আমরা প্রথম ও চতুর্থ অধ্যায়ে দেখেছি যে, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যকলা—আমরা এই উদ্দেশ্যে তখনই ব্যবহার করতে পারি যখন ঐ প্রসঙ্গে আমরা খুব ভালো ভাবে বুঝি অর্থাৎ এই সমস্ত বস্তু এবং দালানবাড়ি নির্মাণ এবং এগুলো ব্যবহারকারীদের চিন্তাধারা, বিশ্বাস এবং আচার-আচরণের ব্যাপারে আমাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য থাকে। ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত সাহিত্য সম্পর্কে কী বলা যায়? যদি তোমরা এই অধ্যায়ে বর্ণিত উৎসগুলোতে ফিরে যাও তবে লক্ষ করবে যে, সেগুলোতে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে এবং সেগুলো বেশ কয়েকটি ভাষায় এবং শৈলীতে রচিত। কিছু কিছু উৎস সরল, স্পষ্ট ভাষায় রচিত। যেমন– বাসবন্নার বচন সমূহ, অন্যদিকে কিছু কিছু উৎস অলঙ্কৃত ফার্সী ভাষায় লিখিত। যেমন– মোগল সম্রাটের ফরমান। প্রত্যেক ধরনের রচনাগুলোকে বোঝার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতার প্রয়োজন। বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে পরিচিতির পাশাপাশি প্রত্যেক ভাষাশৈলীর সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কেও ঐতিহাসিকদের অবগত থাকা প্রয়োজন।

সুফি পরম্পরার ইতিহাস পুনঃরচনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উৎসসমূহ (Varieties of sources used to reconstructthe history of sufi traditions)

সুফি খানকাহদের আশেপাশে এবং অভ্যন্তরে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। যাদের মধ্যে রয়েছে :

1. সুফি চিন্তাধারা ও রীতিনীতির উপর রচিত পুস্তিকা -'কস্ফ-উল- মহজব'– এই শৈলীর একটি উদাহরণ, এটির রচয়ীতা আলি বিন উসমান হুজবিরী (মৃত্যু আনুমানিক 1071 খ্রিষ্টাব্দে)। এই গ্রন্থ ঐতিহাসিকদের এটা বুঝতে সাহায্য করে যে, উপমহাদেশের বাইরের পরম্পরাগুলো ভারতবর্ষে সুফি চিন্তাধারাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল।

2. মলফুজাত (আক্ষরিক অর্থে "উচ্চারিত" ঃ সুফি সন্তদের আলাপচারিতা) ঃ মলফুজাত-এর উপর রচিত প্রথমদিকের একটি গ্রন্থ হল–ফবাইদ-অল-ফুয়াদ। এর বিষয়বস্তু হল শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার কথোপকথন–যার সংকলন করেন বিশিষ্ট পার্সী কবি আমীর হাসান সিজজি দেহলাভী। উৎস-9 এ এই গ্রন্থের উদ্ধৃতাংশ রয়েছে। মূলফিজাতগুলো শেখ এর অনুমতিক্রমে বিভিন্ন সুফি সিলসিলাদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। এগুলো রচনার উদ্দেশ্য ছিল মূলত উপদেশাত্মক। দাক্ষিণাত্যসহ এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে অনেক উদাহরণের সন্ধান পাওয়া গেছে। কয়েক শতাব্দী ধরে এগুলো সংকলিত হয়েছিল।

3. মকতুবাত (আক্ষরিক অর্থে "লিখিত" পত্রের সংকলন); এ সমস্ত হল ভক্ত তথা সহকারীদের উদ্দেশ্যে লিখিত সুফিসন্তদের পত্রাবলী। এই পত্রগুলো হতে ধার্মিক সত্য সম্পর্কে শেখদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায়। সেগুলো তাঁরা অন্যদের কাছে প্রকাশ করতে চাইতেন। এগুলোতে পত্রপ্রাপকদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অসুবিধাসমূহের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়াসমূহও প্রতিফলিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট নক্সবন্দী শেখ আহমেদ সিরহিন্দি-এর (মৃত্যু 1624 খ্রিষ্টাব্দে) পত্রাবলী যেগুলো মক্তুবাত-ই-ইমান রব্বানী নামে পরিচিত যেগুলো পন্ডিতদের দ্বারা বহুল আলোচিত পত্রাবলীর মধ্যে অন্যতম। তাঁর আদর্শগুলোকে প্রায়শই আকবরের উদার এবং অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার সাথে তুলনা করা হয়।

4. তাজকিরা (আক্ষরিক অর্থে 'উল্লেখ' এবং 'স্মরণ'; সন্তদের জীবনীসমূহের বর্ণনা)– ভারতবর্ষে রচিত প্রথম সুফি তাজকিরা হল সিয়ার-উল-আউলিয়া। এর রচয়িতা ছিলেন মীর-খোর্দ-কিরমানী। এই তাজুকিরা ছিল মুখ্যত চিস্তি সন্তদের নিয়ে রচিত। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ তাজকিরা হল আবদুল-হক-মহাদ্দিস-দেহালভির (মৃত্যু--1642 খ্রিষ্টাব্দে) "অখবার-উল-অখইয়ার"। তাজকিরা রচয়ীতাগণ প্রায়শই নিজেদের সিলসিলার প্রাধান্য স্থাপন করতে এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক বংশকে মহিমান্বিত করতে চাইতেন। তাজকিরা গুলোর অনেক বর্ণনাই অদ্ভুত তথা কল্পনাপ্রসূত ছিল। তবুও এগুলো সুফিদের স্বরূপ অনুধাবন করার জন্য সহায়ক উপাদান হিসেবে ঐতিহাসিকদের কাছে খুব মূল্যবান।

আমাদের এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই অধ্যয়ে আলোচিত প্রত্যেক পরম্পরার সাথে অনেক সাহিত্যিক এবং মৌখিক বার্তা জড়িয়ে আছে। এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু উৎস বা উপাদান সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে, কিছু কিছু উৎসের রূপ পরিবর্তন হয়েছে এবং সম্ভবত অনেক উৎস বা উপাদান চিরতরে হারিয়ে গেছে।

এই সমস্ত ধার্মিক পরম্পরা আজও উন্নতিলাভ করে চলছে। ঐতিহাসিকদের জন্য এই ধারাবাহিকতা বিশেষ সুবিধাজনক কারণ এগুলো সমসাময়িক কালের রীতিনীতির সাথে সাহিত্য বা প্রাচীন চিত্রকলার বর্ণিত রীতিনীতির তুলনা করতে তথা পরিবর্তনগুলোর রূপরেখা তৈরীতে তাদের সহায়তা করে। এরই সাথে এই সমস্ত পরম্পরা যেহেতু জনসাধারণের বিশ্বাস এবং রীতিনীতির অংশ, সেহেতু কালের বিবর্তনে এগুলো যে পরিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে এই সম্ভাবনার গ্রহণ যোগ্যতার প্রায়শই কিছুটা ঘাটতি থেকে যায়। ঐতিহাসিকদের জন্য কঠিন ব্যাপার হল যে এই ধরনের অনুসন্ধান কার্যগুলো বেশ সংবেদনশীলতার সঙ্গে গ্রহণ করা। একই সাথে এটাও খেয়াল রাখা দরকার যে, অন্যান্য পরম্পরার মতো ধর্মীয় পরম্পরাও প্রগতিশীল এবং সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়।

সময়পঞ্জি
ভারত উপমহাদেশের কয়েকজন প্রধান ধর্মগুরু

আনুমানিক 500-800 খ্রিস্টাব্দ	তামিলনাড়ুতে আপ্পার, সম্বন্দর, সুন্দরমুর্তি।
আনুমানিক 800-900 খ্রিস্টাব্দ	তামিলনাড়ুতে নম্মলভর, মনিক্কভাচাকার, অন্ডাল তোন্দারাডিপ্পোডি।
আনুমানিক 1000-1100 খ্রিস্টাব্দ	পাঞ্জাবে অল–হুজবিরী, দাতা গঞ্জ বক্স, তামিলনাড়ুতে রামানুজাচার্য্য।
আনুমানিক 1100-1200 খ্রিস্টাব্দ	কর্ণাটকে বাসবন্না।
আনুমানিক 1200-1300 খ্রিস্টাব্দ	মহারাস্ট্র জ্ঞানদেব মুক্তাবাঈ; রাজস্থানে খাজা-মইনউদ্দিন চিস্তি; পাঞ্জাবে বাহাউদ্দিন জাকারিয়া এবং ফরিদুদ্দিন-গঞ্জ-ই-শাকার; দিল্লীতে কুতুবুদ্দিন-বখতিয়ার কাকি।
আনুমানিক 1300-1400 খ্রিস্টাব্দ	কাশ্মীরে লালদেদ; সিন্ধ-এ লাল শাহবাজ কলন্দর, দিল্লিতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া; উত্তরপ্রদেশের রামানন্দ, মহারাস্ট্র চোখামেলা, বিহারে শরাফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানেরী।
আনুমানিক 1400-1500 খ্রিস্টাব্দ	উত্তরপ্রদেশে কবীর, রাইদাস,সুরদাস; পাঞ্জাবে বাবা গুরুনানক, গুজরাটে বল্লভাচার্য্য, গোয়ালিয়রে আবদুল্লা সাত্তারী, গুজরাটে মোহম্মদ শাহ আলম, গুলবার্গের মীর সৈয়দ মোহাম্মদ গেসু দারাজ, আসামে শঙ্করদেব, মহারাষ্ট্রে তুকারাম।
আনুমানিক 1500-1600 খ্রিস্টাব্দ	বাংলায় শ্রীচৈতন্য, রাজস্থানে মীরাবাঈ; উত্তর প্রদেশে শেখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গহী, মালিক মোহাম্মদ জয়েসী এবং তুলসীদাস।
আনুমানিক 1600-1700 খ্রিস্টাব্দ	হরিয়ানায় শেখ আহম্মদ সিরহিন্দী; পাঞ্জাবে মিঁয়া মির।

বিঃ দ্রঃ এই সময়পঞ্জিতে এ সকল ধর্মগুরুদের আনুমানিক সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে।

উত্তর দাও (100-150 শব্দের মধ্যে)

1. বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন বলতে ঐতিহাসিকগণ কী বোঝাতে চেয়েছেন তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

2. ভারতীয় উপমহাদেশে মসজিদের স্থাপত্য শৈলীতে বিশ্বব্যাপী ব্যপ্ত আদর্শ এবং স্থানীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ কতদূর প্রতিফলিত হয়েছে বলে তুমি মনে কর?

3. সুফি পরম্পরার বে-শরিয়া এবং বা-শরিয়ার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো কী কী ছিল?

4. আলবার নয়নার এবং বীরশৈবরা কীভাবে জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা করেছিলেন তা আলোচনা করো।

5. কবীর অথবা বাবা গুরুনানক মুখ্য উপদেশ সমূহ তথা সেগুলো কীভাবে এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়েছে তা আলোচনা করো।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : 250-300 শব্দের মধ্যে :

6. সুফিবাদের মুখ্য ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রীতিনীতি সমূহ আলোচনা করো।

7. শাসক তথা রাজারা কেন এবং কীভাবে নয়নার এবং সুফিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইতেন তা অনুসন্ধান করো।

8. ভক্তি এবং সুফি সাধকগণ নিজেদের মতবাদ ব্যক্ত করার জন্য কেন বিভিন্ন ভাষার সাহায্য নেন, তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

9. এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পাঁচটি উৎস সম্পর্কে পড়ো এবং এগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত সামাজিক তথা ধর্মীয় ধারণাগুলো আলোচনা করো।

মানচিত্রের কাজ

10. ভারতের একটি রেখামানচিত্রে তিনটি সুফি ধর্মীয় স্থল এবং মন্দিরের সাথে সম্পর্কিত তিনটি স্থান (বিষ্ণু, শিব এবং দেবীর সাথে যুক্ত) চিহ্নিত করো।

প্রকল্প (যে কোনও একটি)

11. এই অধ্যায়ে বর্ণিত যেকোনও দু'জন ধর্মগুরুকে বেছে নাও। তাঁদের জীবন এবং উপদেশ সম্পর্কে আরোও তথ্য খুঁজে বের করো। তাঁদের সমসাময়িক কাল, কার্য্যক্ষেত্র এবং মুখ্য বিচারধারা সম্পর্কে একটি বিবরণ তৈরী করো। আমরা তাদের সম্পর্কে কীভাবে জানতে পারি এবং তাঁরা কেন গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে করো?

12. এই অধ্যায়ে বর্ণিত ধর্মীয় স্থানে তীর্থযাত্রার সাথে যুক্ত রীতি নীতি সম্পর্কে আরোও তথ্য সংগ্রহ করো। এই ধরনের তীর্থযাত্রা কি এখনও করা হয়ে থাকে? এই স্থানসমূহে কখন যাত্রা করা হয়? কারা ওই স্থানগুলোতে তীর্থযাত্রা করে এবং কেন? এ ধরনের তীর্থযাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপগুলো কী কী?

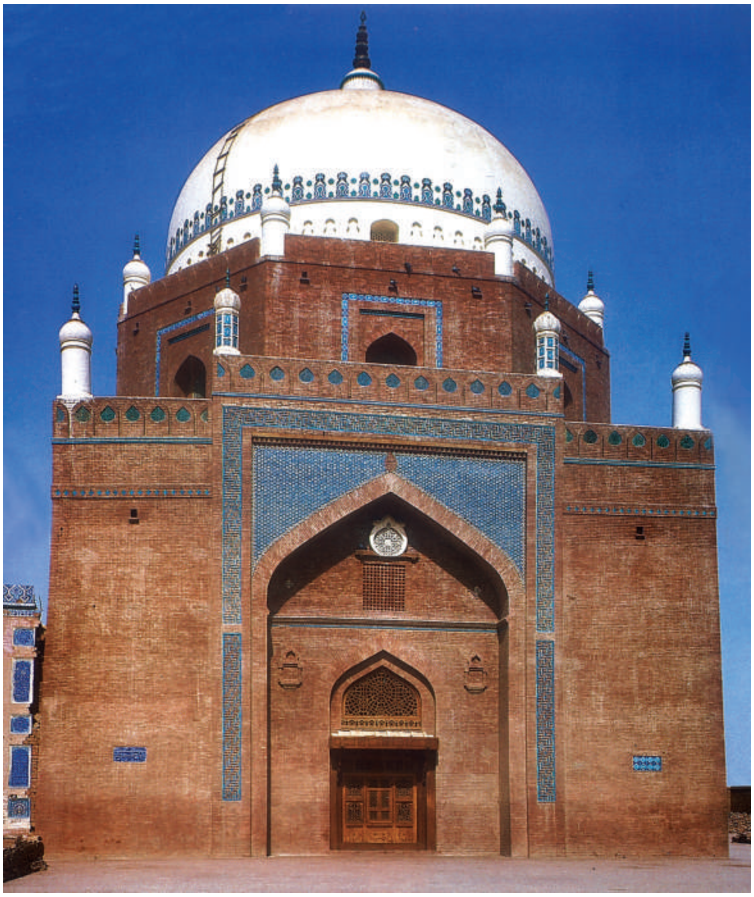

চিত্র 6.18
মুলতানে (পাকিস্থান) অবস্থিত শেখ বাহউদ্দিন জাকরিয়ায় দরগা

If you would like to know more, read:

Richard M. Eaton (ed). 2003. *India's Islamic Traditions.* Oxford University Press, New Delhi.

John Stratton Hawley. 2005. *Three Bhakti Voices Mirabai, Surdas and Kabir in their times and ours.* Oxford University Press, New Delhi.

David N. Lorenzen (ed.). 2004. *Religious Movements in South Asia 600-1800.* Oxford University Press, New Delhi,

A.K. Ramanujan. 1981. *Hymns for the Drowning.* Penguin, New Delhi.

Annemarie Schimmel. 1975. *Mystical Dimensions of Islam.* Univesity of North Carolina Press, Chapel Hill.

David Smith. 1998. *The Dance of Siva: Religion Art and Poetry in South India.* Cambridge Univesity Press, New Delhi.

Charlotte Vaudeville. 1997. *A Weaver Named Kabir.* Oxford University Press, New Delhi.

For more information, you could visit:
http://www.alif-india.com

বিষয়বস্তু
সাত

একটি সাম্রাজ্যের রাজধানী বিজয়নগর
(চতুর্থ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী)

চিত্র 7.1
বিজয়নগর শহরকে কেন্দ্র করে তৈরি পাথরের দেওয়ালের একটি অংশ

বিজয়নগর বা 'বিজয়ের শহর' ছিল একটি শহর এবং একটি সাম্রাজ্য উভয়েরই নাম, এই সাম্রাজ্যটি চতুর্দশ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উন্নতির চরম শিখরে থাকাকালীন এই সাম্রাজ্য উত্তরে কৃষ্ণা নদী থেকে উপদ্বীপের দক্ষিণের শেষ সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। 1535 সালে শহরটি পরিত্যক্ত এবং পরবর্তী সময়ে নির্জন হয়ে পড়ে। যদিও এটি সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছিল, তবু কৃষ্ণ-তুঙ্গাভদ্রাদোয়ার অঞ্চলে বসবাস কারী মানুষের স্মৃতিতে হাম্পি নামে এটি বেঁচে ছিল। পম্পা দেবী নামে স্থানীয় দেবীমাতার নাম থেকে এই হাম্পি নাম উদ্ভুত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, স্মৃতি স্তম্ভ এবং শিলা লিপি এবং অন্যান্য তথ্যের সাথে মিলিত হয়ে এই মৌখিক ঐতিহ্যগুলো বিজয়নগর সাম্রাজ্যকে পুনরায় আবিষ্কার করতে পন্ডিতদের সাহায্য করেছিল।

1. হাম্পির আবিষ্কার

কর্ণেল কলিন ম্যাকেনজি নামে একজন প্রকৌশলী এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ দ্বারা 1800 সালে হাম্পির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্মচারী হিসেবে তিনি এই স্থান প্রথম ব্যাপক ভাবে নিরক্ষণ করে মানচিত্র প্রস্তুত করেন, তাঁর প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যের বেশির ভাগ অংশটি ছিল বিরূপাক্ষ মন্দির এবং পম্পাদেবীর মন্দিরের পুরোহিতদের স্মৃতি ভিত্তিক, এরপরে, 1856 সাল থেকে ফটো গ্রাফাররা স্মৃতি সৌধগুলো তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন, যা পন্ডিত ব্যক্তিদের বিস্তৃত ভাবে গবেষণা করতে সাহায্য করে। 1836 সালের প্রথম দিকে লিপিকারগণ হাম্পির এই মন্দির সহ অন্যান্য মন্দিরগুলোতে কয়েক ওজন শিলালিপি খুঁজে পান। ঐতিহাসিকরা সেই সব প্রত্নলিপি, বিদেশী পরিব্রাজকদের বিবরণী এবং সেই সঙ্গো তামিল, তেলেগু, কনোজ এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য ইত্যাদিকে ভিত্তি করে শহর এবং সাম্রাজ্যের ইতিহাস পুর্ণগঠনে সচেষ্ঠ হন।

উৎস - 1

কলিন ম্যাকেনজি

কলিন ম্যাকেনজি 1754 সালে জন্ম গ্রহণ করেন। কলিন ম্যাকেনজি ইঞ্জিনিয়ার, সার্ভেয়ার এবং মানচিত্রকার হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন, 1815 সালে তিনি ভারতের প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হন। 1821 সালে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ভারতের অতীতকে আরও ভালো ভাবে বুঝতে এবং উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাকে সহজ ভাবে পরিচালনা করতে স্থনীয় ইতিহাস সংগ্রহ এবং ঐতিহাসিক স্থান সমীক্ষা শুরু করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, "মহান ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসার পূর্বে এই দেশ বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত দীর্ঘ দিন অপশাসনে জর্জরিত ছিল। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, বিজয়নগর রিতে অনুসন্ধান করে কোম্পানী এই সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অবহিত হয়েছে, বিভিন্ন আইন ও রীতিনীতি সম্পর্কে তথ্য অর্জন করেছে, যার প্রভাব এখনও স্থানীয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজ করছে এবং এখন পর্যন্ত সাধারণ জনগণকে একত্রিত করে রেখেছে, তার সম্পর্কে অবহিত হয়েছে।

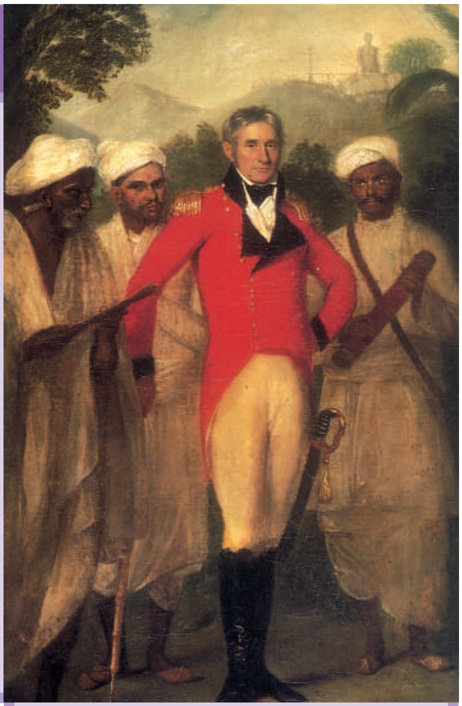

চিত্র 7.2

ম্যাকেঞ্জি ও তাঁর সহকারীরা। অজ্ঞাত চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবি থেকে এই চিত্রটি তৈরি করেছেন টমাস হিকি। আনুমানিক 1825 খ্রিষ্টাব্দের এই চিত্রটি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব ব্রিটেন এন্ড আয়ারল্যান্ডের সংগ্রহে রয়েছে। ম্যাকেনজির বাঁ দিকে তাঁর পিয়ন কিস্তনাজি একটি দূরবিন ধারণ করেছেন, তাঁর ডানদিকে ব্রাহ্মণ সহায়ক একজন জৈন পন্ডিত এবং তাঁর পেছনে তেলেগু ব্রাহ্মণ কাভিলারি ভেন্টক লেটচামিয়া দাঁড়িয়ে আছেন।

➲ শিল্পী কীভাবে ম্যাকেনজি এবং তার দেশীয় তথ্য দাতাদের চিত্রিত করেছেন? তাঁর এবং তথ্য দর্শকদের সম্পর্কে ধারণা দর্শকদের উপর কী প্রভাব বিস্তার করে?

2. রায়, নায়ক এবং সুলতানগণ

বিজয়নগরের ঐতিহ্য এবং শিলালিপির প্রমাণ অনুসারে হরিহর এবং বুক্কা নামে দুই ভাই 1336 সালে বিজয় নগর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন ভাষাভাষি, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ, যারা অস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল সীমান্তে বসবাস করতো -তাদের নিয়েই এই রাজ্যটির আত্মপ্রকাশ।

বিজয়নগর রাজাদের উত্তরসীমান্তে তৎকালীন বিভিন্ন শাসকদের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হয়েছে। এইসব প্রতিপক্ষের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের সুলতান,উড়িষ্যার গজপতি শাকরা ছিলেন, উর্বরনদী উপত্যকা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্ভবনাময় কেন্দ্রগুলোর উপর আধিপত্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই যুদ্ধবিগ্রহ হয়। একই সাথে এই রাজ্যগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ঘটে। বিশেষতঃ স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মত বিনিময় হয়। বিজয়নগরের শাসকরা যে ধারণা এবং নির্মাণ কৌশল ধার করেছিলেন সেগুলোকে পরবর্তীকালে আরও উন্নত করেন।

কর্ণাটকের সামরাজ্যমু

ঐতিহাসিকরা বিজয়নগর সাম্রাজ্য শব্দটি ব্যবহার করলেও সমসাময়িকরা এটিকে *কর্ণাটক সাম্রাজ্যমু* হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

চিত্র 7.3
থানজাবুরের বৃহদীশ্বর মন্দিরের গোপুরম বা প্রবেশদ্বার।

হাতি, ঘোড়া ও মানুষ

গজপতির আক্ষরিক অর্থ হল হাতিদের ঈশ্বর। এটি একটি শাসক বংশের নাম যা পঞ্চদশ শতাব্দীতে ওড়িষ্যায় খুব শক্তিশালী ছিল। বিজয়নগরের এই জনপ্রিয় ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে দাক্ষিণাত্যের সুলতান অশ্বপতি বা ঘোড়ার দেবতা এবং রায়রা নরপতি বা মানুষের দেবতা হিসেবে অভিহিত হন।

সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি অঞ্চল শক্তিশালী রাজ্যের বিকাশের সাক্ষী ছিল। যেমন, তামিলনাড়ুতে চোলরা এবং কর্ণাটকের হোয়াসালারা। এই অঞ্চলগুলোতে অভিজাত শাসক গোষ্ঠী থানজাবুরের বৃহদীশ্বর মন্দির এবং বেলুরের চেন্নকেশভা মন্দিরে সম্প্রসারণে পৃষ্ঠপোষকতার হাত বাড়িয়ে দেন। বিজয়নগরের শাসকরা, যারা নিজেদেরকে রায় বলে অভিহিত করেছিলেন তারা পূর্ববর্তী রীতিনীতির ধারাকেই গ্রহণ করেন এবং মান্যতা দেন এবং আমরা দেখবো যে তারা প্রকৃত অর্থেই রাজ্যটিকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যান।

2.1 রাজা এবং ব্যবসায়ীরা

তৎকালীন সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহে অশ্বরোহী বাহিনী ছিল অপরিহার্য্য। বিবাদমান রাজ্যগুলোর জন্য আরব এবং মধ্য এশিয়া থেকে ঘোড়া আমদানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমদিকে এই বাণিজ্যটি আরবব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলো যারা কুদিরাই চেটিস বা ঘোড়া ব্যবসায়ী নামে পরিচিত ছিল তারা এই বিনিময় ব্যবসায় অংশ নিত। 1498 সাল থেকে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা এই ব্যবসায় আসতে শুরু করে। পর্তুগীজরা উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলে এসে বাণিজ্য ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের চেস্টা করে। তাদের উন্নত মানের সামরিক প্রযুক্তি বিশেষত বন্দুকের ব্যবহার তাদেরকে সময়ের জটিল রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

প্রকৃতপক্ষে, বিজয়নগর মশলা, বস্ত্র এবং মূল্যবাণ পাথরের বাজারের জন্য ও বিখ্যাত ছিল। এই ধরনের শহরগুলোতে ব্যবসা বাণিজ্য প্রায়শই আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হত, এই শহরগুলোতে বিত্তবাণ শ্রেণির লোক বসবাস করত যাদের কাছে মূল্যবাণ পাথর এবং অলঙ্কারের বিশেষ চাহিদা ছিল। পরিবর্তে বাণিজ্য থেকে

প্রাপ্ত রাজস্ব রাজ্যের সমৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

2.2 সাম্রাজ্যের চরম উৎকর্ষ ও পতন

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের এক বিশেষ মুহূর্তে রাজপরিবারের সদস্যদের সাথে সেনানায়কদের মধ্য থেকেও সিংহাসনের জন্য দাবি উঠতে থাকে। সঙ্গাম রাজ বংশ ছিল প্রথম রাজবংশ। যারা 1485 খ্রীঃ পর্যন্ত ক্ষমতায় আসীন ছিল। সালুভ যারা মূলতঃ সেনাপতি ছিলেন তাদের দ্বারা ঐ রাজবংশ ক্ষমতাচ্যুত হয়। সালুভরা 1503 খ্রীঃ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল। তারা তুলুভদের দ্বারা ক্ষমতা চ্যুত হয়। কৃষ্ণদেব রায় তুলুভ রাজবংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

কৃষ্ণদেব রায়ের শাসনকাল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ও দৃঢ়করণের জন্য উল্লেখযোগ্য ছিল। তাঁর রাজত্বকালে তুঙ্গাভদ্রা এবং কৃষ্ণা নদীর (রায়চুর দোয়াব) মধ্যবর্তী অঞ্চল অধিগ্রহণ করা হয়। (1512 খ্রীঃ)। উড়িষ্যার শাসকরা তাঁর পদানত হয় (1514) এবং বিজাপুরের সুলতান ও তাঁর কাছে নির্মমভাবে পরাজিত হয় (1520)। যদিও সব সময় সাম্রাজ্যের সামরিক প্রস্তুতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। তবুও অতুলনীয় শান্তি এবং সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যটি বিকাশলাভ করে। কৃষ্ণদেব রায় কয়েকটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন এবং দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলোতে আকর্ষনীয় গোপুরাম বা প্রবেশপথ নির্মাণ করান। তিনি মায়ের স্মৃতিতে নাগালাপুরম নামে বিজয়নগরের কাছে একটি উপনগর প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়নগর সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত যে বিবরণ পাওয়া যায় তা কৃষ্ণদেব রায়ের বা ঠিক তার পরবর্তী সময়ের।

1529 সালে কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পরে সাম্রাজ্যে প্রবল অস্থিরতা দেখা দেয়। তাঁর উত্তরসূরিরা বিদ্রোহী নায়ক বা সামরিক প্রধানদের দ্বারা সমস্যায় পড়েন। 1542 সাল নাগাদ কেন্দ্রীয় ক্ষমতা আরাবিদু নামে অপর এক শাসক বংশের কাছে চলে যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই বংশ ক্ষমতায় ছিল। এই সময়কালের কিংবা এর পূর্ব থেকে বিজয়নগর এবং দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের সামরিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের বিভিন্ন জোট গঠনে উৎসাহিত করে। এরফলে শেষ পর্যন্ত বিজয়নগরের বিরুদ্ধে সুলতানদের একটি জোট তৈরি হয়। 1565 সালে বিজয় নগরের প্রধানমন্ত্রী রাম রায় সেনাবাহিনী নিয়ে টাঙ্গাদি (তালিকোটা নামেও পরিচিত) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, এবং সেখানে তার সেনা বাহিনী বিজাপুর, আহমেদনগর এবং গোলকোন্ডার সম্মিলিত সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়। বিজয়ী সেনাবাহিনী দ্বারা বিজয়নগর শহর লুণ্ঠিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যে শহরটি পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়। এরপর সাম্রাজ্যের কেন্দ্র বিন্দুটি পূর্ব দিকে

উৎস 2

রাজা এবং ব্যবসায়ীরা

বিজয়নগরের সর্বাধিক বিখ্যাত শাসক কৃষ্ণদেব রায় তেলেগু ভাষায় রাষ্ট্রবিদ্যার উপরে একটি বই লিখেছিলেন যা আমুক্ত মাল্যদা নামে পরিচিত। ব্যবসায়ীদের সমন্ধে তিনি লিখেছেনঃ

> অশ্ব, হাতি এবং মূল্যবাণ পাথর, চন্দন কাঠ, মুক্তা ও অন্যান্য দ্রব্যাদির আমদানি ও ব্যবসায় উৎসাহ প্রদানের জন্য রাজা রাজ্যের বন্দরগুলোর উন্নতি সাধন করবেন। ..... সামুদ্রিক ভড় কিংবা আকস্মিক অসুস্থতা বা অবসাদে বিপন্ন নাবিক যদি বাধ্য হয়ে তাঁর দেশে নোঙ্গার করে, তবে তাদের যথাযোগ্য সংস্থান করা রাজার অবশ্য কর্তব্য ... বিদেশী বণিক যারা দেশে উন্নত জাতের হাতি ও ঘোড়ার যোগান দেয় -এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা এবং এদের বক্তব্য শোনা এবং বাণিজ্যে লাভের সুযোগ করে দেওয়া রাজার কর্তব্য। তাহলে প্রয়োজনীয় মূল্যবাণ সামগ্রী কখনোই শত্রুর হাতে চলে যাবে না।

➲ রাজা কেন ব্যবসা বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেন বলে তুমি মনে কর? কোন শ্রেণির লোক এই সমস্ত লেনদেনের ফলে উপকৃত হত?

মানচিত্র 1

দক্ষিণ ভারত, চতুর্দশ থেএক অষ্টাদশ শতক

➲ তৎকালীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বর্তমানের রাজ্যগুলোকে চিহ্নিত করো।

স্থানান্তরিত হয়। যেখান থেকে অরবিন্দু রাজবংশ পেনকুন্ডা এবং পরে চন্দ্রগিরি (তিরুপতির নিকটে) থেকে শাসন কার্য পরিচালনা করত।

যদিও সুলতানদের সেনাবাহিনী বিজয়নগর শহর ধ্বংসের জন্য দায়ী ছিল, তবুও সুলতান এবং রায়দের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক কখনো ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ, কৃষ্ণদেব রায় একটা সময় সুলতানির উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত বিবাদ নিঃরসনে ভূমিকা নেন এবং 'যবন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গৌরব বোধ করেন। একই ভাবে, কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পরে বিজয়নগরের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিজাপুরের সুলতানও মধ্যস্থতা করেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুই রাজ্যের রাজারা একে অন্যের রাজ্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে একে অপরকে সহায়তা করেন। রামরায় এক সুলতানকে অপরের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেওয়ার দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন। পরিণামে দুই সুলতান একত্রিত হয়ে তাঁকে পরাজিত করে।

'যবন' একটি সংস্কৃত শব্দ যার দ্বারা গ্রীকদের এবং অন্যান্য সেইসব লোকদের বোঝানো হয়। যার উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ভারত উপমহাদেশে প্রবেশ করে।

2.3 রায় এবং নায়কগণ

সাম্রাজ্যের ক্ষমতা যাদের হাতে ছিলো তারা ছিল সেনানায়ক। তারা দুর্গগুলো নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং সশস্ত্র সেনাবাহিনীর সমর্থক ছিলেন। এই সর্দাররা প্রায়শই এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতো, অনেকক্ষেত্রে তাদের সাথে কৃষকরাও যেতো এবং বসতি স্থাপনের জন্য উর্বর জমি খুঁজে বেড়াতো। এই সেনাপতিরা 'নায়ক' হিসাবে পরিচিত ছিল এবং তারা সাধারণত তেলেগু বা কন্নড় ভাষায় কথা বলত। অনেক নায়করা ছিল বিজয়নগরের রাজাদের অনুগত। আবার এদের মধ্যে অনেকে সামরিক শক্তিতে বলশালী হয়ে প্রায়শই বিদ্রোহও করতো।

'অমারানায়ক' ব্যবস্থা ছিল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের একটি প্রধান রাজনৈতিক অভিনবত্ব। সম্ভবত এই পদ্ধতির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য দিল্লি সুলতানীর 'ইক্তা' প্রথা থেকে নেওয়া হয়েছিল।

'আমারা নায়করা' ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান, যারা 'রায়' কর্তৃক প্রদান করা অঞ্চলে শাসন করতেন। তারা ওই অঞ্চলে কৃষক, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কর এবং অন্যান্য বকেয়া আদায় করত। তারা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এবং এক হস্তি ও অশ্বরোহী বাহিনীর পারিশ্রমিকের জন্য রাজস্বের কিছু অংশ রেখে দিতো। বিজয় নগরকে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে এসব সেনানায়কদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এবং এদের সাহায্যেই সমগ্র দক্ষিণ ভারতীয় উপদ্বীপ বিজয় নগর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজস্বের কিছু অংশ মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেচের কাজের জন্য ব্যবহৃত হত।

'অমারা নায়ক'রা প্রতিবছর রাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে রাজদরবারে তাদের আনুগত্য প্রকাশের জন্য উপহার নিয়ে হাজির হতেন। রাজারা মাঝে মধ্যে তাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করে তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন, তবে, সপ্তদশ শতাব্দীর সময়কালে, এই নায়কদের অনেকেই স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সূচনা হয়।

'অমারা' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'সমারা' শব্দ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়। সমর শব্দের অর্থ হল যুদ্ধ। এর সাথে পারস্য শব্দ আমিরেরও মিল রয়েছে, যার অর্থ আভিজাত্য।

➲ আলোচনা করো ঃ

মানচিত্র 1 এ নায়কদের দ্বারা শাসিত চন্দ্রগিরি, মাদুরাই, এক্কেরি, তান্দাভুর এবং মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চল সমূহ চিহ্নিত করো। যে সকল নদী এবং পাহাড়গুলো বিজয় নগরের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় সহায়ক হতো বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করো।

3. বিজয়নগর রাজধানী এবং এর পারিপার্শ্বিক অঞ্চল

অপরাপর রাজধানীগুলোর মতোই, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য তার, প্রাকৃতিক অবস্থান ও নির্মাণ শৈলীতে প্রকাশিত।

চিত্র 7.4
বিজয়নগরের পরিকল্পনা

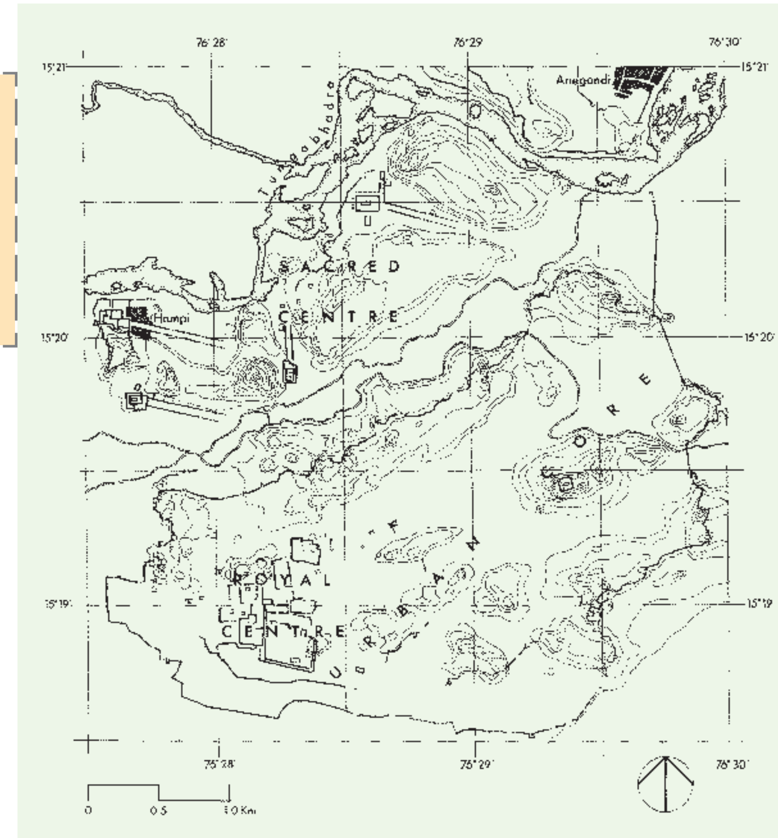

উৎস 3

➲ বিজয়নগর পরিকল্পনায় ৩টি প্রধান অঞ্চল চিহ্নিত করো। কেন্দ্রীয় অংশের দিকে তাকাও। তুমি কী নদীর সাথে সংযোগ রক্ষাকারী কোনও খাল দেখতে পাচ্ছো ? তুমি ক-টি দুর্গ প্রাচীর খুঁজে বের করতে পারো তা দেখো। পবিত্র কেন্দ্রটি সুরক্ষিত ছিল কি ?

শহর সম্পর্কে অনুসন্ধান

বিজয়নগরের রাজা এবং তাদের নায়কদের দ্বারা মন্দিরগুলোতে বিভিন্ন সময়ে দেওয়া অনুদান তথা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তথ্য সম্বলিত বিপুল সংখ্যক শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে। অনেক পর্যটন এই শহর পরিভ্রমণ করে তাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, নিকোলো ডি কন্টি নামে এক জন ইতালিয়ান ব্যবসায়ী, পার্সিয়ার শাসক দ্বারা প্রেরিত আবদুর রেজ্জাক নামে একজন রাষ্ট্রদূত এবং রাশিয়ার আফানাসি নিকিতিন নামে এক বণিক এর দেওয়া বিবরণ। তারা সকলেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই শহরটি পরিদর্শন করে ছিলেন। ডুয়ার্তে, বার্বোসা, ডোমিংগো, পেইস এবং ফেরনাও নুনিজের মতো ব্যক্তিরা সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগাল থেকে সেখানে এসেছিলেন।

একটি বিস্তৃত শহর

এটি বিজয়নগর সম্পর্কে ডোমিংগো পেসের দেওয়া বর্ণনার একটি অংশ ঃ

'শহরটির আয়তন (আকার) সম্পর্কে আমি এখানে লিখছি না। কারণ কোনও এক স্থানে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ শহরটিকে দেখা যায় না। তাই আমি একটি পাহাড়ের উপর উঠলাম যেখান থেকে এর একটি বড় অংশ দেখতে পেলাম। বেশ কিছু পর্বতমালা জুড়ে শহরটি অবস্থিত হওয়ায় এর সম্পূর্ণ অংশটি একবারে দেখতে পেলাম না। সেখান থেকে আমি যা দেখতে পেলাম— আমার মনে হলো যে এটি রোম নগরীর মতোই বিশাল এবং দৃষ্টিনন্দন। এর মধ্যে অনেক সুদৃশ্য বাগান ছিল এবং জলের ফোয়ারা দ্বারা শহরটি সজ্জিত ছিল এবং অনেকগুলো জলাশয় (হ্রদ) ও ছিল। রাজা তাঁর রাজ প্রাসাদের নিকটেই বিভিন্ন তালগাছের সারিও নানা ফলবতী বৃক্ষের বনানী তৈরি করে রেখেছিলেন।

➲ তোমরা কি বর্তমানকালের কোন শহরে এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাও ? পেইস কেন নগরীর উদ্যান ও জলাশয়কে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলে তুমি মনে কর ?

3.1 জল সম্পদ

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক অববাহিকা যা উত্তরপূর্ব দিকে প্রবাহিত তুঙ্গাভদ্রা নদীর দ্বারা সৃষ্ট শহরটিকে মালার মতো ঘিরে রেখেছে, চমৎকার গ্রানাইট পাথরের পাহাড় এর শৈলশিরা থেকে প্রবাহিত হয়েছে অনেক জলধারা।

প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন ধরনের জলধারা তৈরি করতে এই জলধারায় বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। এটি উপদ্বীপের সর্বাধিক শুষ্ক অঞ্চল হওয়ায় বৃষ্টিপাতের জল সঞ্চয় করতে এবং তা শহরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিস্তৃত ব্যবস্থা করা হয়। এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ জলাধার পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত হয়েছিল এবং বর্তমানে এটি কমলাপুরাম জলাধার (ট্যাংক) নামে পরিচিত, এই জলাধারের জল কেবল আশেপাশের অঞ্চলে জলসেচের জন্যই ব্যবহৃত হত না, একটি খালের মাধ্যমে এই জল রাজধানী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হত।

এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে জল সরবরাহের যে চিত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল হিরিয়া খাল, তুঙ্গাভদ্রা নদীতে তৈরি একটি বাঁধ থেকে এই জল নিয়ে আসা হত এবং আবাদিকৃত এলাকায় জলসেচ করা হত। এটি সম্ভবত সঙ্গাম রাজবংসের রাজাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।

3.2 দুর্গ নির্মাণ এবং রাস্তাঘাট

নগরের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করার আগে আমাদের লক্ষ করতে হবে–দুর্গের প্রাচীরগুলোর দিকে। পঞ্চদশ শতকে পারস্যের শাসক আবদুর রেজ্জাক নামে একজন রাষ্ট্র দূতকে ক্যালিকটে (বর্তমান কেজিকোও) পাঠিয়ে ছিলেন, তিনি দুর্গ নির্মাণ শিল্পের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি দূর্গের সাতটি ধাপের উল্লেখ করেন। এগুলো কেবল শহরই নয়, এর কৃষি জমি এবং বনাঞ্চলকেও ঘিরে রেখেছে। বাইরের প্রাচীরটি শহরের চারপাশের পাহাড়গুলোর সাথে সংযুক্ত ছিল। এই বিশাল স্থাপত্য নির্মাণ কাজ কিছুটা কঠিন ছিল। কোন চুন বালির মিশ্রণ বা সিমেন্ট জাতীয় কোনও উপাদান এই নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়নি। পাথরের টুকরোগুলো ছিল শম্ভুক আকৃতির এগুলো একটি অপরটির সাথে যথাযথভাবে গাঁথা ছিল এবং দেওয়ালের ভেতরের ফাঁপা অংশে মাটি ও পাথরের কুচি দিয়ে ভরাট করা ছিল। বর্গাকার বা আয়তকার বুরুজস্থলে বাইরের থেকে দৃশ্যমান ছিল।

এই দূর্গ নির্মাণ সম্পর্কে সবচেয়ে তাৎপর্য আবদুর রেজ্জাক উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রাচীরের অভ্যন্তরে রয়েছে কৃষিজমি, বাগান এবং বাসগৃহ পেইস লক্ষ করেছেন, শহরের প্রবেশদ্বার থেকে শহরের ভেতরের দূরত্ব যথেষ্ট। এর

Source 4

জলধারাগুলো কীভাবে তৈরি হয়েছিল

কৃষ্ণদেব রায় দ্বারা নির্মিত একটি জলাধার সম্পর্কে, পেজ লিখেছিলেন ঃ

> রাজা একটি জলধার খনন করলেন—দুটি পাহাড়ের মুখে তৈরি যেখানে উভয় দিক থেকে জল এসে জমা হয়। তাছাড়াও তিন দিগের ও (প্রায় 15 কিমি) কিছুদূর থেকে পর্বতমালার নিচের অংশ থেকে পাইপের মাধ্যমে জল আনা হয়। এইজল যে জলাশয় থেকে আনা হয় সেটি স্থিত হতে একটি ছোট -নদী ও তৈরি করে। জলাধারাটিতে তিনটি বড় স্তম্ভ রয়েছে এবং এগুলোর গায়ে মনোরমচিত্র অঙ্কিত রয়েছে। এর থেকে নলের সাহায্যে উপরে অবস্থিত বাগান এবং ধানখেতে ও জল নিয়ে যাওয়া হত। এই জলাধারাটি নির্মাণ করতে রাজাকে একটি পাহাড়ও ভাঙ্গাতে হয়.... এই জলাধার নির্মাণের কাজে নিযুক্ত পনের থেকে কুড়ি হাজার শ্রমিককে আমি দেখেছি যাদের পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছিল।

চিত্র 7.5
রাজবাড়ির দিকে প্রবাহিত একটি জলধারা

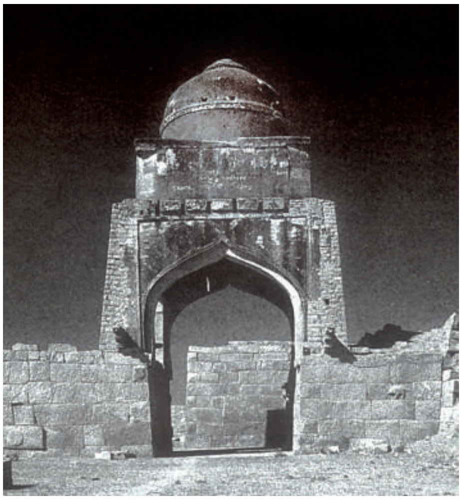

চিত্র 7.6
দূর্গের প্রাচীরে একটি প্রবেশদ্বার।

➲ দুটি প্রবেশদ্বারের মধ্যে কী কী সাদৃশ্যও বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা বর্ণনা কর? বিজয়নগর এর শাসকরা ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্য রীতি কেন গ্রহণ করেছিলেন, বলে তুমি মনে কর?

চিত্র 7.7
গোপুরম

অর্ন্তবর্তী স্থানে রয়েছে ধানক্ষেত, অনেক বাগান ও দুটি জলাশয় থেকে আগত প্রচুর জলরাশি, সাম্প্রতিক কালের ঐতিহাসিকদের আবিষ্কারের সঙ্গো ঐ বিদেশী পর্যটকদের বিবৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। তারা পবিত্র মধ্যভূমি শহরের অভ্যন্তরে অবস্থিত কৃষিক্ষেত্রের অবস্থান খুঁজে বের করতে সমর্থ হয়েছেন। তুঙ্গাভদ্রা নদী থেকে খালের মাধ্যমে জল এনে কৃষিজমিতে জল সেচ করা হত।

দূর্গ অঞ্চলের মধ্যে কৃষিজমি কেন তৈরি করা হয়েছিল বলে তুমি মনে কর? মধ্যযুগে প্রায়শই শত্রুপক্ষের দ্বারা অবরোধের উদ্দেশ্য দূর্গের অভ্যন্তরে থাকা লোকেদের অনাহারে রেখে বশ্যতা শিকার করানোর জন্য এই অবরোধগুলো কয়েকমাস এমন কি কখনও কখনও কয়েকবছর পর্যন্ত স্থায়ী হত। সাধারণত দূর্গের অভ্যন্তরে বড়ো বড়ো শস্যাগার তৈরি করে শাসকরা এ জাতীয় পরিস্থিতির মোকাবিলা করার চেস্টা করতেন। বিজয়নগরের শাসকরা কৃষিজমি রক্ষার জন্য আরও ব্যয়বহুল এবং বিস্তৃত কৌশল অবলম্বন করতেন।

দূর্গের দ্বিতীয় সুরক্ষা দেওয়ালটি নগরের অভ্যন্তর ভাগকে ঘিরে রেখেছিল এবং তৃতীয় দেওয়ালটি বিশেষ ইমারতের মতো উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

দূর্গের প্রবেশদ্বারগুলো ছিল প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত এবং এগুলো নগরের প্রধান প্রধান সড়কগুলোর সাথে যুক্ত ছিল। প্রবেশদ্বারগুলোতে স্থাপত্যরীতির নিদর্শণ ও স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। খিলানযুক্ত প্রবেশ পথটি দূর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখান থেকে গম্বুজ (চিত্র 7.6) পেরিয়ে আবাসিক এলাকায় যেতে হতো। এটি তুর্কী সুলতানদের স্থাপত্য রীতির উদাহরণ। ইতিহাসকরা এই রীতিকে ইন্দো-ইসলামিক রীতি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ এই রীতি বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় নির্মাণ কৌশলের সাথে যুক্ত হয়ে ক্রমাগত উন্নতি লাভ করছিলো।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা নগরের ভেতরের রাস্তা এবং বাইরে থেকে নগর অভিমুখী রাস্তাগুলো বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। নগর-অভিমুখী রাস্তা এবং পায়ে চলা রাস্তাগুলো খুঁজেই প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই সড়কগুলো চিহ্নিত করেছেন। সাধারণত রাস্তাগুলো পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো মন্দিরের প্রবেশদ্বার থেকে শুরু হয়ে বাজারগুলোর সঙ্গো যুক্ত ছিল।

3.3 শহরের মূল এলাকা

রাজধানীর নাগরিক এলাকার দিকে এগিয়ে গেলে এমন কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় না যা থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে এখানে সাধারণ জনগণের বসতি ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিককেরা নগর কেন্দ্রের উত্তর-পূর্ব অংশে কিছু সুন্দর চীনামাটির বাসন

খুঁজে পেয়েছেন। যা থেকে ধারণা করা যায় যে, এখানে ধনী ব্যবসায়ীদের আবাস ছিল। এই অঞ্চলে যে মুসলিম ধর্মাবলম্বী লোক বাস করত তা ও বুঝা যায়। এখানে অবস্থিত সমাধিসৌধ এবং মসজিদগুলোর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবুও তাদের স্থাপত্য শৈলীর বৈশিষ্ট্য হাম্পির মন্দির গুলোতে পাওয়া মন্ডপের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগিজ ভ্রমণকারী বার্বোসা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সাধারণ মানুষের বাড়িঘর বর্ণনা করেছেন। যা সাধারণ মানুষের ঘরগুলো খড় দিয়ে ছাওয়া। তবুও এগুলো ছিল সুরক্ষিত ও এদের সামনে ছিল প্রসস্ত রাস্তা ও উন্মুক্তভূমি এবং এখানে পেশা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ করা হত।

ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে পুরো এলাকায় অনেকগুলো পবিত্র ধর্মস্থান ছোট ছোট মন্দিরের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হওয়া গেছে এতে বুঝা যায় ওখানে এই সময় বিভিন্ন ধরনের উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং সে সঙ্গে এখানে বিভিন্ন ধরনের উপাসকরাও বসবাস করতেন। অনুসন্ধানে এটাও বোঝা যায় যে কুয়োর জল, বৃষ্টির জল সৃষ্টি হওয়া জলাশয় এবং পুকুরের জলেই সাধারণ এলাকাবাসীরা জলের প্রয়োজন মিটাতো।

চিত্র 7.8
খনন কার্য্যের ফলে খুঁজে পাওয়া পায়ে চলার রাস্তা

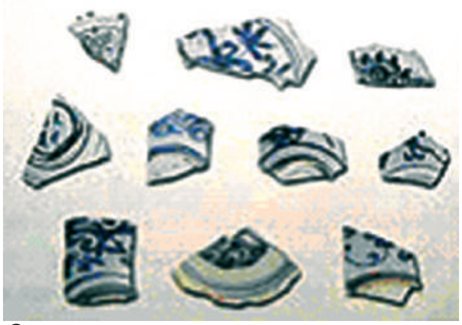

চিত্র 7.9
চীনামাটির বাসন

➲ এই টুকরোগুলো মূলত কোন ধরনের পাত্রের অংশ ছিল বলে তুমি মনে কর?

চিত্র 7.10
বিজয়নগরের একটি মসজিদ

➲ মসজিদটিতে কী ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য রয়েছে?

4. রাজকীয় কেন্দ্র

রাজকীয় কেন্দ্রটি শহরের জনবসতি দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। যদিও এটি ছিল রাজকীয় কেন্দ্র তবুও এখানে 60 টিরও বেশি মন্দিরের অস্তিত্বের চিহ্ন রয়েছে, স্পষ্টতই রাজন্যবর্গ মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্কিত উপাশকদের পৃষ্ঠপোষকতা করে জনগণের আস্তা অর্জন করতেন। মন্দিরে প্রতিটি দেবতাদের প্রতিভক্তি প্রদর্শন করে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বৈধতা দিতে চেষ্টা করতেন।

নগরের অভ্যন্তরীণ তিরিশটি দালানের ভগ্নাবশেষকে রাজকীয় প্রাসাদ হিসাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এগুলো তুলনামূলক ভাবে এত বড় যে দেখে মনে হয় সেগুলো

➲ আলোচনা করো ঃ

বিজয়নগরের সাথে তোমার শহর বা গ্রামের একটি তুলনা মূলক আলোচনা কর।

বিজয় ভবন

দরবার কক্ষ এবং মহানবমী দিব্য যাদের একত্রে বিজয় ভবন বলা হয় ঃ

> এ সম্পর্কে পেইস বলেছেন, যে, এই দালানগুলোতে রয়েছে সুন্দর ভাস্কর্য্য খঁচিত দুটি মঞ্চ যেগুলো একটি -অপরটির উপর অবস্থিত উপরের মঞ্চে এই বিজয় ভবন রাজার জন্য কাপড় দ্বারা নির্মিত একটি কক্ষ রয়েছে। এখানে মূর্তির জন্য একটি আলাদা কক্ষ ছিল এবং অন্যটির—মাঝখান বরাবর একটি বেদি রয়েছে যার উপরে রয়েছে রাজ্যের সিংহাসন (যার উপরে রয়েছে মুকুট এবং নুপুর) ....

চিত্র 7.11
মহানবমীর দিক

কোন ও আচার অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত হয়নি। এই সমস্ত প্রসাদ এবং মন্দিরগুলোর মধ্যে একটি পার্থক্য হল যে, মন্দিরগুলো রাজমিস্ত্রীদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ ভবনগুলো তৈরি হয়েছিল এমন সমস্ত উপাদান দিয়ে যেগুলো যাতে সহজেই বিনষ্ট না হয়।

4.1 মহানবমী দিব্য

দালানগুলোর উপযোগীতা এবং ব্যবহারের উপর নির্ভর করেই এগুলো নিজস্ব পরিচিতি পেয়েছে। এর মধ্যে বৃহত্তম প্রাসাদটির পরিচিত হল রাজপ্রসাদ হিসাবে । যদিও স্বয়ং মহারাজ এখানে অবস্থান করতেন এর কোন প্রমাণ নেই। এখানে দুটো গুরুত্বপূর্ণ দালান আছে, একটি হল দরবার কক্ষ এবং অপরটি হল মহানবমী দিব্য কক্ষ। দুটি উচ্চ দেওয়ার দিয়ে দালানটি ঘেরা এবং ঐ দুই দেওয়ালের মাঝখানে দিয়ে চলাচলের রাস্তা রয়েছে। দরবার কক্ষটি একটু উচুতে অবস্থিত এবং এর মাঝে মাঝে রয়েছে কাঠের থাম। দ্বিতল ভবনে যাওয়ার জন্য রয়েছে সিঁড়ি; আর এই সিঁড়িগুলোকে ধারণ করার জন্য রয়েছে স্তম্ভ, এই স্তম্ভগুলো ঘন-সন্নিবিষ্ট হওয়াতে ভবনটি কি উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে কোন পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায় না। স্তম্ভগুলো ঘনিষ্টভাবে বাধান যুক্ত ছিল।

নগরের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত মহানবমী দিব্য ভবনটি আসলে ছিল একটি সভামঞ্চ- যার আয়তন 11,000 বর্গফুট এবং এর উচ্চতা 40 ফুট-এর উপরে কাঠের একটি বড় কাঠামো ছিল-এর প্রমাণ মেলে মঞ্চের ভিতরে খোঁদাই করা কারুকার্য্য দেখে।

এই ভবনের সাথে যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি জড়িত তা হল মহানবমী (আক্ষরিক অর্থে নয় দিন) শরৎকালের বা (সেপ্টেম্বর অক্টোবর) মাসে দশদিন ব্যাপী চলা একটি হিন্দু উৎসব। এই উৎসব বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন দশেরা (উত্তর

চিত্র 7.12
মহানবমী দিব্যর খোদাই করা কাজ।

➲ এই খোদাই কার্য্যগুলোর বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে পার কি?

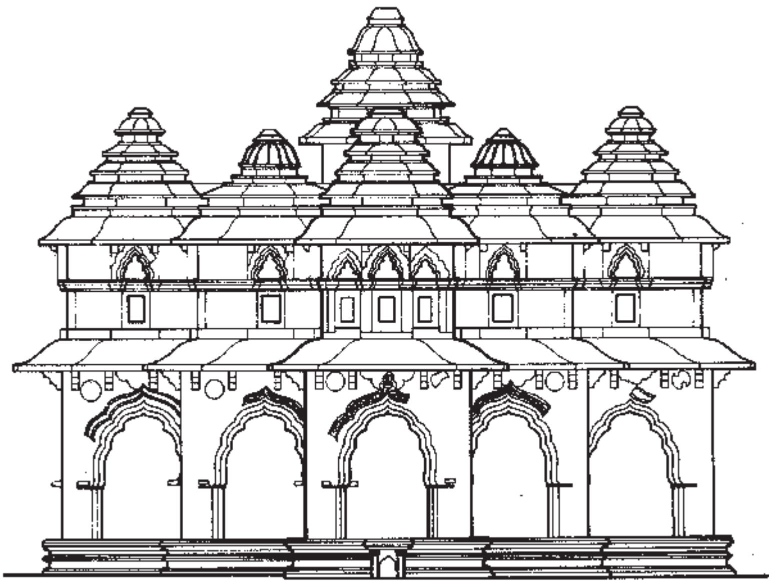

চিত্র 7.13
পদ্মমহলের একটি খাঁড়া চিত্র খাঁড়া চিত্র দ্বারা কোনও বস্তু বা কাঠামোর উলম্ব চিত্রকে বোঝায়। এটি তোমাকে এমন বৈশিষ্ট্যের ধারণা দেয় যা কোনো ছবিতে দেখা যায় না। খিলনগুলো লক্ষ করো এগুলো সম্ভবত ইন্দো-ইসলামিক প্রযুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

➲ ছবি 7.13 এবং 7.15 এর মধ্যে তুলনা করো এবং উভয়ের মধ্যে সে সব বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো। ছবি 7.14 এর খিলানের সাথে ছবি 7.6 এর খলানের তুলনা করো, পদ্মমহলে নয়টি মিনার ছিল এর মধ্যে একটি উচুঁ কেন্দ্রীয় মিনার এবং এর পাশে ৪টি ছোটো মিনার। ছবিতে তুমি কতগুলো মিনার দেখতে পাচ্ছ এবং এদের উচ্চতা কত? যদি তোমাকে পদ্মমহলের নতুন নামকরণ করতে হয়, তবে তুমি এর কী নাম দেবে?

ভারতে) দুর্গাপূজা (বাংলাদেশে) এবং নবরাত্রী বা মহানবমী (দক্ষিণভারতে) বিজয়নগরের রাজারা এই উপলক্ষে তাদের প্রতিপত্তি, শক্তি এবং আভিজাত্য প্রদর্শন করতেন।

এই উপলক্ষ্যগুলোর মধ্যে মূর্তি পূজা রাজকীয় অশ্বপূজা এবং মহিষ ও অন্যান্য পশু বলি ও এর অংশ ছিল। এছাড়া নৃত্য, কুস্তি প্রদর্শন অশ্ব, হাতি ও রথ সহ সৈনিকদের শোভযাত্রাও ছিল এই উৎসবের অঙ্গ। এই উপলক্ষে রাজ্যের নায়ক ও অন্যান্য অধিনস্ত রাজারা বিজয়নগরের রাজাকে আনুষ্ঠানিকভাবে উপঢৌকন প্রদান করতেন। এই অনুষ্ঠানটির একটি প্রতীকি তাৎপর্য্য ও ছিল। উৎসবের অন্তিম দিন মহারাজা স্বয়ংএকটি খোলামাঠে -জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে সেনা এবং নায়কদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান পরিদর্শন করতেন, এই অনুষ্ঠানেই নায়কগণ রাজার হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দিতেন, নির্ধারিত রাজস্বও সেই সময় তারা পরিশোধ করতেন।

আজকের দিনে যে মহানবমী দিব্য ভবনটি আবিষ্কৃত হয়েছে -এই স্থানটি কি ঐ প্রাচীন বিশাল উৎসবের প্রাঙ্গন ছিল? ঐতিহাসিদের অভিমত ঐ প্রত্নস্থলের আয়তন এবং নিকটবর্তী স্থানের উন্মুক্ত ভূমির পরিমাপ দেখলে মনে হয়, স্থানটি এত বিশাল সংখ্যক সেনা, প্রদর্শনী দেখতে আসা নারী -পুরুষ এবং এত হাতি ঘোড়ার বিশাল সমাবেশের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এই প্রত্নস্থলও সেই যুগের আবিস্কৃত প্রত্ননিদর্শণগুলোর মতই রহস্যময়।

4.2 রাজকীয় কেন্দ্রে অন্যান্য ভবন

রাজকীয় কেন্দ্রের প্রসাদগুলোর মধ্যে সর্বপেক্ষা মনোরম ছিল পদ্মমহল। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ পর্যটকরা এর নামকরণ করেছিলেন। নামটি চমৎকার হলেও ভবনটি কী কাজে ব্যবহৃত হত এই ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা পুরোপুরি নিশ্চিত নন। ম্যাকেঞ্জির আঁকা একটি নকশায় মহলটিকে, রাজা মন্ত্রী এবং তাদের উপদেস্টাদের একসাথে

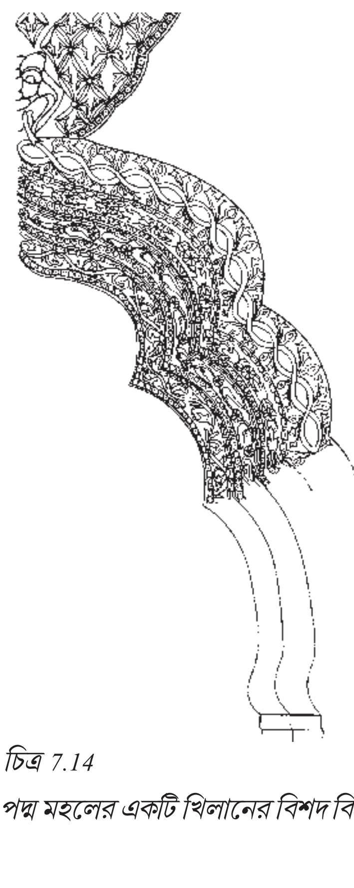

চিত্র 7.14
পদ্ম মহলের একটি খিলানের বিশদ বিবরণ।

চিত্র 7.15
পদ্মমহলের একটি ছবি।

➲ চিত্র ঃ 7.16 a এবং 7.16 b এর সাথে চিত্র 7.17 এর তুলনা করে প্রতিটির মধ্যে দৃশ্যমান যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে এদের একটা তালিকা তৈরি করো। তুমি কি মনে কর এগুলো আসলে হাতিশাল ছিল?

বসার স্থান হিসাবে দেখানো হয়েছে।

নগরীর প্রধান মন্দিরসমূহ পবিত্র মধ্যভূমিতে অবস্থিত ছিল। তবে রাজকীয় কেন্দ্রেও বেশ কিছু মন্দির ছিল।

এগুলোর মধ্যে একটি মনোরম মন্দির রয়েছে যেটি হাজার রাম মন্দির হিসেবে পরিচিত।

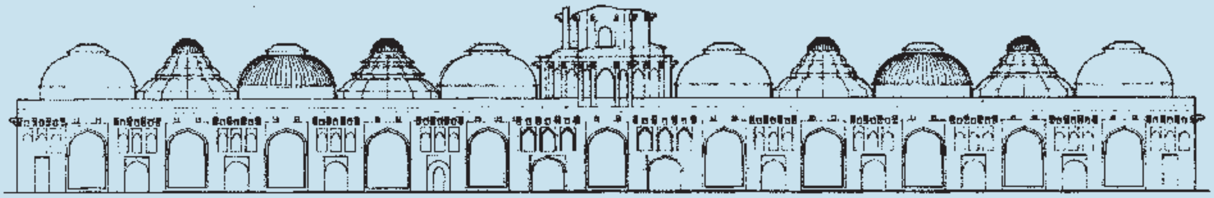

চিত্র 7.16 a হাতিশালের চিত্র

চিত্র 7.16 b হাতিশালের একটি নকশা

চিত্র 7.17 পদ্মমহলের নিকটে অবস্থিত হাতিশাল

চিত্র 7.18
হাজারা রাম মন্দিরের ভাস্কর্য

➲ তুমি কি নাচের ভঙ্গিমাগুলো চিহ্নিত (সনাক্ত) করতে পারবে? ধাপগুলোতে কেন হাতি এবং ঘোড়া চিত্রিত করা হয়েছিল বলে তুমি মনে কর?

সম্ভবত এখানে রাজা এবং তার পরিবারের সদস্যরাই পূজাচ্চর্না করতেন। মন্দিরের গর্ভ গৃহের মূর্তিটি অবশ্য পাওয়া যায়নি। তবে দেওয়ালে খোদাই করা কারুকার্য্য এবং অঙ্কিত চিত্র-সবই রয়েছে। মন্দিরের ভিতরের দেওয়ালে রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনাবলীও খুদিত রয়েছে।

বহিঃশত্রুর আক্রমনে বিজয়নগরের অনেকগুলো রাজকীয় প্রসাদ ও অট্টালিকা ধ্বংস হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও নায়কেরা প্রাসাদ নির্মাণের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। এদের নির্মিত অনেক প্রাসাদ আজও টিকে আছে।

চিত্র 7.19
মাদুরাইয়ের দরবার কক্ষের অভ্যন্তর ভাগ। খিলানগুলো লক্ষ করো।

➲ আলোচনা করো ঃ

নায়করা কেন বিজয়নগরের শাসনকর্তাদের প্রাসাদ নির্মাণের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছিলেন?

5. ধার্মিক কেন্দ্র

5.1 রাজধানীর নির্বাচন

এখন আমরা নগরের উত্তরপ্রান্তে তুঙ্গাভদ্রা নদীর তীরবর্তী পাথুরে অঞ্চলে নজর দেব। স্থানীয় ঐতিহ্য অনুসারে এই পাহাড়গুলো রামায়ণে উল্লিখিত বালি এবং সুগ্রীবের বানর রাজ্য ছিল। অপরাপর রীতি অনুসারে স্থানীয় দেবীমাতা পম্পাদেবী এই পাহাড় গুলোতে বিরূপাক্ষকে বিবাহ করার জন্য তপস্যা করেছিলেন। বিরূপাক্ষ এই রাজ্যের রক্ষক দেবতা এবং তিনি শিবরূপেও পরিচিত। আজও বিরূপাক্ষ মন্দিরে প্রতিবছর এই বিবাহবার্ষিকী পালন করা হয়। এই পাহাড়গুলোর মধ্যে প্রাক্ বিজয়নগর সময়কালের অনেক জৈন মন্দির রয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, এই অঞ্চল বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গো সম্পর্কিত ছিল।

এই অঞ্চলে মন্দির নির্মাণের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যা জানতে পল্লব, চালুক্য, হোয়শাল এবং চোল বংশ রাজত্বকাল পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে হয়। শাসকগণ নিজেদেরকে ঈশ্বরের সঙ্গো সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে হিসাবে মন্দির নির্মাণকে বেশি করে উৎসাহিত করতেন– প্রায়ই দেবতাকে স্পষ্টভাবে অথবা পরোক্ষভাবে রাজারা নিজেদের সঙ্গো সম্পর্কযুক্ত করতেন। মন্দিরগুলো শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবেও কাজ করত। তাছাড়া শাসক এবং অন্যলোকরা মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রায়ই জমি এবং অন্যান্য সম্পদ প্রদান করতেন। অতএব, মন্দিরগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধার্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে বিকশিত হয়।

শাসকদের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্দিরগুলোর নির্মাণ, মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণ ছিল তাঁদের ক্ষমতা, সম্পতি এবং কর্তব্য নিষ্ঠার জন্য সমর্থন এবং স্বীকৃতি অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সম্ভবত বিরূপাক্ষ এবং পম্পাদেবীর ধর্মীয়স্থলের অবস্থান ওই অঞ্চলে বিজয়নগর রাজ্য স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেছিল। বস্তুত বিজয়নগরের রাজাগণ ভগবান বিরূপাক্ষের তরফে শাসন করার দাবি করতেন। সমগ্র রাজকীয় নির্দেশগুলো সাধারণত কানাড়া লিপিতে "শ্রী বিরূপাক্ষ" নামে স্বাক্ষর করা হত। শাসকগণও "হিন্দু সুরত্রান" উপাধি ব্যবহারের মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গো তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত দিতেন। এটা আরবীয় শব্দ সুলতান-এর সংস্কৃত রূপ যার অর্থ রাজা, সুতরাং এর আক্ষরিক অর্থ ছিল হিন্দু সুলতান।

বিজয়নগরের শাসকগণ পূর্বের ঐতিহ্যগুলোকে গ্রহণ করেন ও এতে নতুনত্ব আনেন এবং এগুলোকে বিকশিত করেন। রাজকীয় প্রতিকৃতি ভাস্কর্য মন্দিরগুলোতে প্রদর্শিত হয় এবং মন্দিরগুলোতে রাজার পরিদর্শনকে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হত যেখানে তাঁকে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ নায়করা সঙ্গ দিতেন।

চিত্র 7.20
উপর থেকে নেওয়া বিরূপাক্ষ মন্দিরের একটি দৃশ্য।

5.2. গোপুরম এবং মন্ডপ

মন্দির স্থাপত্যের নিরিখে এই সময়কালের মধ্যে নিদিষ্ট কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এগুলোর মধ্যে ব্যাপক আকারের কাঠামো অন্তর্ভুক্ত ছিল যা অবশ্যই রাজকীয় কর্তৃত্বের একটি চিহ্ন বহন করে। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হল রায় গোপুরম (চিত্র 7.7) অথবা রাজকীয় তোরনদ্বার, যেগুলোর তুলনায় কেন্দ্রীয় মন্দিরগুলোর

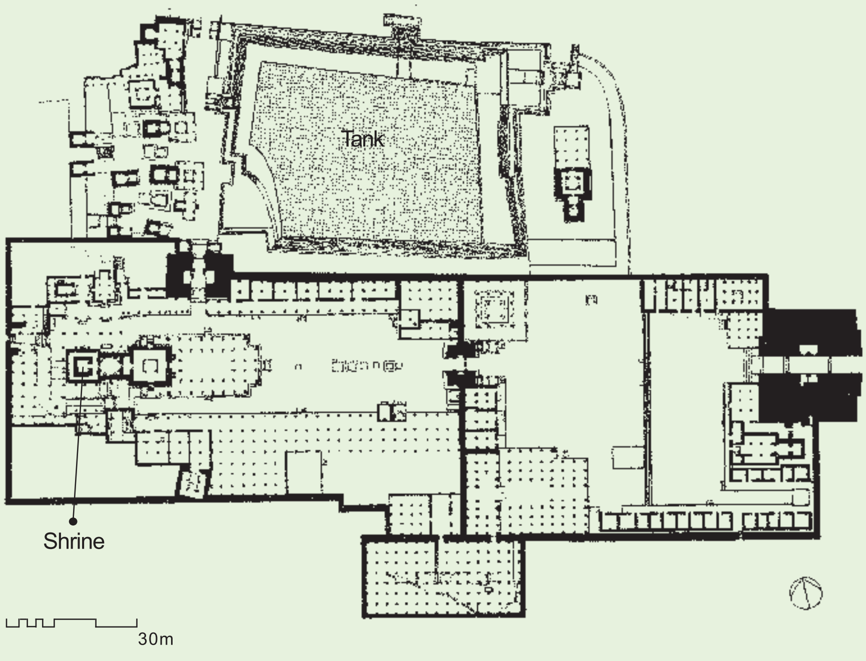

চিত্র 7.21
বিরূপাক্ষ মন্দিরের নকশা
অধিকাংশ বর্গাকার পরিকাঠামো হল মন্দির। দুই প্রধান তোরণদ্বারকে কালো রঙে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক ছোটোবিন্দু হল এক একটি স্তম্ভ। স্তম্ভগুলোর সারিগুলোকে বর্গাকার অথবা আয়তাকার রেখার ধাঁচে সজ্জিত করে প্রধান হলঘর, মন্ডপ এবং বারান্দাগুলোকে বিভক্ত করা হত বলে মনে হয়।

➲ নকশায় স্কেল ব্যবহার করে প্রধান গোপুরম থেকে কেন্দ্রীয় মন্দির পর্যন্ত দূরত্বকে মাপ। পুরুক থেকে মন্দির পর্যন্ত যাওয়ার সবচেয়ে সহজ পথ কোন্‌টি?

চিত্র 7.22
ঐশ্বরিক বিবাহ উদ্‌যাপন নিমিত্ত তৈরি একটি কল্যাণ মন্ডপ।

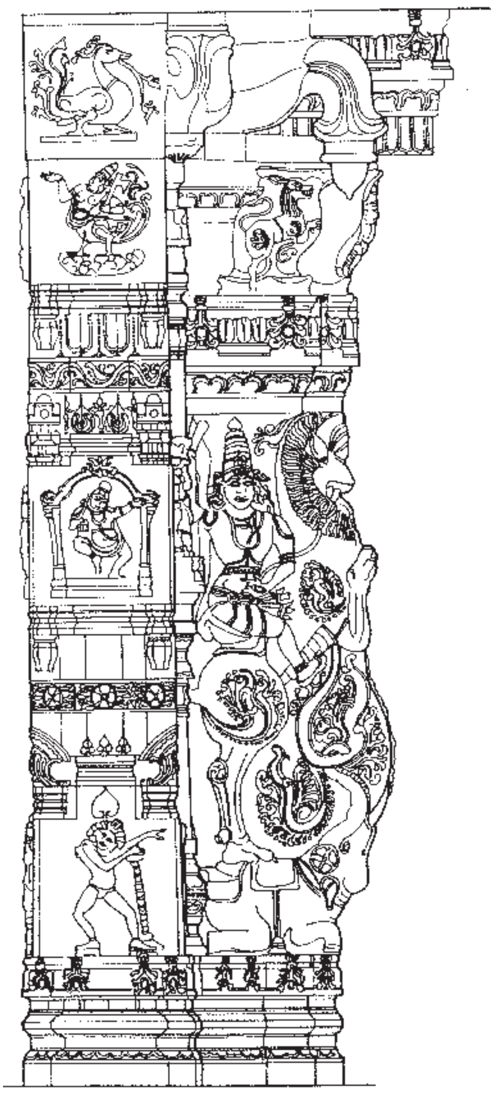

চিত্র. 7.23 ভাস্কর্যযুক্ত স্তম্ভের একটি রেখাচিত্র

➲ স্তম্ভের উপর তুমি যা, দেখতে পাও তা বর্ণনা করো।

মিনারগুলোকে প্রায়ই খর্ব দেখাত এবং অনেকদূর থেকে মন্দিরের উপস্থিতির জনান দিত। এগুলো সম্ভবত রাজাদের ক্ষমতাকে স্মরণও করিয়ে দিত। যাঁরা এত উঁচু তোরণদ্বার নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, প্রযুক্তি এবং দক্ষতা ব্যবহারে সক্ষম ছিলেন। অপর স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল মণ্ডপ এবং স্তম্ভযুক্ত লম্বা বারান্দা চারদিকে বিদ্যমান। চলো আমরা বিরূপাক্ষ এবং বিট্‌ঠল মন্দির দুটির দিকে সুক্ষ্মভাবে নজর দিই।

বিরূপাক্ষ মন্দিরটির নিমার্ণ কাজ কয়েক শতাব্দী ধরে চলে। যদিও শিলালিপিগুলো থেকে জানা যায় যে, সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির নবম— দশম শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এর বিস্তৃতি ঘটে। কৃষ্ণ দেবরায় তাঁর রাজ্যাভিষেকের নিদর্শন হিসাবে প্রধান মন্দিরের সামনে হলঘরটি তৈরি করিয়েছিলেন। এটি সূক্ষ্মভাবে খোদিত স্তম্ভের দ্বারা সজ্জিত ছিল। পূর্ব দিকের গোপুরমের নির্মাণের কৃতিত্বও তাঁর। এইসব সংযোজনগুলো থেকে বোঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় দেবালয় পুরো

চত্বরে তুলনামূলক একটি ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে ছিল।

মন্দিরের হলঘরগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত। এর মধ্যে কয়েকটিতে সংগীত, নৃত্য, নাটক প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোকে দেখার জন্য দেবতাদের মূর্তি রাখা হত। অন্যগুলো দেবী-দেবতাদের বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করার জন্য ব্যবহৃত হত এবং এছাড়া বাকিগুলোতে দেবী-দেবতাদের দোলনা দুলতে ব্যবহৃত হত। ছোটো কেন্দ্রীয় মন্দিরে রাখা মূর্তিগুলো থেকে স্বতন্ত্র বিশেষ মূর্তিগুলো এই সব অনুষ্ঠানগুলোতে ব্যবহৃত হত।

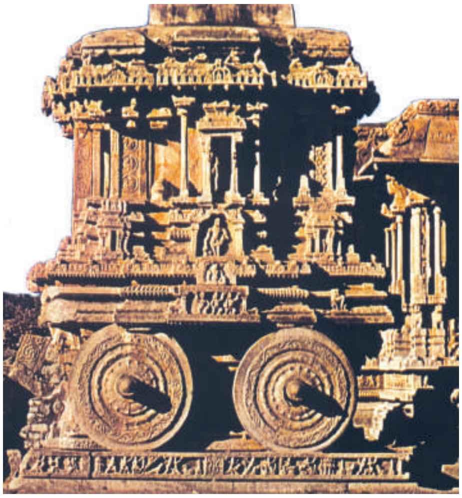

চিত্র 7.24
বিট্টল মন্দিরের রথ

➲ তুমি কি মনে কর বাস্তবে রথগুলো এভাবেই তৈরি করা হত?

চিত্র. 7.25
জিঞ্জির ঝুলন্ত মন্ডপ

অপর দেবস্থল বিট্ঠল মন্দিরও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এখানকার মুখ্য দেবতা ছিলেন বিট্ঠল। যিনি মহারাষ্ট্রে সাধারণত বিষ্ণুরূপে পূজিত হন। কর্ণাটকে এই দেবতার পূজার সূচনা এমন একটি ইঙ্গিত বহন করে যার দ্বারা বোঝা যায় বিজয়নগরের শাসকগণ সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্য গ্রহণ করেন। অন্য মন্দিরগুলোর মতো এই মন্দিরেরও অনেকগুলো হলঘর এবং একটি রথের আদলে তৈরি একটি অনন্য দেবস্থল রয়েছে (চিত্র 7.24)।

মন্দির চত্বরগুলোর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল রথের পথ যেগুলো গোপুরম মন্দির থেকে সরলরেখায় সম্প্রসারিত ছিল। এই রাস্তাগুলো পাথরের ফলক দ্বারা বাঁধানো ছিল এবং রাস্তার উভয় দিকে স্তম্ভযুক্ত মন্ডপ ছিল যেখানে ব্যবসায়ীরা তাদের দোকান খুলে বসত।

ঠিক যেভাবে নায়কগণ দুর্গ নির্মাণ বিদ্যার ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখেন এবং সম্প্রসারিত করেন, সেভাবেই তারা মন্দির নির্মাণের ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেও তাই করেন। বস্তুত সবচেয়ে দর্শনীয় কিছু গোপুরমও স্থানীয় নায়কদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল।

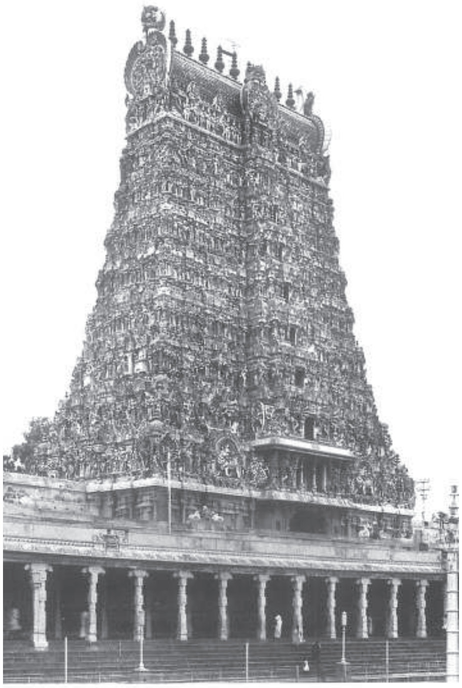

চিত্র 7.26
মাদুরাইয়ের নায়কদের দ্বারা নির্মিত একটি গোপুরম

➲ আলোচনা করো ঃ

বিজয়নগরের শাসকগণ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত স্থাপত্যের পূর্ববর্তী ঐতিহ্যগুলোকে কীভাবে এবং কেন গ্রহণ করেন এবং মানিয়ে নেন।

6. বিভিন্ন রাজপ্রাসাদ, মন্দির এবং বাজারের পরিকল্পনা

বিভিন্ন আলোকচিত্র, পরিকল্পনা, কাঠামোর উচ্চতা এবং ভাস্কর্য থেকে আমরা বিজয়নগরের ব্যাপারে প্রচুর তথ্যের অনুসন্ধান করেছি। এইসব কীভাবে উদ্ঘাটিত হল ? ম্যাকেঞ্জি দ্বারা প্রারম্ভিক জরিপের পর পর্যটকদের বৃত্তান্ত এবং লিপিগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে একসঙ্গো জুড়ে দেওয়া হয়। বিংশ শতাব্দীতে এই স্থানটি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এবং কর্ণাটক প্রত্নতত্ত্ব এবং জাদুঘর বিভাগ দ্বারা সংরক্ষিত ছিল। 1976 খ্রিস্টাব্দে হাম্পি একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থল হিসাবে স্বীকৃত হয়। তারপর 1980-এর দশকের শুরুতে ব্যাপক এবং গভীর নিরীক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের লিপিবদ্ধকরণ প্রযুক্তির ব্যবহার করে বিজয়নগরে প্রাপ্ত বস্তুগত অবশেষগুলোর সবিস্তারে দলিল তৈরি করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চালু করা হয়। প্রায় কুড়ি বছরের

উপরে সারা বিশ্বের কয়েক ডজন পন্ডিত এই তথ্যকে সংকলন এবং সংরক্ষণ করার জন্য কাজ করেছিলেন।

চলো আমরা এই ব্যাপক প্রক্রিয়ার শুধু একটি অংশের দিকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাকাই— এটা হল মানচিত্র অঙ্কন। প্রথম পদক্ষেপ ছিল সম্পূর্ণ এলাকাকে 25টি বর্গাকারে ভাগ করা, প্রতিটি ভাগকে বর্ণমালার এক একটি অক্ষরে নামকরণ করা হয়। তারপর প্রত্যেক বর্গকে আরও ছোটো ছোটো বর্গে ভাগ করা হয়। কিন্তু এটাই যথেষ্ট ছিল না, এই সব অপেক্ষাকৃত ছোটো বর্গকে আবার আরও ছোটো ছোটো এককে ভাগ করা হয়।

তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, এইসব পুঙ্খানুপুঙ্খ জরিপগুলো খুবই যত্নসহকারে করা হয়েছে এবং ছোটো ছোটো দেবস্থল এবং বাসস্থান থেকে শুরু করে বিশাল মন্দিরের কাঠামোর কয়েক হাজার চিহ্ন পুনরুদ্ধার এবং নথিভুক্ত করা হয়েছে। এসবের ফলে সড়ক রাস্তা, বাজার প্রভৃতির পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে।

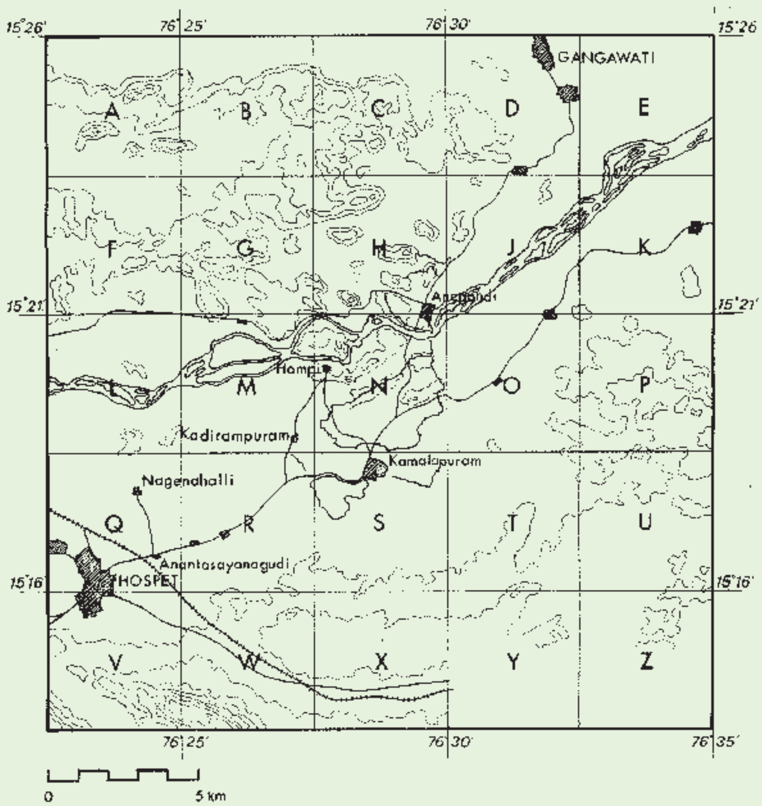

চিত্র 7.27
বিজয়নগরের একটি বিশদ মানচিত্র (উপরে ডানদিকে)।

➲ এতে ইংরেজি বর্ণমালার কোন্ অক্ষরকে ব্যবহার করা হয়নি? মানচিত্রে স্কেল ব্যবহার করে যে-কোনো একটি ছোটো বর্গের দৈর্ঘ্য মাপো।

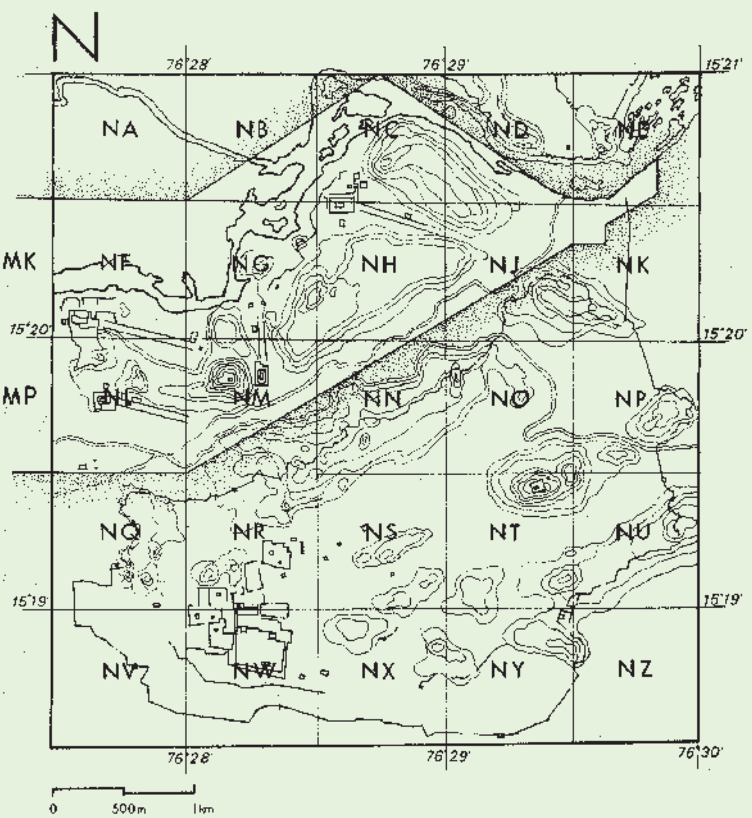

চিত্র 7.28
চিত্র.7.27 -এর N চিহ্নিত বর্গ (ডানদিকে)।

➲ এই মানচিত্রে কোন্ স্কেলটি ব্যবহার করা হল?

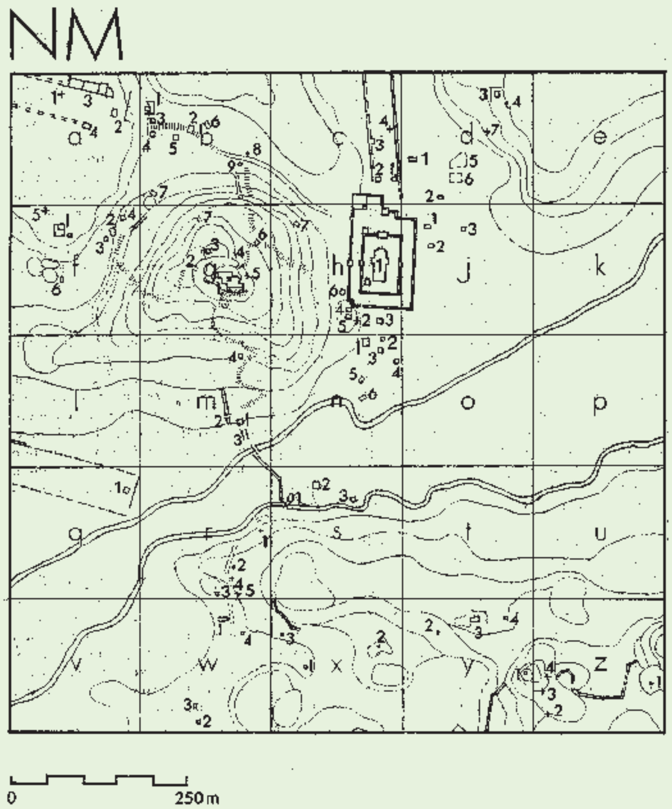

চিত্র 7.29
চিত্র 7.28-এর NM চিহ্নিত বর্গ

> ➲ একটি মন্দির চিহ্নিত করো।
> দেওয়াল, একটি কেন্দ্রীয় দেবস্থল এবং মন্দিরের দিকে যাওয়া রাস্তাগুলো খুঁজে বের করো। মানচিত্রে বর্গগুলোর নাম দাও যেগুলোতে মন্দিরের নকশা রয়েছে।

স্তম্ভের ভিত্তিগুলো এবং মঞ্চগুলো খোঁজার মাধ্যমেই বাজারের অবস্থান জানা যায়–এসবই সমৃদ্ধশালী বাজারের ধ্বংসাবশেষ।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে জন. এম. ফ্রিট্‌জ্‌, জর্জ মিশেল এবং এম. এস. নাগরাজা রাও, যাঁরা বছরের পর বছর ধরে এই স্থানে কাজ করে ছিলেন, তাঁরা লিখেছেন– "বিজয়নগরের এই স্মৃতিসৌধগুলোর চিহ্ন নষ্ট হয়ে যাওয়া কাঠের উপাদানগুলো যেমন– বিভিন্ন স্তম্ভ, ব্র্যাকেট, কড়িকাঠ, ছাদ, ছাদের ঝুলন্ত অংশ এবং মিনারের কল্পনা করতে হয় যা পলেস্তারা দিয়ে সজ্জিত এবং সম্ভবত উজ্জ্বল রং দিয়ে চিত্রিত ছিল।"

যদিও কাঠের কাঠামোগুলো হারিয়ে গেছে এবং শুধু মাত্র পাথরের কাঠামোগুলো রয়ে গেছে, পর্যটকদের দেওয়া বর্ণনাগুলো আমাদের ওই সময়ের প্রাণবন্ত জীবনের কিছু দিককে পুনর্গঠন করতে সহায়তা করে।

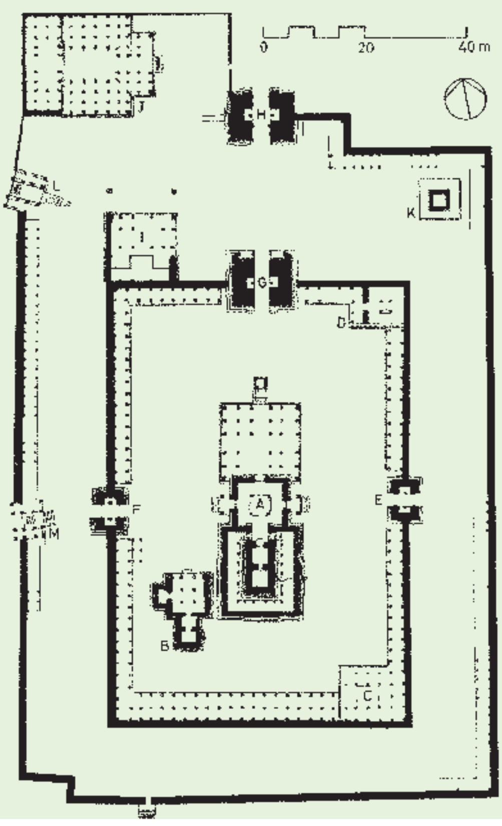

চিত্র 7.30
চিত্র 7.29-এ দেওয়া মন্দিরের নক্সা।

> ➲ গোপুরম, হলঘর, স্তম্ভশ্রেণি এবং কেন্দ্রীয় দেবালয়গুলোকে চিহ্নিত করো। বাইরের প্রবেশপথ থেকে কোন্ এলাকার মধ্য দিয়ে তুমি কেন্দ্রীয় দেবালয়ে প্রবেশ করবে?

উৎস 5

বাজার

পেজ বাজারের একটি প্রাণবন্ত বিবরণ দিয়েছেন ঃ

> সামনে গিয়ে তুমি একটি চওড়া এবং সুন্দর রাস্তা পাবে ...... এই রাস্তায় অনেক বণিক বাস করে, এবং সেখানে তুমি সবধরনের চুনি। হিরা, পান্না, মুক্তা, ছোটোমুক্তা, বস্ত্র এবং পৃথিবীতে অন্য অনেক বস্তু যা তোমার কিনতে ইচ্ছা করবে, তা খুঁজে পাবে। তারপর প্রত্যেক সন্ধ্যায় তুমি একটি মেলা দেখতে পাবে যেখানে তারা অনেক সাধারণ ঘোড়া এবং টাট্টু ঘোড়া এবং অনেক জামির ও লেবু, কমলালেবু, আঙুর এবং বাগানে উৎপাদিত বিভিন্ন বস্তু এবং কাঠ ঃ এই সব তুমি এই রাস্তায় পাবে।

আরও সাধারণভাবে বলতে গেলে, তিনি শহরটিকে "বিশ্বের সবচেয়ে ভালো নগর যেখানে সবকিছু পাওয়া যায়," বলে বর্ণনা করেছেন, সেখানে বাজার "চাল, গম, শস্য, ভারতীয় ভুট্টা এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে বার্লি এবং শিম, মুগ, ডাল, এবং ছোলার মতো দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল"। এসব খুব সস্তায় এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। ফার্নাও নুনিজের মতে, বিজয়নগর বাজারগুলোতে 'প্রচুর পরিমাণে ফল, আঙুর এবং কমলা, লেবু, ডালিম, কাঁঠাল এবং আম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত এবং এগুলো ছিল খুবই সস্তা।" বাজারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে মাংসও বিক্রি হত। নুনিজ বর্ণনা করেন "ভেড়ার মাংস, শুয়োরের মাংস, হরিণের মাংস, তিতির, খরগোশ, পায়রা, কোকিল, চড়ুই এবং সবধরনের পাখি, ইঁদুর এবং বিড়াল এবং গিরগিটি প্রভৃতি " বিশনাগ (বিজয়নগর)— এর বাজারে বিক্রি করা হতো।

7. উত্তরের খোঁজে

প্রশ্ন

টিকে থাকা ভবনগুলো আমাদের এই পদ্ধতির ব্যাপারে বলে যার দ্বারা স্থানগুলোকে সুসংগঠিত করা হতো এবং এগুলোর ব্যবহার করা হতো। এছাড়াও কোন্ কোন্ উপাদান এবং প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কীভাবে এগুলো তৈরি হতো এ সম্পর্কেও আমরা জানতে পারি। উদাহরণস্বরূপ কোনো একটি শহরের দুর্গগুলোকে অধ্যয়ণের দ্বারা আমরা প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং সামরিক সজ্জার ধারণা পেতে পারি। সেগুলোকে অন্য স্থানের ভবনগুলোর সাথে তুলনা করলে আমরা চিন্তাধারার বিস্তার এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবগুলো সম্পর্কে জানতে পারি। সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ফসল এই ভবনগুলো তাদের নির্মাতা এবং পৃষ্ঠপোষকদের এইসব চিন্তাধারা বহন করে যেগুলো তারা প্রকাশ করতে চেয়েছিল। যখন আমরা অন্যান্য উৎস যেমন শিলালিপি এবং জনপ্রিয় ঐতিহ্যগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে একত্রিত করি তখন আমরা এগুলো বুঝতে পারি।

কৃষ্ণদেব রায়

দৃষ্টিভঙ্গির কিছু সমস্যা পর্যালোচনা করার জন্য তামিলনাড়ুর চিদাম্বরম মন্দিরের গোপুরমে স্থাপিত কৃষ্ণদেব রায়ের এই সুন্দর মূর্তির দিকে তাকাও। এটা স্পষ্টতই যে, শাসক নিজেকে এইরূপে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

এবং প্যাজ রাজাকে এভাবে বর্ণনা করেনঃ

মাঝারি উচ্চতা এবং ফর্সা বর্ণ এবং
উত্তম গড়ন শীর্ণকায় নয় বরং স্থূল,
তাঁর মুখে গুটি বসন্তের দাগ।

চিত্র 7.31

প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোর অনুসন্ধান থেকে এটা জানা যায় না যে, শহর এবং তার আশেপাশে থাকা জনগণের একটা বড়ো অংশের সাধারণ পুরুষ, মহিলা, এবং শিশুরা এই আকর্ষনীয় ভবনগুলো সম্পর্কে কী ভাবত। তারা কি রাজকীয় কেন্দ্র অথবা পবিত্র কেন্দ্রের বত্বরে যে কোনো স্থানে প্রবেশ করতে পারত? তারা কী ভাস্কার্যের পাশ দিয়ে দ্রুত চলে যেত, অথবা তারা কী ভবনগুলো দেখতে দাঁড়াত, ভাবত এবং এর জটিল প্রতীক চিহ্নকে বোঝার চেষ্টা করত? এবং যারা এই বিশাল নির্মাণ প্রকল্পগুলোতে শ্রমদান করেছিল এই উদ্যোগের ব্যাপারে তারা কি ভাবত?

কী ভবন তৈরি করতে হবে, কোন্ স্থান করতে হবে, কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে এবং কী শৈলী অনুসরণ করতে হবে এসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিতেন শাসক কিন্তু এত বিশাল উদ্যোগের জন্য প্রায়োজনীয় বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিল? ভবন নির্মাণের জন্য নকশাগুলোকে রচনা করত? রাজমিস্ত্রি, পাথরকাটার লোক, খোদাইকারী যারা প্রকৃত নির্মাণ কাজ করত, তারা কোথা থেকে আসত? তাদের কি যুদ্ধের সময় প্রতিবেশী রাজ্য থেকে ধরে আনা হত? তারা কী রকম মজুরি পেত? কে নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান করত? কীভাবে নির্মাণ সামগ্রীর যার উত্তর নিছক ভবনগুলো অথবা এর অবশেষগুলোকে দেখেই আমরা দিতে পারি না। হয়তো অন্যান্য সূত্র ব্যবহার করে ধারাবাহিক গবেষণার মাধ্যমে আরও তথ্য জানা সম্ভব হবে।

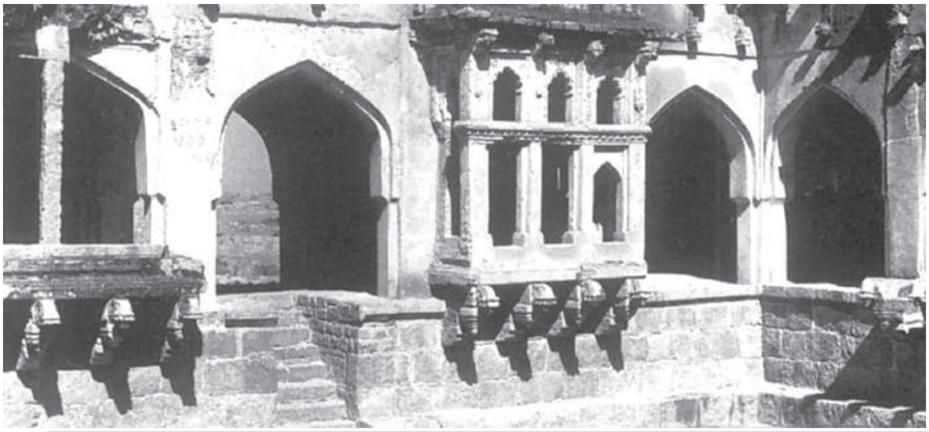

চিত্র 7.32
রানীর স্নানঘর নামে পরিচিত দালানের একটি অংশ

সময়পঞ্জী 1
মুখ্য রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ

আনুমানিক 1200-1300 খ্রিঃ	দিল্লি সুলতানির প্রতিষ্ঠা (1206)
আনুমানিক 1300-1400 খ্রিঃ	বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (1336?); বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (1347); জৌনপুর, কাশ্মীর এবং মাদুরাইয়ে সুলতানি শাসন
আনুমানিক 1400-1500 খ্রিঃ	উড়িষ্যার গজপতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (1435); গুজরাট এবং মালওয়া সুলতানির প্রতিষ্ঠা; আহম্মদনগর, বিজাপুর এবং বেরারের সুলতানির উত্থান (1490)
আনুমানিক 1500-1600 খ্রিঃ	পর্তুগীজদের গোয়া বিজয় (1510); বাহমনি রাজ্যের পতন; গোলকোন্ডার সুলতানির উত্থান (1518); বাবর কর্তৃক মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (1526)

উল্লেখ ঃ প্রশ্নচিহ্ন অনিশ্চিত তারিখ নির্দেশ করে।

সময়পঞ্জী 2
বিজয়নগরের খোঁজ এবং সংরক্ষণের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ

1800 খ্রিঃ	কলিন ম্যাকেঞ্জির বিজয়নগর দর্শন
1856 খ্রিঃ	আলেকজান্ডার গ্রিন্‌ল হাম্পিতে প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষের প্রথম বিস্তৃত আলোকচিত্র গ্রহণ করেন।
1876 খ্রিঃ	জে. এফ. ফ্লিট পুরাতাত্ত্বিক স্থলের মন্দিরের দেওয়ালে শিলালিপিগুলোকে নথিবদ্ধ শুরু করেন।
1902 খ্রিঃ	জন মার্শালের অধীনে সংরক্ষণ কার্য শুরু
1986 খ্রিঃ	ইউনেস্কো দ্বারা হাম্পিকে বিশ্ব প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল হিসাবে ঘোষণা

উত্তর দাও (১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে)

1. শেষ দুই শতাব্দী ধরে হাম্পির ধ্বংসাবশেষ অধ্যয়নের জন্য কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। তোমার মতে এই পদ্ধতিগুলো কীভাবে বিরূপাক্ষ মন্দিরের পুরোহিতদের দেওয়া তথ্যের পরিপূরক হতে পারে?
2. বিজয়নগরের জলের চাহিদাকে কীভাবে মেটানো হত?
3. শহরের প্রাচীরঘেরা এলাকায় কৃষিজমি থাকার কী কী সুবিধা এবং অসুবিধা ছিল বলে তোমার মনে হয়?
4. তোমার মতে মহানবমী দিব্ব-এর সাথে যুক্ত অনুষ্ঠানগুলোর কী গুরুত্ব ছিল?
5. চিত্র 7.33 হল বিরূপাক্ষ মন্দিরের অন্য স্তম্ভের একটি রেখাচিত্র। তুমি কি এতে কোন পুষ্পশোভিত নকশা দেখতে পাও? এতে কী কী পশু দেখানো হয়েছে। কেন এগুলোকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বলে তুমি মনে কর? চিত্রে দেখানো মানব আকৃতির বর্ণনা করো।

Fig. 7.33

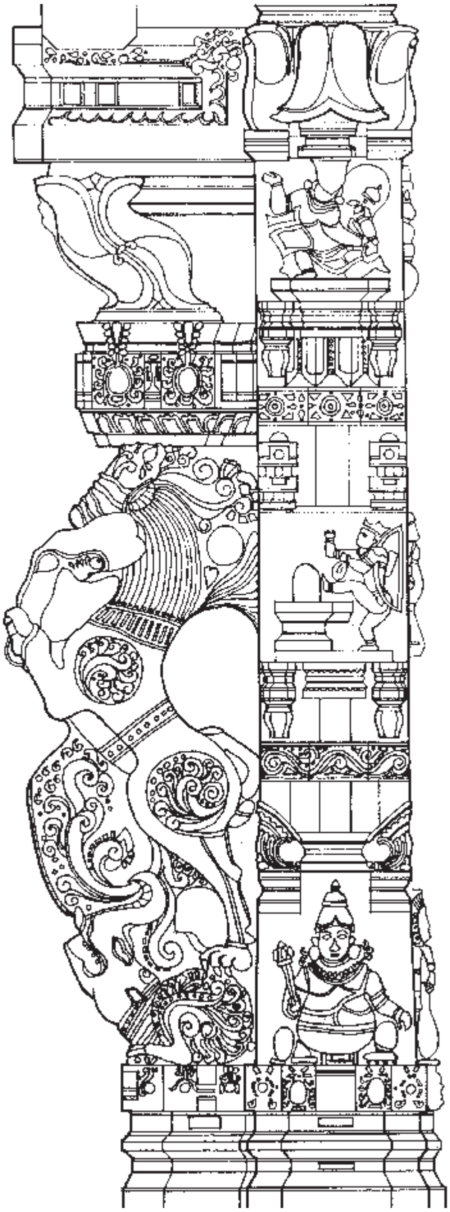

নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখ (২৫০-৩০০ শব্দের মধ্যে)

6. "রাজকীয় কেন্দ্র" পরিভাষা নগরের যে অংশের জন্য প্রয়োগ করা হয় সেটা ওই অংশকে যথাযথভাবে বর্ণনা করে কি না আলোচনা করো।
7. পদ্ম মহল এবং হাতিশালার মতো ভবনগুলোর স্থাপত্যশৈলী থেকে সেগুলোর নির্মাণকারী শাসকদের সম্পর্কে কী জানা যায়।
8. কোন্ কোন্ স্থাপত্য রীতির দ্বারা বিজয়নগরের স্থপতিগণ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁরা কীভাবে এই রীতিগুলোকে পরিবর্তন করেছিলেন।
9. এই অধ্যায়ে দেওয়া বিভিন্ন বর্ণনা থেকে তুমি বিজয়নগরের সাধারণ লোকদের জীবনের কী ছবি দেখতে পাও?

মানচিত্র কার্য

10. বিশ্বের একটি রেখামানচিত্রের উপর ইতালি, পর্তুগাল, ইরান এবং রাশিয়ার আনুমানিক অবস্থান চিহ্নিত করো। এই পথগুলো চিহ্নিত করো যা 176 পৃষ্ঠায় উল্লেখিক পর্যটকগণ বিজয়নগর পৌঁছার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

প্রকল্প (যে কোন একটি)

11. ভারতীয় উপমহাদেশের যে-কোনো একটি প্রধান নগরের সম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজে বের করো যা আনুমানিক চতুর্দশ থেকে সপ্তম শতাব্দী মধ্যে উন্নতি লাভ করেছিল। নগরটির স্থাপত্যের বর্ণনা করো। এগুলোর কী এমন কোনো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা থেকে মনে করা যায় যে এগুলো রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। সেখানে কী এমন কোনো ভবন রয়েছে যেগুলোর আনুষ্ঠানক গুরুত্ব ছিল? বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের জন্য সেখানে একটি এলাকা আছে কী? চারপাশের এলাকা থেকে নগরবিন্যাসকে পার্থক্য করে এমন বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

12. তোমার আশে পাশে একটি ধর্মীয় ভবন দর্শন করো। এর ছাদ, স্তম্ভ এবং খিলান (যদি থাকে), বারান্দা, পথ, হলঘর, প্রবেশপথ, জলসরবরাহ প্রভৃতি নকশাসহ বর্ণনা করো। বিরূপাক্ষ মন্দিরের বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে এগুলোর তুলনা করো। হৃত হত বর্ণনা করো। এর ইতিহাস খুঁজে বের করো।

If you would like to know more, read:

Vasundhara Filliozat. 2006 (rpt). *Vijayanagara.* National Book Trust, New Delhi.

George Michell. 1995. *Architecture and Art of Southern India.* Cambridge University Press, Cambridge.

K.A. Nilakanta Sastri. 1955. *A History of South India.* Oxford University Press, New Delhi.

Burton Stein. 1989. *Vijayanagara (The New Cambridge History of India Vol.1, Part 2).* Foundation Books, New Delhi.

For more information, you could visit:
http://www.museum.upenn.edu/new/research/Exp_Rese_Disc/Asia/vrp/HTML/Vijay_Hist.shtml

বিষয়বস্তু
আট

কৃষক, জমিদার এবং রাষ্ট্র

কৃষি ভিত্তিক সমাজ এবং মোগল সাম্রাজ্য (আনুমানিক ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী)

চিত্র 8.1 : চিত্র ঃ একটি গ্রামীণ দৃশ্য সপ্তদশ শতকের মোগল চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার প্রায় পঁচাশি শতাংশ গ্রামে বসবাস করত। ছোট কৃষক এবং উচ্চবিত্ত ভূ-স্বামী উভয়েই কৃষিক্ষেত্রে জড়িত ছিল এবং উভয়েই উৎপাদিত ফসলের অংশভোগী ছিল। এর ফলে তাদের মধ্যে সহযোগীতা, প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক তোলে। এই সম্পর্কের টানাপোড়েনের উপরই তৎকালীণ গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে উঠে।

এই সময়ে গ্রামগুলোতে বহিরাগত শক্তিরও অনুপ্রবেশ ঘটে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মোগল সাম্রাজ্য। যার আয়ের প্রধান উৎস ছিল কৃষি উৎপাদন। রাজ্যের রাজস্ব নির্ধারক, রাজস্ব আদায়কারী এবং হিসাবরক্ষক গ্রামীণ সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত। যাতে রাজ্যের কৃষকরা চাষাবাদ করে এবং কৃষিপণ্য থেকে রাজ্যের বরাদ্দ রাজস্ব যেন সঠিক সময়ে পাওয়া যায়। যেহেতু কিছু কিছু ফসলের উৎপাদন মূলত বিক্রির জন্য, তাই ফসলের বাণিজ্যিকরণ ঘটে, বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রা এবং বাজার অর্থনীতি গ্রামে সম্প্রসারিত হয়। ফলে কৃষি অঞ্চলগুলোর সাথে শহরের সংযোগ ঘটে।

1. কৃষক ও কৃষিজাত উৎপাদন

কৃষিভিত্তিক সমাজের বুনিয়াদ হল গ্রাম, যেখানে কৃষকরা বসবাস করত। কৃষকরা সারাবছরই বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকত। জমিচাষ, বীজ বপন, পাকা ফসল কেটে ঘরে তোলা– এই কাজগুলি ছিল অন্যতম। এছাড়া তারা চিনি এবং তেলের উৎপাদনের মতো কৃষিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত থাকত।

তবে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কৃষকদের উৎপাদিত ফসলই গ্রামীণ ভারতের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না, দেশে ছিল সেসব ভূখণ্ড, যা নিতান্ত শুষ্ক, পাথুরে, কর্ষণ অযোগ্য এবং ছিল বিশাল বনাঞ্চল, যেখানে উর্বর ভূমির মতো চাষাবাদ সম্ভব ছিল না। কৃষিভিত্তিক সমাজ নিয়ে আলোচনা করার সময় আমাদের এইসব বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রাকৃতিক

বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখতে হবে।

1.1 তথ্যসূত্রের সন্ধানে

যেহেতু কৃষকরা নিজেদের জীবন সম্পর্কে কিছু লিখে যায়নি, তাই অতীতের গ্রামীণ জীবনধারা সম্পর্কে আমরা যে তথ্য পেয়েছি এর কোন কিছুই গ্রামীণ মানুষ, যারা জমিতে কাজ করত তাদের থেকে প্রাপ্ত নয়, ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে ভারতের কৃষিবিষয়ক ইতিহাসের জন্য আমরা মোগল দরবারের ঘটনাপঞ্জী এবং দলিল দস্তাবেজের উপর নির্ভরশীল। (নবম অধ্যায়ে দেখো)।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম ছিল 'আইন-ই-আকবরী' (সংক্ষেপে আইন, অষ্টম বিভাগ দেখো) যা সম্রাট আকবরের সভাসদ ইতিহাসবিদ আবুল ফজল লিখেছিলেন মোগল আমলের কৃষিব্যবস্থা, সম্রাটের আমলাদের মাধ্যমে খাজনা আদায় প্রথা, সম্রাট এবং গ্রামীণ জীবনের প্রভাবশালী ব্যক্তি, জমিদার, এদের আন্তঃসম্পর্ক এই গ্রন্থে অতি নিপুণভাবে লিখিত রয়েছে।

আইন-ই-আকবরীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থার একটি আদর্শ রূপকল্প তৈরী করা, যেখানে সামাজিক সমতা রক্ষা করতে শক্তিশালী শাসকশ্রেণি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন অভ্যুত্থান বা কোন দেশীয় শক্তির আত্মপ্রকাশ ব্যর্থ হওয়া নিশ্চিত ছিল। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে তা দেখানোর প্রয়াস করা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, কৃষকদের সম্পর্কে আইন-ই-আকবরীতে আমরা যা কিছু জানতে পারি তা হচ্ছে সমাজের উর্দ্ধতনের দৃষ্টিভঙ্গী।

সৌভাগ্যক্রমে আইন-ই-আকবরী বর্ণনার পরিপূরক কিছু তথ্য মোগল রাজসভা-বহির্ভূত ভিন্নতর সূত্র থেকে ও পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানের রাজস্ব সংক্রান্ত কিছু দস্তাবেজ। এছাড়াও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর (দশম অধ্যায়ে দেখো) অনেকগুলো দস্তাবেজে ও পূর্বভারতের কৃষি সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, এইসব সূত্রে কৃষক, জমিদার এবং সম্রাটের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস ও পাওয়া যায়, এ থেকে তৎকালীন কৃষক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী এবং রাষ্ট্রের কাছে তাদের প্রত্যাশা সমন্ধে ও বিশদভাবে জানা যায়।

1.2 কৃষক সমাজ এবং তাদের ভূ-সম্পত্তি

মোগল যুগের ইন্দো-পার্সিয়ান উৎসগুলিতে কৃষককে বোঝাতে 'রায়ত' (বহুবচন, রিয়ায়া) বা 'মুজারিয়াত্র' শব্দের ব্যবহার করা হত। এছাড়া 'কিষাণ' বা 'আসামী' শব্দগুলিও আমরা পাই। সপ্তদশ শতাব্দীর দলিলপত্রে দুই ধরনের কৃষকের উল্লেখ পাওয়া যায় খুদকাস্তা এবং পাহী কাস্তা। প্রথম শ্রেণিটি ছিল (খুদকাস্তা) সেই ধরনের কৃষক যারা

উৎস 1

কৃষকদের স্থানান্তর

কৃষি নির্ভর সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা মোঘল সম্রাট বাবরের মতো প্রখর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন সম্রাটকে এতটাই তাড়িত করেছিল যে তিনি তাঁর আত্মকাহিনী 'বাবর নামায়' উল্লেখ করেছেন–

> হিন্দুস্থানের বস্তি এবং গ্রাম এমনকি শহর ও এক মুহূর্তে জনমানবহীন হয়ে পড়ে এবং একমুহূর্তে নতুনভাবে গড়ে উঠে। অনেকবছর ধরে বসবাস কারী কোনো বড়ো শহরের মানুষ যদি সেই শহর ছেড়ে চলে যেত তবে একেবারে শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত লোপাট করে দিয়ে যেত। অপর দিকে, যদি তারা কোনো জায়গায় বসতিস্থাপন করতে চাইত তাহলে তাদের জলের জন্য কোন উৎস খনন করতে হত না, কারণ তাদের সব ফসলই বৃষ্টির জলে ফলানো হতো এবং যেহেতু হিন্দুস্থানের জনসংখ্যা এমনিতেই বেশী, নতুন কোন শহর আত্মপ্রকাশ করলে তা অল্পদিনের মধ্যেই জনপূর্ণ হয়ে উঠে। ফলে চটজলদি পুকুর বা কুয়ো খনন করে নিত; তাদের ঘর বানানোর বা দেওয়ালে তোলার ও প্রয়োজন হত না —'খাস' ঘাস ছিল প্রচুর, কাঠও ছিল প্রচুর, ঝুপড়ি তৈরি করা হত, এবংএই সব কারণেই খুব কম সময়ের মধ্যে একটি শহর বা গ্রাম তৈরি হয়ে যেত।

➲ উত্তর ভারতের কৃষিজীবন যাত্রার এমন কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দাও যা বাবরের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল।

সেখানকার বাসিন্দা এবং জমির প্রত্যক্ষ দখলদার। দ্বিতীয়টি (পাহিকাস্তা) ছিল অনাবাসী কৃষক যারা ছিল অন্য কোন গ্রামের বাসিন্দা, কিন্তু চুক্তির ভিত্তিকে অন্যত্র জমি চাষ করত। কোন কোন মানুষ নিজের ইচ্ছাতেই পাহিকাস্তে পরিণত হত— উদাহরণস্বরূপ, যখন দূরবর্তী গ্রামে খাজনার শর্তগুলি খুব অনুকূল বা কম ছিল। আবার কখনো কখনো তারা এটা বাধ্যতামূলক করত, উদাহরণস্বরূপ যখন দুর্ভিক্ষের সময় অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিত।

উত্তর ভারতে গড়ে খুব কম সংখ্যক কৃষকের কাছেই এক জোড়া বলদ এবং দুটি লাঙ্গালের অধিক সম্পত্তি ছিল না, বেশীর ভাগের কাছে এর কম ও ছিল। গুজরাটে যে কৃষকের কাছে ছয় একরের কাছাকাছি জমি ছিল তারা সমৃদ্ধ কৃষক বলে বিবেচিত হত, অন্যদিকে বাংলায় গড়ে একজন কৃষকের সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ ছিল পাঁচ একর, দশ একর জমি আছে এমন 'আসামীকে' ধনী হিসাবে বিবেচিত করা হত। সে সময় ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক চাষ প্রথা প্রচলিত ছিল। কৃষকের জমিগুলো অন্যান্য সম্পত্তির মালিকদের মতোই জমি ক্রয় বিক্রয় করতে পারত।

ঊনবিংশ শতকের প্রজাসত্ত্ব ব্যবস্থা দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলে সপ্তদশ শতাব্দীর অনুরূপ ছিল ঃ

> কৃষি শ্রমিক (আসামী) হল এরা, যারা মাটি চাষ করে, জমির সীমা নির্ধারণের জন্য মাটি, ইট কিংবা গাছের কাঁটা, ইত্যাদি ব্যবহার করে, যাতে গ্রামের হাজার হাজার ভূখন্ডকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা সম্ভব।

1.3 জলসেচ এবং সেচ প্রযুক্তি

জমির আধিক্য, শ্রমিকের জোগান এবং চাষীদের গতিশীলতা এই তিনটি বিষয়ের উপরই কৃষির বিস্তার নির্ভরশীল ছিল। যেহেতু কৃষিকাজের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল মানুষের খাদ্যের যোগান দেওয়া, তাই দৈনন্দিন জীবনের মৌলিক প্রধান খাদ্য যেমন ধান, গম, এবং মিলেট (বার্লি, জোয়ার, বাজরা) উৎপাদনে গুরুত্ব দেওয়া হত। যেসব এলাকায় প্রতিবছর চল্লিশ ইঞ্চি বা তার থেকে বেশী বৃষ্টিপাত হত সেগুলো ছিল সাধারণত ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল, এর থেকে কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে গম এবং মিলেট চাষ করা হত।

আজকের দিনের মতো সে যুগেও ভারতের কৃষি ছিল মৌসুমী বায়ু। তবে তখনও কিছু কিছু শস্যের জন্য অতিরিক্ত জলের প্রয়োজন হত। তাই সেচের জন্য কৃত্রিম ব্যবস্থা তৈরি করতে হয়েছিল।

উৎস 2

বৃক্ষ এবং জমিতে সেচ ব্যবস্থা

এইটি 'বাবরনামা' থেকে নেওয়া একটি অংশ যেটি সেচব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দেয় যা সম্রাট উত্তর ভারতে দেখেছিলেন ঃ

হিন্দুস্থানের বৃহত্তর অংশ সমতল অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে শহর এবং আবাদী জমি প্রচুর ছিল কিন্তু কোথাও জলধারা নেই ... কারণ ... ফসল উৎপাদন এবং বাগানের জন্য জলের কোনো প্রয়োজন হয় না। শরতের ফসল বর্ষাকালের বৃষ্টিতেই বেড়ে যায় এবং আশ্চর্যের বিষয় হল বসন্তের ফসল তো তখনও বৃদ্ধি পায় যখন বৃষ্টিপাত একেবারেই হয় না। (তা সত্ত্বেও) চারাগাছগুলোতে বালতি বা চাকার মাধ্যমে জল দেওয়া হতো .... ।

লাহোর, দীপালপুর (বর্তমানে দুটো শহরই পাকিস্থানে অবস্থিত) এবং অন্যান্য জায়গায় লোকেরা চাকা ঘুরিয়ে জলসেচ করত। তারা দড়ির দুটো বৃত্ত বানাত এবং কুয়োর গভীরতা অনুসারে দড়িটির দৈর্ঘ্য ঠিক করা হত। তারা এই বৃত্ত দুটির মাঝে মাঝে কাঠের পাল্লা লাগায় এবং এইসব পাল্লায় কলসী বাঁধা হত। কাঠের পাল্লায় দড়ি দিয়ে বাধা কলসগুলো কুয়োর উপর ঝোলানো হত। একটি চাকার অক্ষের আরেক প্রান্তে দ্বিতীয় চাকা লাগানো হয় এবং এটি সোজা অক্ষরেখায় থাকে। সর্বশেষ চাকাটি বলদ দিয়ে ঘোরানো হত। এই চাকাটি দ্বিতীয় চাকাটিকে আঁকড়ে ধরত, যার ফলে কলসী বাধা চাকাটি ঘুরতে শুরু করত, কলসীর জল যেখানে পড়ত সেখানে একটি নালা তৈরি করা হত যার মাধ্যমে সেই জল বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পৌঁছাত।

আগ্রা, চাঁদওয়ার, বায়না (বর্তমানে উত্তর প্রদেশ অবস্থিত) এবং অন্যান্য জায়গায় লোকেরা বালতির সাহয্যে জলসেচ করত। কুয়োর প্রান্তে তারা কাঠের দন্ড স্থাপন করে তার মধ্যে একটি বেলনি আটকে দিত। একটি বড়ো বালতিতে একটি দড়ি বাঁধা হত এবং দড়িটি বেলনির উপর রেখে তার অপর প্রান্তটি একটি বলদের সঙ্গে ঘোরাত, অন্য ব্যক্তি বালতি থেকে জল সংগ্রহ করত।

➲ বাবর যে ধরনের সেচ ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তার সাথে বিজয়নগরের সেচ (সপ্তম অধ্যায়) ব্যবস্থার তুলনা করো। প্রচলিত এই দুই ধরনের সেচ ব্যবস্থায় কী ধরনের উপাদান প্রয়োজন ? কৃষি কাজের উন্নয়নে কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করা উচিত ?

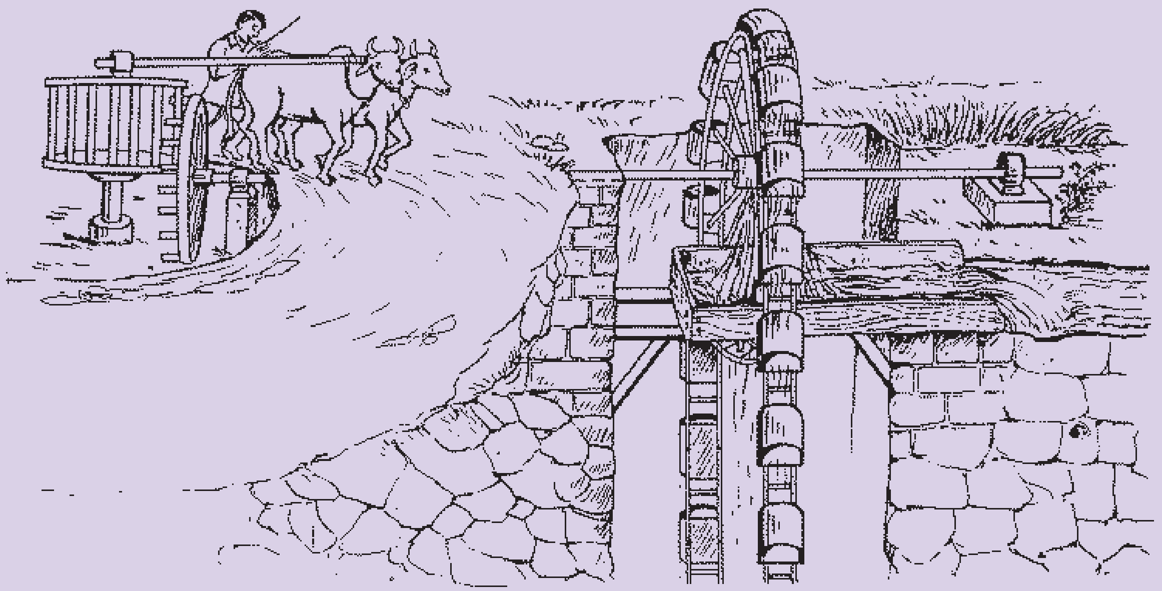

চিত্র 8.2 পারস্য দেশীয় জলটানার চাকা

সেচ প্রকল্পগুলো সরকারি সাহায্য লাভ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোতে অনেক নতুন খাল খনন করা হল এবং অনেক পুরানো খাল সংস্কার করা হয়, যেমন- শাহজাহানের রাজত্বকালে পাঞ্জাবের 'শাহনাহর' খাল।

যদিও কৃষিকাজ শ্রম নির্ভর, কিন্তু কৃষকেরা গবাদি পশুর সাহায্যে কিছু প্রযুক্তি ও ব্যবহার করত। এমন একটি উদাহরণ হল কাঠের হালকা লাঙ্গল যেটি সহজেই লোহার প্রান্ত বা ফলা দিয়ে বানানো যায়। ফলে এই লাঙ্গলগুলো দিয়ে মাটির গভীরে কর্ষণ করা যেত না, ফলে তীব্র গরমের মাসে ও আর্দ্রতা বজায় থাকত। একজোড়া বলদের সাহায্যে টানা ছিদ্র যন্ত্রের দ্বারা জমিতে বীজ রোপন করার পদ্ধতি ছিল বেশ প্রচলিত। মাটি কর্ষণ করার সাথে সাথে আগাছা পরিস্কার করার জন্য কাঠের হাতলযুক্ত লোহার পাতলা বাটালি ব্যবহার করা হত।

তামাকের প্রসার

এই গাছটিকে প্রথমে দাক্ষিণাত্যে আনা হয়েছিল এবং সেখান থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর ভারতে আনা হয়। আইন-ই-আকবরীতে উত্তর ভারতের ফসলের তালিকায় তামাকের উল্লেখ নেই। 1604 সালে প্রথমবার আকবর এবং তাঁর সভাসদরা তামাকের সন্ধান পান। মনে করা হয় যে ওই সময় থেকেই তামাক দিয়ে ধূমপান (হুক্কা বা ছিলাম) করার প্রথা বড়োমাত্রায় দেখা যায়। জাহাঙ্গীর তামাকের প্রতি আসক্তি সমন্ধে এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে তিনি এটি নিষিদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ প্রমাণিত হয় কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, তামাক সমগ্র ভারতবর্ষে খাওয়া, চাষবাস এবং ব্যবসার মুখ্য উপাদানে পরিণত হয়।

1.4 শস্যের প্রাচুর্য

মৌসুমী বায়ুর দুটি চক্র অনুসারে কৃষিকাজ করা হত, একটি ছিল খারিফ (শরৎকার) শস্য এবং দ্বিতীয়টি ছিল রবি শস্য (বসন্ত কাল)। এর অর্থ হল শুষ্ক বা অনুর্বর জমি ছাড়া বেশীরভাগ অঞ্চলেই বছরে দুবার ফসল উৎপাদন করা হত। তবে সেখানে বৃষ্টিপাত বেশি হত। বা সেচের জন্য অবিচ্ছিন্ন জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল সেখানে বছরে তিনবার ও ফসল উৎপাদন করা যেত। এভাবে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদিত হত। উদাহরণস্বরূপ আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে মোঘল প্রদেশ আগ্রাতে 39 প্রকার ফসল উৎপাদিত হত এবং দিল্লীতে 43 প্রকার ফসল উৎপাদিত হত। বাংলায় 50 প্রকারের শুধু চালই উৎপাদিত হত।

প্রধানত খাদ্যশস্যের উৎপাদনের উপর গুরুত্বের অর্থ এ নয় যে, মধ্যযুগের ভারতে ফসল উৎপাদন হত কেবল খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে জিনস-ই-কামিল (আক্ষরিক অর্থে সর্বোত্তম ফসল) এর মতো শব্দের সম্মুখীন হই। মোঘল সরকার কৃষকদের এ জাতীয় ফসল চাষ করতে উৎসাহিত করত, কারণ এই জাতীয় ফসল থেকে অনেক বেশী রাজস্ব আদায় করা যেত। তুলো এবং আঁখের মত শস্যগুলো ছিল শ্রেষ্ঠ জিনস-ই-কামিল। মধ্যভারত এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে বিস্তৃত এক বিশাল অংশ জুড়ে তুলো উৎপাদিত হত, অপরদিকে বাংলা আঁখ চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। তৈলবীজ (যেমন-সর্ষে) এবং ডাল জাতীয় শস্যও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর থেকে বোঝা যায় একজন কৃষকের জমিতে কিভাবে খাদ্য এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন এক অপরের সাথে যুক্ত ছিল।

কৃষির বিকাশ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি

জাতীয় বৈচিত্রময় এবং সুললিত ফসল উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হল ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। অর্থনৈতিক ইতিহাস বিদদের হিসেব অনুসারে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ইত্যাদি দ্বারা লোকক্ষয় সত্ত্বেও 1600 থেকে 1800 খ্রীঃ মধ্যে ভারতে প্রায় পাঁচ কোটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ দুশো বছরে প্রায় 33 শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বেশ কয়েকটি নতুন ফসল ভারতীয় উপমহাদেশে পৌছে ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আফ্রিকা ও স্পেন হয়ে ভুট্টা ভারতে আসে

এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে এটি পশ্চিম ভারতের অন্যতম ফসলে পরিণত হয়। আনারসও পেঁপের মত টমেটো, আলু এবং লঙ্কা ও নতুন বিশ্ব (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা) থেকে ওই সময় ভারতে এসে পৌঁছায়।

2. গ্রামীণ সম্প্রদায়

উপরে উল্লিখিত বিবরণটি থেকে এটি পরিষ্কার যে কৃষিপণ্য উৎপাদনে কৃষকরা নিবিড়ভাবে অংশগ্রহণ করত। মোগল সামাজ্য কাঠামোর এই কৃষি সম্পর্ক কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল? এর উত্তর খুঁজতে হলে সেই সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে যারা কৃষি সম্প্রসারণের সাথে জড়িত ছিল, সাথে সাথে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক ও দ্বন্ধ ছিল তা ও খুঁজে বের করতে হবে।

আমরা দেখেছি যে, কৃষকরা জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ভোগ করত, আবার এটা সত্যি যে, একই সাথে এরা আবার একটি যৌথ গ্রামীণ সমাজের অন্তর্ভুক্তও ছিল। এই সমাজের তিনটি স্তর ছিল কৃষক, পঞ্চায়েত এবং গ্রাম প্রধান (মুকাড্ডম বা মন্ডল)।

2.1 বর্ণ এবং গ্রামীণ সমাজ

সমাজে বর্ণভিত্তিক অসাম্য এবং বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য এটাই জানান দেয় যে, ভারতের কৃষিভিত্তিক সমাজ ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিপূর্ণ বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত, জনগোষ্ঠী। যারা ভূমিচাষ করত এদের প্রধান অংশই ছিল ভৃত্য বা কৃষিমজুর (*majur*) শ্রেণীর মানুষ।

প্রচুর পরিমাণে আবাদযোগ্য জমি থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কিছু বর্ণের মানুষকে শুধু 'নিচু' ধরনের কাজে যুক্ত রাখা হতো, যেমন চাকর বা মুজুরের কাজ, পরিনামে তাদের ভাগ্যে দারিদ্র ছিল অবশ্যম্ভাবী। যদিও ঐ সময়ের আদমসুমারীর কোন পরিসংখ্যান নেই, তবুও যে সামান্য তথ্য আমরা পেয়েছি তার থেকে এটা স্পষ্ট যে, গ্রামের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশই দরিদ্র মজদুর ছিল, এদের কোন আর্থিক সঙ্গতি ছিল না, সমাজ কাঠামোর এদের শ্রেণীগত অবস্থানের জন্যই এরা ছিল বর্তমান ভারতের দলিত শ্রেণীর মতোই। এই বিভাজন ক্রমে অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যেও পরিব্যপ্ত

➲ আলোচনা করো ঃ

এই অংশে কৃষিকাজ সমন্ধীয় কার্যকলাপ এবং প্রযুক্তির যে সব কথা বর্ণিত হয়েছে এর মধ্যে কোনগুলি দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত কোন কোন কার্যকলাপ ও প্রযুক্তির অনুরূপ এবং কোন কোনগুলি পৃথক?

চিত্র 8.3 উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের একটি চিত্রে পাঞ্জাবের একটি গ্রাম।

➲ আলোচনা কর নারী পুরুষেরা কী কাজে ব্যস্ত, পেক্ষাপটে কি স্থাপত্য বিদ্যমান?

হতে থাকে। মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হালাল খোরন (মেথর) শ্রেণীর বাসস্থান ছিল গ্রামের সীমানার বাইরে। একইভাবে বিহারে মল্লা হাজাদাস (মাঝির সন্তান) ছিল প্রায় ক্রীতদাসের মতই।

সমাজের একেবারে নিচু স্তরে বর্ণ, দারিদ্র্য এবং সামাজিক অবস্থান– এ তিনটির মধ্যে একটি আন্তঃসম্পর্ক ছিল। অবশ্য সমাজের মধ্যবর্ত্তী স্তরে এই ধরনের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। সপ্তদশ শতাব্দীতে মারোয়ার এর একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে রাজপুতদের দেখানো হয়েছে কৃষক হিসেবে এবং তৎকালীন সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে একটু নিচু স্তরে অবস্থিত জাঠদের সঙ্গে এদের একই সামাজিক অবস্থান দেখানো হয়েছে। বৃন্দাবনের আশপাশে (উত্তরপ্রদেশে) যে গৌরব সম্প্রদায় কৃষি কাজ করত, সপ্তদশ শতকে এরা রাজপুত হিসেবে মর্যাদার দাবিদার হয়। গো-পালন এবং উদ্যান চাষে পারদর্শিতার জন্য আহির, গুজর এবং মালি-দের সামাজিকভাবে একটু উঁচু স্তরে উত্তরণ ঘটে। পূর্বাঞ্চলে পশুপালক এবং মৎসজীবীর মধ্যবর্তী শ্রেণি থেকে সদ্‌গোপ এবং কৈবর্ত শ্রেণির উত্তরণ ঘটে কৃষকের স্তরে।

2.2 পঞ্চায়েত এবং গ্রামপ্রধান

গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল গ্রামের বয়োজেষ্ঠ্য এবং প্রভাবশালী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সমাবেশ। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা পৈত্রিক সূত্রে গ্রামে ভুসম্পত্তির অধিকারী ছিল। পঞ্চায়েত সাধারণত বিভিন্ন বর্ণের মিশ্র সামাজিক উপাদানে গঠিত সংগঠন। এতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বও থাকত, তবে শ্রমিক এবং কৃষি মজুরদের প্রতিনিধিত্ব প্রায় ছিল না। পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত ছিল সবার জন্য অবশ্য পালনীয়।

পঞ্চায়েতের প্রধানকে মুকাদ্দাম বা মন্ডল বলা হত। কিছু কিছু সূত্র থেকে জানা যায় যে, গ্রামের বয়োজেষ্ঠ্যদের ঐক্যমতে মোড়ল নির্বাচন করা হত এবং নির্বাচনের পর গ্রামের জমিদারের কাছ থেকে সে সম্পর্কে অনুমোদন নিতে হত। গ্রামের মোড়লের প্রধান কাজ ছিল পঞ্চায়েতের হিসাবরক্ষক বা পাটোয়ারীর সাহায্য নিয়ে গ্রামের আয়ব্যয়ের হিসাবের তদারকি করা।

পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষের আর্থিক অনুদান দিয়েই পঞ্চায়েতের অর্থ তহবিল গঠন করা হত। এই তহবিল থেকেই সরকারি আমলাদের গ্রাম পরিদর্শনের ব্যয়ভার নির্বাহ করা হত। এছাড়াও বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার মতো জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের জন্যও এই তহবিল ব্যবহার করা হত। বাঁধ নির্মাণ এবং খাল খননের মতো কাজ বা কৃষকদের পক্ষে একা করে উঠা সম্ভব হত না, এসব কাজও ঐ তহবিলের অর্থ থেকেই ব্যয় করা হত।

দূনীতিগ্রস্ত মন্ডল

মন্ডল প্রায়শই তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করত। তাদের বিরুদ্ধে মূলত এই অভিযোগ করা হত যে, তারা পাটোয়ারীদের সাথে মিলে গ্রামের হিসেবের কাজে গরমিল করত। তারা তাদের নিজস্ব জমির রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করে, ছোট কৃষকদের উপর অতিরিক্ত রাজস্বের বোঝা চাপিয়ে দিত।

গ্রাম বর্ণপ্রথা যথাযথভাবে পালন হচ্ছে কিনা, এসবের নজরদারিও পঞ্চায়েতের কর্মসূচীর অন্যতম বলে বিবেচিত হত। পূর্ব ভারতে গ্রামে বিবাহ সম্পন্ন হত মন্ডলের উপস্থিতিতে। গ্রাম প্রধানের দায়িত্ব ছিল 'জনগণের আচার-আচরণ পর্যবেক্ষন করা, বিশেষ করে বর্ণপ্রথার উপর সবধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করা'।

অবাধ্য গ্রামবাসীর উপর জরিমানা ধার্য করা, তাকে শাস্তি দেওয়া এমনকি সমাজচ্যুত করে দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল পঞ্চায়েতের। সমাজ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়াটা ছিল কঠোর শাস্তি, যদিও এর মেয়াদ ছিল স্বল্পকালীন। বহিস্কৃত ব্যক্তি গ্রামে থাকার অধিকার হারাত এবং তাকে তার পৈতৃক পেশা থেকেও বঞ্চিত হতে হত। সাধারণত এই ধরনের শাস্তি দেওয়া হত বর্ণপ্রথা ভঙ্গাকারীদের।

চিত্র ৪.4 উনবিংশ শতকের প্রথম দিকের একটি চিত্র। এখানে গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ্য এবং খাজনা আদায়কারীদের সভা হচ্ছে।

➲ গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ও খাজনা আদায়কারীকে আলাদা করে বোঝাতে চিত্রশিল্পী কি উপায় অবলম্বন করেছেন?

গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়াও প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব একটা জাতি-পঞ্চায়েত ছিল। গ্রামীন সমাজে এই পঞ্চায়েতগুলির যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। রাজস্থানে আবার এই জাতি পঞ্চায়েত বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে দেওয়ানী মামলার মধ্যস্থা ক রত। জমি বিবাদ মধ্যস্থতা করা, নিজ শ্রেণির মধ্যে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কোন বিবাহ সংঘটিত হয়েছে কিনা, গ্রামীণ অনুষ্ঠানাদিতে কারা অগ্রাধিকার পাবেন এ সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অগ্রাধিকারও ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের। কিছু ফৌজদারী মামলা বাদ দিলে বেশীরভাগ থেকে সরকার জাতি পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিত।

পশ্চিম ভারতের বিশেষ করে রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্রের মহাফেজ খানার সূত্র অনুসারে পঞ্চায়েতে দাখিল করা অনেক দরখাস্ত পাওয়া গেছে। এতে উচ্চবর্ণের ব্যক্তি, সরকারী আমলাদের জবরদস্তি কর আদায়, শ্রমিকদের বেগার খাটানোর বিষয়ে অনেক তথ্য রয়েছে। আবেদনপত্রগুলোর বেশীর ভাগই এসেছে সমাজের নিচু স্তর থেকে। এগুলো সাধারনত সম্প্রদায়ভিত্তিক যৌথভাবে দাখিল করা অভিযোগ। অনেক সময় উচ্চবর্ণের অবৈধ দাবীর বিরুদ্ধে অভিযোগই ছিল দরখাস্তের উদ্দেশ্য বিশেষ করে খরা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে অতিরিক্ত কর ভার কৃষকদের জীবন বিপন্ন করে তুলত। দরখাস্ত কারীদের অভিমত, তাদের জীবন নির্বাহের ন্যুনতম অধিকার দাবীর পেছনে সামাজিক স্বীকৃতও বিদ্যমান।গ্রাম পঞ্চায়েতকে এরা আপীল আদালতের মতো দেখত এবং বিশ্বাস করত যে, রাষ্ট্র সুবিচারও নৈতিকতার প্রতি নিষ্ঠাবান।

নিম্নবর্ণের চাষী এবং সরকারী আমলা, স্থানীয় জমিদারদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের মামলার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতে সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন হত। অতিরিক্ত কর দাবীর বিবাদের বিষয় পঞ্চায়েতের তৎপরতার সমঝোতার মাধ্যমেই নিষ্পন্ন হত। আর যখন কোন ধরনের আপোস নিষ্পত্তি হত না তখন কৃষকরা সংঘবদ্ধ ভাবে গ্রাম পরিত্যাগ করার মতো চরম সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে বাধ্য হত। যেহেতু সেই সময় দেশে চাষযোগ্য জমির যোগান ছিল অঢেল এবং শ্রমিকদের মধ্যে সেরকম প্রতিযোগিতাও ছিল না, তাই এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়াটাকে মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে কৃষকরা ব্যবহার করত।

চিত্র 8.5

অষ্টাদশ শতাব্দীর এক চিত্রে বস্ত্রশিল্পে কর্মরত মানুষ

➲ কারা কি কাজ করছে বর্ণনা কর

2.3 গ্রামীণ কারিগর

গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত বিনিময় প্রথাটিও ছিল উল্লেখযোগ্য। এ বিনিময় হত উৎপাদন কারীদের মধ্যে। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে মহারাষ্ট্রে প্রাপ্ত গ্রামীণ দলিল এবং প্রতিবেদন গুলো পর্যবেক্ষণ করে জানা যায়, তৎকালীন সময়ে দেশে বিশাল সংখ্যক কারিগরশ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। এমনকি গ্রামের শতকরা 25 ভাগ পরিবারই ছিল কারিগরশ্রেণির।

একটা সময়তো কারিগর এবং কৃষিজীবীর মধ্যে কোন ব্যবধানই প্রায় ছিল না। মানুষ অনেক সময় কৃষির সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্পের কাজ অর্থাৎ দু'ধরনের কাজই করত। কাপড় রং করা, কাপড়ে ছাপাইয়ের কাজ করা, পোড়া মাটির বাসন তৈরি করা, কৃষি সামগ্রী তৈরি এবং মেরামত

করা– এসবও ছিল তাদের কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম। কৃষি সময়ে বছরে এক একটা কর্মবিহীন অধ্যায় থাকে— অর্থাৎ মাটি কর্ষণ থেকে মাঠে আগাছা পরিষ্কারের প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত অন্তবর্তী সময়, কিংবা আগাছা পরিষ্কার থেকে ফসল কাটার মাঝামাঝি সময় এ ছিল কৃষকদের হস্তশিল্প কর্মে ব্যস্ত থাকার পর্ব।

গ্রামের কারিগর সম্প্রদায় যেমন— কামার, কুমোর, ছুতোর, নাপিত, স্বর্ণকার—এরা দিতেন একটু ভিন্ন ধরনের পরিষেবা এবং গ্রামবাসীর এর পরিবর্তে এদের বিভিন্ন উপায়ে পারিশ্রমিক দিতেন। উৎপাদিত ফসলের ভাগ দেওয়া ছিল একটি বহু প্রচলিত প্রথা। এছাড়াও পঞ্চায়েতের অনুমোদনক্রমে এই কারিগর শ্রেণীর লোকেরা কৃষিজমির উদ্বৃত্ত একটি অংশের অংশীদারও হতে পারতেন। মহারাষ্ট্রে এ ধরনের জমিই বংশানুক্রমিক অধিকারের ভিত্তিতে কারিগরদের ‘মিরাশ’ বা ‘ওয়াতন’ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এ প্রথার ব্যতিক্রম হিসেবে কারিগর এবং কৃষক-ভূ-স্বামীর মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যেত। সাধারণত এ ছিল কোন পরিষেবার সঙ্গো দ্রব্য বিনিময়, অষ্টাদশ শতকের দলিলে দেখা গেছে জমিদারেরা কামার, ছুতার, স্বর্ণকারদের তাদের শ্রমের বিনিময়ে দৈনিক পারিশ্রমিক ও আহার বাবদ মূল্য দিতেন। পরবর্ত্তী কালে এটিই যজমানি প্রথা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এগুলো খুব আকর্ষণীয় উদাহরণ যা থেকে গ্রামীণ জীবনের তৃণমূল স্তরে বিনিময়ে ব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে উঠার জটিল সূত্রগুলো সনাক্ত করা সম্ভব। এই সময়ে অবশ্য নগদ বিনিময়ের প্রথাও অজানা ছিল না।

2.4 একটি ক্ষুদ্র গণরাজ্য ?

গ্রামীণ সমাজের গুরুত্ব কিভাবে বোঝা যায় ? উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ প্রশাসকদের কেউ কেউ এই গ্রামগুলিকে এক একটি ক্ষুদ্র গণরাজ্য হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। গ্রামগুলোর বাসিন্দারা নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে যৌথভাবে গ্রামের সম্পদ ভোগ করতেন এবং উৎপাদনেও যৌথভাবে শ্রমদান করতেন। তবে এটাকেও সম অধিকার সম্পন্ন গ্রাম সমাজের উদাহরণ হিসেবে দেখানো যাবে না। সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল পাশাপাশি বর্ণ ও লিঙ্গভেদে সমাজে তীব্র বৈষম্যও বিদ্যমান ছিল। একটি ক্ষমতাবান গোষ্ঠী গ্রামের কর্ম পরিচালনার দিকটি তদারকি করতেন, গরীবদের উপর শোষনও চালাতেন এবং শাসনের অধিকারটি নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতেন।

আর ইতিমধ্যে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে ব্যবসায়িক সূত্রে একটা নগদ বিনিময়ের সম্পর্ক গড়ে উঠে। মুঘল সাম্রাজ্যের মূল অঞ্চলেও রাজস্ব নির্ধারণ এবং আদায় হত

গ্রামাঞ্চলে মুদ্রার প্রচলন

ফরাসি পরিব্রাজকর জাঁ বাপ্তিঁস্তা তার্ভে নিয়ের (সপ্তদশ শতকের) বলেছেন যে টাকা পয়সা লেনদেনকারী ব্যাপারীরা যদি না থাকত তবে ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতি নিতান্তই সংকীর্ণ হয়ে থাকত। এই ব্যাপারীরা এক ধরনের ব্যাঙ্কারই ছিলেন, যারা টাকা পয়সার প্রচলনে মূখ্য ভূমিকা নিতেন। এরা টাকা ভাঙ্গিয়ে পয়সা এবং পয়সা ভাঙ্গিয়ে কড়িতে রূপান্তর করে দিতেন।

চিত্র 8.6
কর্তব্যরত এক ব্যাপারী

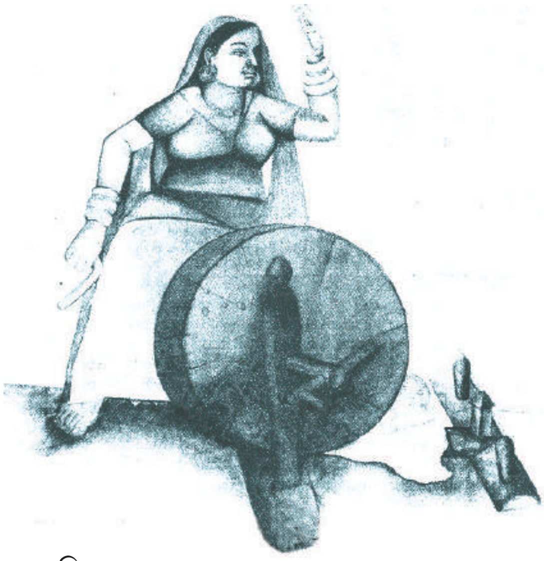

চিত্র 8.7
সূতা কাটায় ব্যস্ত রমনী

নগদে। রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনের বিনিময়ে কারিগররা তাদের দাদন বা পারিশ্রমিক ওই নগদেই পেত। রেশম, নীল এসব বাণিজ্য দ্রব্যও একইভাবে নগদে বিক্রি হত।

➲ আলোচনা করো ঃ

এই অধ্যায়ে যে সব পঞ্চায়েতের আলোচনা করা হয়েছে তার সাথে বর্তমান সময়ের পঞ্চায়েতের কী সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য রয়েছে?

3. কৃষিভিত্তিক সমাজে নারীর অবস্থান

বিভিন্ন সমাজেই দেখা যায় উৎপাদন ব্যবস্থায় পুরুষ এবং নারী উভয়েই নিজস্ব ভূমিকা থাকে। বর্তমান অধ্যায়ে যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেখানে পুরুষ এবং নারী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে। পুরুষ লাঙল চালিয়ে জমি চাষ করেছে, নারী করেছে বীজ বপন, পরিষ্কার করেছে আগাছা, এছাড়া ফসল কাটার সময় এলে, ফসল কাটা এবং ঝাড়াই এর কাজ ও করেছে নারী। মধ্যযুগে যখন ছোটো ছোটো গ্রামের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে তখন উদ্ভব হয় ব্যক্তি মালিকানাসত্ত্বের। তখনও উৎপাদনের প্রধান শক্তি ছিল সম্মিলিত পরিবার। স্বাভাবিকভাবেই এখানে লিঙ্গ বৈষম্যের ভিত্তিতে কাজের পার্থক্য (মহিলাদের জন্য ঘরের কাজ এবং পুরুষদের জন্য বাইরের কাজ) করা সম্ভব ছিল না। তবুও প্রকৃতিগত কারণেই নারীর কর্ম ক্ষমতাকে খাটো করে দেখানোর প্রথা বহাল ছিল। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমভারতে রজঃস্বলা নারীদের লাঙ্গাল এবং কুমোরের চাকা স্পর্শ করার অনুমতি ছিল না। এবং একইভাবে বাংলায় সে সময় মহিলারা পানের বরজে অর্থাৎ পানের বাগানে ঢুকতে পারতো না।

চরকার সূতো কাঠা, মাটির পাত্র তৈরী করার জন্য মাটি সংগ্রহ, কাঁদা মেখে দেওয়া সেলাইয়ের কাজে নারীদের উপর নির্ভরতা একান্ত অপরিহার্য ছিল। এ ধরনের পেশাদারী কাজের বাণিজ্যিকীকরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর উপর নির্ভরতা বাড়তে থাকে। কৃষিজীবি পুরুষদের সঙ্গে নারীরা শুধুমাত্র মাঠে গিয়েই কাজ করত, এমন নয়– তাদের নিয়োগকর্তার বাড়িতে, এমনকি প্রয়োজন বাজারে গিয়েও কাজ করতে হত।

কৃষিভিত্তিক সমাজে নারীরা এ কারণেও গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন যে, তাদের সন্তানের উপরেই সমাজে শ্রমিকের যোগান আসত, তবে এই সময় পুষ্টিহীনতা, অপ্রাপ্তবয়সে মাতৃত্ব, ঘন ঘন মাতৃত্ব/গর্ভবতী হওয়া, প্রসবকালীন সময়ে দুর্ঘটনায় নারীদের মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাওয়ার প্রকৃতপক্ষে দেশে মহিলাদের সংখ্যা হ্রাস জনিত সংকট বৃদ্ধি পায়। বিবাহিত স্ত্রীলোকের অভাব দেখা দেয় এর ফলে কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন সামাজিক রীতিনীতি উত্থান ঘটে যা অভিজাতদের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতির

চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। গ্রামের অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের সময় বরপক্ষ হতে কন্যার বাবাকে মোটা পরিমাণ অর্থ মূল্য হিসেবে দিয়ে নববধুকে নিজগৃহে নিয়ে যেতে হতো। বিবাহ বিচ্ছিন্ন এবং বিধবা মহিলা উভয়ের পূর্ণবিবাহই বৈধ বলে গণ্য হত।

মহিলার সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতাকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হত যে পুরুষদের মনে মহিলাদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় কাজ করতো। সেজন্য প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রীতি অনুসারে, পরিবারের নেতৃত্বে থাকতেন একজন পুরুষ। এভাবে পরিবার এবং সম্প্রদায়ের পুরুষরা মহিলাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখতো। সন্দেহ হলেই নারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত।

পশ্চিম ভারতের রাজস্থান, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত দলিলের মধ্যে এমন অনেক দরখাস্ত পাওয়া গেছে যেখানে নারীরা পঞ্চায়েতের কাছে অন্যায়ের প্রতিবিধান তথা সুবিচার প্রার্থণা করেছেন। গৃহবধু তার স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ এনেছেন। এছাড়া, পরিবারের প্রতি, সন্তানের প্রতি অবহেলার অভিযোগও এনেছেন পরিবারের সর্বোময় কর্তার বিরুদ্ধে। এইসব অভিযুক্ত পুরুষদের অবশ্য খুব একটা শাস্তি হতো না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার এবং উচ্চ জাতির লোকদের প্রয়াসে পরিবারের ভরণ পোষনের বিষয়টি দেখা হত। বেশির ভাগ সময়ই যখন মহিলারা পঞ্চায়েতে আবেদন জানাত, তাদের নাম আবেদন পত্র থেকে বাদ দেওয়া হত ঃ আবেদনকারীকে পরিবারের পুরুষ প্রধানের মা, বোন বা স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেওয়া হত।

ভূ-স্বামী পরিবারে নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রথাও ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পাঞ্জাবে গ্রামীণ নারীরা এমন কি স্বামী প্রয়াতারও ব্যবসা বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে থাকতেন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি বিক্রয় করতে পারতেন। হিন্দু ও মুসলিম মহিলারা উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদারী পেত যা তারা বিক্রি করতে বা বন্ধক রাখতে পারত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় মহিলা জমিদার ছিল। এক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ ছিল রাজশাহীর জমিদারী, যার কতৃত্ব ছিল একজন নারীর হাতেই।

চিত্র ৪.৪ (ক)
ফতেপুর সিক্রি নির্মাণ। মহিলারা পাথর ভাঙ্গাছে

চিত্র ৪.৪ (খ)
মহিলারা বোঝা বহন করছেন পার্শ্ববতী গ্রামগুলো থেকে আসা ভিন গ্রামের মহিলারা প্রায়শই এই ধরনের নির্মাণ স্থলে কাজ করত।

➲ আলোচনা করো ঃ

তোমার রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে পুরুষ মহিলাদের অংশগ্রহণে কোনো বৈষম্য আছে কি?

4. বণাঞ্চল ও বনবাসী

4.1 গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে

গ্রামীণ ভারতে শুধুমাত্র এক অপরিবর্তনীয় অনড় কৃষিব্যবস্থা ছাড়াও আরো অনেক কিছু ছিল। উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের কৃষিক্ষেত্র বাদ দিলেও এদেশে ছিল বিশাল বনাচ্ছাদিত ভূমি। এই ভূমি ছিল গভীর জঙ্গল ও ঝোপঝাড়ে ভর্ত্তি খারবন্দি (*kharbandi*), সমগ্র পূর্বভারত, মধ্যভারত, উত্তরভারত(ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী অঞ্চলের তরাই অঞ্চল সহ) ঝাড়খন্ড, পশ্চিম উপদ্বীপ এবং দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল পর্যন্ত ছিল এর বিস্তৃত। যদিও ওই সময়ে সর্বভারতীয় স্তরে ওই সময়সীমায় ভারতবর্ষের গড় বনাঞ্চলের পরিমাণে করা অসম্ভব ছিল তবুও সমসাময়িক সূত্রের পাওয়া তথ্য থেকে অনুমান করা হয় যে দেশেরর প্রায় 40 শতাংশ অঞ্চল অরণ্য ঘেরা ছিল।

চিত্র 8.9
নীলগাই শিকাররত শাহজাহানের চিত্র (বাদশানামা হতে নেওয়া)

➲ তুমি এই চিত্রে কী দেখেছ তা বর্ণনা করো। এখানে শিকার কর্ম এবং আদর্শ রাজ্যশাসনের সংকেতকারী কিছু প্রতীক রয়েছে এগুলোকে সনাক্ত কর ?

সমসাময়িক রচনায় বনবাসীদের 'জঙ্গালী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু 'জঙ্গালী' হওয়ার অর্থ 'অসভ্য' হওয়া নয়, যদিও আজকাল এই শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সেই সময় এই শব্দটিএমন লোকদের বোঝাতে ব্যবহৃত হত যারা বনজ দ্রব্য, শিকার, জুমচাষ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। এই কাজগুলো মূলত ঋতুচক্রকে অনুসরণ করেই করা হত। উদাহরণস্বরূপ ভিলরা বসন্তকাল বনজ সম্পদ সংগহের জন্য গ্রীষ্ম মাছ ধরার জন্য, বর্ষাকাল মাছ চাষের জন্য, শরৎ এবং শীতকাল শিকার করার জন্য নির্ধারণ করেছিল। এভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থান ঘুরে বেড়ানো বনাঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল।

রাষ্ট্রের জন্য অরণ্য ছিল এক বিনাশকারী অঞ্চল, দুস্টচক্রের আশ্রয়স্থল। বাবরের আমলে দিকে ফিরে তাকালে দেখব তিনিও ভাবতেন এদেশের জঙ্গালভূমি হল বিদ্রোহী এবং রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া পরগণাবাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

4.2 বনে প্রবেশ

বিভিন্ন উপায়ে বাইরের মানুষ জঙ্গালে প্রবেশ করত। উদাহরণস্বরূপ, রাজ্যে হাতির প্রয়োজন ছিল সামরিক কারণে। বনবাসীদের উপর নির্ধারিত পেশকশ বা বনকর চুক্তি অনুযায়ী হাতি সরবরাহ করা হত।

মুঘল রাজনৈতিক মতাদর্শে শিকার অভিযান ছিল এমন এক অভিনব ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সম্রাট তাঁর ধনী ও দরিদ্র প্রজাদের সঙ্গো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতো। সম্রাটের দরবারের ইতিহাসবিদদের মতে, নিয়মিত শিকার অভিযানের মাধ্যমে সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভ্রমণ করতেন এবং বিভিন্ন এলাকার মানুষের সমস্যা ও অভিযোগগুলির প্রতি ব্যক্তিগতভাবে মনোনিবেশ করতেন। দরবারের শিল্পীরা প্রায়শই শিকারের চিত্র অঙ্কন করতেন। তাদের শিল্পকর্মে সমকালীন শাসনব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠে।

‘পরগণা’ ছিল মুঘল প্রদেশের এক প্রশাসনিক মহকুমা

‘পেনশন’ ছিল মুঘল সরকারের এক প্রকার প্রাপ্য রাজস্ব।

উৎস 3

কৃষি ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য বন পরিষ্কার করা

ষোড়শ শতকের বাংলার কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডিমঙ্গাল কাব্যে বর্ণনা আছে কি ভাবে কালকেতু বনকেটে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। কবিতার একটি অংশ

মহাবীর কাটে বন গুলো বেরুনিঞা জন
আইসে তারা দেশে দেশে হইতে
কাঠদা কুঠারি বাসী টাঙ্গী কিনে রাশি রাশি
কিনে বীর সভাকারে দিতে।
উত্তরদেশের জন নামে আইসে দামুগণ
শতেক জনের আগুয়ান
বেরুনিঞা দেখিবীর মনে বড় সুস্থির
জনে জনে দিল গুয়া পান।
তেজিয়া দক্ষিণ দিশা আইল জন নামে ভাসা
পঞ্চদশ জনের অধিকারী
আশ্বামিয়া মহাবীর সব জনে করি স্থির
দেখে বীর জন সারি সারি
পশ্চিমের বেরুনিঞা আইল দফর মীঞা
সঙ্গো জন দুই হাজার
জোড় করি দুই কর জপে পির পেগম্বর
বন কাটী বসায় বাজার।
ভোজন করিআ জন প্রবেশ করিল বন
সহস্র বেরুনিঞা জন
বন কাটে দিআ গাড়া পাইআ বেরুনিঞার সাড়া
ধায় বাঘা করিআ করুণ।

➲ এ অংশে বনে কী ধরনের অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? এ বাক্যাংশের অন্তনিহিত বার্তার সঙ্গো 8.9 নম্বর চিত্রে বার্তার তুলনা কর। এখানে বনের ভেতর আগন্তুক হিসেবে কাদের চিহ্নিত করা যেতে পারে?

উৎস 4

পার্বত্য জনজাতি এবং সমতলবাসীদের মধ্যে বাণিজ্য (আনুমানিক 1595 খ্রিষ্টাব্দে)

অবধ (অযোধ্যা) সুবার (বর্তমান উত্তর প্রদেশের অংশ) সমতলবাসী এবং পার্বত্য জনজাতির মধ্যে লেনদেনের ব্যাপারে আবুলফজল লিখেছেন :

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে পণ্য মানুষের কাঁধে করে এবং ঘোড়ার ও ছাগলের পিঠে চাপিয়ে আনা হত, যেমন —সোনা, তামা, সীসা, কস্তুরী, চমরী গাইয়ের লেজ, মধু, চুক (কমলা এবং লেবুর রস মিশিয়ে সিদ্ধ করে তৈরী করা এক ধরনের অম্ল), বেদানার বীজ, আদা, লম্বালম্বা মরিচ, মজিদ (একটি গাছ, যা থেকে লাল রঙ উৎপন্ন হয়), শিকড়, সোহাগা, জেদয়ারী (হলুদের মত একটি গাছ), মোম, পশমের জিনিস, কাঠের তৈরী জিনিস, চিল, বাজপাখী, কালো বাজপাখী, মার্লিন (এক ধরনের পাখী) এবং অন্যান্য জিনিসপত্র। বিনিময়ে তারা সাদা এবং রঙিন কাপড় অ্যাম্বার (এক ধরনের হলুদ ধাতু যার দ্বারা গয়না তৈরী করা হত) লবণ, হিঙ, অলঙ্কার, কাঁচ এবং মাটির তৈরী বাসনপত্র প্রভৃতি নিয়ে যেত।

➲ এই অনুচ্ছেদে কোন কোন পরিবহনের মাধ্যমের উল্লেখ করা হয়েছে? এগুলি কেন ব্যবহৃত হত বলে তোমার মনে হয়? সমতল এলাকা থেকে যে সমস্ত সামগ্রী পাহাড়ী অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হত–সেগুলি কী কাজে ব্যবহৃত হত তা আলোচনা কর।

বাণিজ্যিক কৃষির বিস্তার, একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জনজাতিদের জীবনেও এর প্রভাব পড়ে। বনজ দ্রব্য যেমন, মধু, মৌচাক থেকে মোম এবং লাক্ষার প্রচুর চাহিদা ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতের বর্হিবাণিজ্যিক পন্য সামগ্রীর মধ্যে লাক্ষা ছিল অন্যতম। বাণিজ্যিকভাবে হাতি ধরা এবং হাতির ব্যবসা শুরু হয়। লেনদেনের ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিময়ে প্রথাও প্রচলিত ছিল। কিছু কিছু জনজাতি, বিশেষ করে পাঞ্জাবের লোহানীরা ভারতও আফগানিস্থানের মধ্যে ব্যবসা করে যাচ্ছিল। একই সঙ্গে তারা পাঞ্জাবের অভ্যন্তরে গ্রাম শহরের মধ্যেও বাণিজ্যিক লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছিল।

সামাজিক কারণগুলিও বনবাসীদের জীবনে পরিবর্তন সূচিত করে। গ্রামের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতোই জনজাতি সমাজেও থাকতেন সর্দার। কালক্রমে এই জনজাতি সর্দারদের রূপান্তর ঘটেছে। জমিদারের স্তরে, কেউ কেউ আবার রাজা হয়ে উঠেছেন। এজন্য তাদের সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হয়েছে। তারা তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই সেনা সংগ্রহ করেন। এইভাবে বংশানুক্রমিকভাবেই সেনা, সেনাপ্রধানের পদগুলোর উদ্ভব হয়। সিন্ধুপ্রদেশের জনজাতিদের সৈন্যবাহিনীতে 6,000 অশ্বারোহী এবং 7,000 পদাতিক সৈন্য ছিলো। আসামে অহোম রাজাদের পাইক সৈন্য ছিলো। আসামে অহোম রাজাদের পাইক ছিল যারা জমির বিনিময়ে সামরিক সেবা দিতে বাধ্য ছিল। অহোম রাজারা বণ্যহাতি ধরাকে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার বলে ঘোষণা করতো।

চিত্র 8.10 একজন কৃষক এবং একজন শিকারী সুফিগায়কের গান শুনছে।

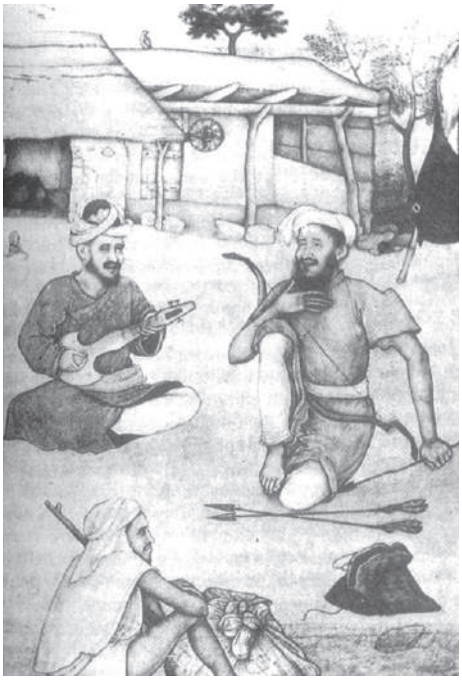

যদিও ভারতবর্ষে জনজাতি ব্যবস্থা থেকে রাজতন্ত্রে বিবর্তনে প্রকিয়া অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। তবে মনে হয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছায়। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জনজাতি অধ্যুষিত রাজ্যের উল্লেখ দেখে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। যুদ্ধ ছিল সাধারণ ঘটনা, উদাহরস্বরূপ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে কোচ রাজারা উপজাতি রাজাদের সাথে একের পর এক যুদ্ধ করে এবং তাদের নিজেদের অধীনে নিয়ে আসে।

রাজদরবারে ঐকিহাসিকরা বনাঞ্চলে নতুন সাংস্কৃতিক প্রভাবের বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন যে, নতুন বসতি এলাকার কৃষক, সম্পদায় যেভাবে ধীরে ধীরে ইসলামধর্ম গ্রহণ করছিলো তাতে সুফী সন্তরা (পীর) প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। (ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখ)।

➲ আলোচনা করো ঃ

তোমার রাজ্যে কোন কোন জায়গাকে বর্তমানে বনাঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তা খুঁজে বের করো। বর্তমানে ঐসব এলাকার জীবনযতারর কোন পরিবর্তন ঘটছে কী। এই সমস্ত পরিবর্তনগুলোর জন্য দায়ী কারণসমূহ কি এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কারনসমূহ হতে ভিন্ন ?

5. জমিদারগণ

মোগল ভারতের আমাদের কাহিনীটি কৃষি সমন্ধীয় গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত এমন এক শ্রেণীর উল্লেখ না করে সম্পূর্ণ হবে না যারা কৃষির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত কিন্তু কৃষিজাত উৎপাদন ব্যবস্থায় সরাসরি অংশগ্রহণ করত না। এরা ছিল জমিদার, যাদের নিজস্ব জমি ছিল, এবং গ্রামীণ সমাজে তাদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদার দরুণ তারা নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করত। জমিদারদের উচ্চ মর্যাদা হওয়ার পেছনে জাতকে একটি কারণ হিসাবে গন্য করা হত; অপর কারণটি ছিল তারা রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট কিছু সেবা (খিদমত) করত।

জমিদারেরা ব্যক্তিগতভাবে বিস্তীর্ণ জমির মালিক ছিল, যাকে মিল্কিয়ত (Milkiyat) বলা হয়। যার অর্থ সম্পত্তি। মিল্কিয়ত জমি জমিদারদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য চাষ করা হত এবং প্রায়ই ভাড়াটে অথবা ক্রীতদাস তুল্য শ্রমিকের সাহায্যে চাষ হত। জমিদাররা নিজের ইচ্ছামত এই জমিগুলো বিক্রি করতে পারত, কাউকে দান অথবা বন্দক দিতে পারত।

জমিদারদের ক্ষমতা এই ঘটনা থেকে ও বোঝা যায় যে প্রায়ই তারা রাজ্যের পক্ষে রাজস্ব আদায় করত। এই কাজের জন্য তারা আর্থিকভাবে প্রতিদান পেত। সামরিক শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল ক্ষমতার অন্য উৎস। অধিকাংশ জমিদারের কাছে অনেক দূর্গ (কিলাচা) ছিল, সেই সাথে সশস্ত্র বাহিনী যেখানে অশ্বারোহী, কামান বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী ছিল।

এইভাবে আমরা মোগলযুগের গ্রামাঞ্চলের সামাজিক সম্পর্কের কল্পনা, যদি একটি পিরামিড রূপে করি, তাহলে জমিদাররা এর সংকীর্ণ চূড়ায় থাকবে। আবুল ফজলের

বিবরণ ইঙ্গিত দেয় যে "উচু জাতির" ব্রাহ্মণ ও রাজপুতরা ঐক্যবদ্ধভাবে গ্রামীণ সমাজের উপর অনেক আগে থেকেই দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এতে তথাকথিত মধ্যবর্তী জাতির প্রতিনিধিত্বের প্রতিফলন ছিল, যেমনটা আমরা এর আগেও দেখেছি, পাশাপাশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উদার জমিদারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল।

সমসাময়িক দলিলগুলো এমন ধারণা দেয় যে যুদ্ধজয় সম্ভবত কিছু জমিদারির উৎপত্তির উৎস হতে পারে। একজন শক্তিশালী সামরিক আধিকারিকের দ্বারা দুর্বল লোকদের বেদখল করা প্রায়শই একটি জমিদারি বিস্তারের পন্থা ছিল। তবে আইনি নির্দেশ দ্বারা অনুমোদন প্রাপ্ত না হলে রাজ্য কখনই কোন জমিদারকে এত আগ্রাসী ভূমিকা পালন করার অনুমতি দিত না। (সনদ)

জমিদারি দৃঢ়করার মন্থর প্রক্রিয়াগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা তথ্যসূত্রে নথিভুক্ত করা আছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল নতুন উপনিবেশ স্থাপন, অধিকার হস্তান্তর, রাজকীয় নির্দেশ, সম্পত্তি ক্রয় ইত্যাদি। সম্ভবত এই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্য দিয়েই 'নীচু' জাতির লোকেরা 'জমিদার' হওয়ার সুযোগ পেত কারণ সেইসময় সম্পত্তি খুব দ্রুত কেনাবেচা হত।

সমান্তরাল সেনা!

আইন-ই-আকবরী অনুসারে মোগল ভারতে জমিদারদের সম্মিলিত সামরিক শক্তি ছিল 384,558 অশ্বরোহী, 4,277,057 পদাতিক, 1,863 হস্তিবাহিনী, 4,260 কামান এবং 4,500 নৌকা।

অনেক কারণ মিলে বংশ বা বংশভিত্তিক জমিদারিগুলিকে দৃঢ় করার সুযোগ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, রাজপুতগণ এবং জাঠরা এই কৌশলগুলো অবলম্বন করে উত্তর ভারতের বিশাল এলাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করেছিল। একইভাবে মধ্য ও দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় কৃষক-পশুপালনকারীরা (সদগোপনেদর মত) শক্তিশালী জমিদারী প্রতিষ্ঠিত করে।

জমিদাররা চাষযোগ্য জমিতে উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং কৃষিজীবীদের কৃষির জন্য সাজ সরঞ্জাম এবং আর্থিক ঋণ দিয়ে বসতি স্থাপনে সাহায্য করে, জমিদারী কেনাবেচার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে নগদীকরণ প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পায়, উপরন্তু জমিদাররা নিজের মিল্কিয়ত জমির উৎপন্ন ফসল ও বিক্রি করত। এমন প্রমান ও রয়েছে যা থেকে বোঝা যায় জমিদাররা প্রায়ই বাজার (হাট) স্থাপন করত যেখানে কৃষকরা আসত এবং তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করত।

যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জমিদাররা শোষক শ্রেণীর ছিল, তবে এটাও ঠিক যে কৃষকদের সাথে তাদের সম্পর্কের অপরিহার্য্য অংশ ছিল পারস্পরিকতাবোধ, পিতৃতন্ত্র এবং পৃষ্টপোষকতা ইত্যাদি। এই ধারনার স্বপক্ষে দুটো যুক্তি রয়েছে, প্রথমত, যেসব ভক্তিসন্ত জাতিগত এবং অন্য সবধরনের নিপীড়নের স্পষ্ট নিন্দা করেছিলেন (অধ্যায় 6 দেখো), তারা কখনই জমিদারদের (কিংবা মহাজনদের) শোষক বা অত্যাচারী

রূপে বর্ণনা করেননি। সাধারণত তাঁরা সেই রাজ্যের রাজস্ব আধিকারিকের প্রতি ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে ব্যাপক ভাবে সংগঠিত বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহে সেখানকার কৃষকসম্প্রদায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জমিদারদের সমর্থন করেছিল।

➲ আলোচনা করো ঃ

স্বাধীনতার পর ভারতের জমিদারি ব্যবস্থা লুপ্ত হয়। এই ভাগটি পড়ো এবং এর কারণগুলো সনাক্ত কর যার দরুণ এটা হয়েছিল ...।

6. ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

মোগল সাম্রাজ্যের অর্থনীতির মূলভিত্তি ছিল ভূমিরাজস্ব। এই কারণে কৃষি উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করার জন্য, একটি প্রশাসনিক পদ্ধতি তৈরী করা, এবং সাম্রাজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রাজস্ব স্থির সংগ্রহ করা অপরিহার্য্য হয়ে উঠে। দেওয়ান যার দপ্তরের উপর সাম্রাজ্যের রাজস্ব ব্যবস্থার তদারকির দায়িত্ব থাকে সেটিও এই প্রশাসনিক পদ্ধতির অন্তর্গত। এইভাবে রাজস্ব কর্মকর্তা এবং হিসাবরক্ষকগণ কৃষি জগতে প্রবেশ করে এবং কৃষি সম্পর্কিত রূপরেখা তৈরিতে এক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে।

মোগল রাজ্যে মানুষের উপর করের বোঝা নির্ধারণ করার আগে কৃষিও ভূমি এবং তার থেকে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করত। ভূমি রাজস্বের পরিকল্পনা দুটি পর্যায়ে সংগঠিত হত প্রথমে, কর নির্ধারণ এবং তারপর প্রকৃত কর আদায় করা। 'জমা' ছিল পরিমাপ করা অর্থ, অন্যদিকে 'হাসিল' হচ্ছে সংগৃহীত অর্থ। 'আমিল গুজুর' অথবা রাজস্ব আদায়কারীদের দায়িত্বের তালিকায় আকার আদেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন কৃষকদের নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করে। তাছাড়া অর্থপ্রদানের বিকল্প পথটি ও যাতে উন্মুক্ত রাখে। রাজস্ব নির্ধারণের সময় রাজ্য সর্বাধিক কর সংগ্রহের চেষ্টা করত। তবে স্থানীয় পরিস্থিতির দরুণ অনেক সময়ই বেশী পরিমাণে কর আদায় করা সম্ভব হত না।

প্রতিটি প্রদেশের কর্ষিত জমি এবং চাষযোগ্য জমি উভয়েরই পরিমাপ করা হয়েছিল। আকবরের রাজত্বকালে 'আইন-ই-আকবরী' তে এরকম ধরনের জমির মোট পরিমাপের উল্লেখ রয়েছে। তাঁর পরবর্তী সম্রাটের শাসনকালে ও জমির পরিমাপের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। উদাহরণস্বরূপ 1665 খ্রীঃ ঔরঙ্গজেব তার রাজস্ব বিভাগের আধিকারিকদের স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেন যে প্রত্যেক গ্রামের কৃষকদের সংখ্যার বার্ষিক হিসাব রাখতে হবে (উৎস-7)। তথাপি সব এলাকায় সফলভাবে জমির পরিমাপ হয়নি। যেমন– আমরা দেখেছি উপমহাদেশের বিশাল এলাকা বনে ঘেরা ছিল এবং এর ফলে এই জমিগুলোর জরিপ হয়নি।

আমিন একজন সরকারী আধিকারিক যিনি সাম্রাজ্যের আইনকানুন প্রদেশগুলিতে সুনিশ্চিতভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্বে ছিলেন।

উৎস 5

আকবরের রাজত্বে ভূমির শ্রেণীবিন্যাস

নিম্নে আইন-ই-আকবরী থেকে উদ্ধৃত শ্রেণিবিন্যাসের মাপদন্ডের একটি তালিকা রয়েছে।

সম্রাট আকবর তার গভীর দূরদর্শিতার মাধ্যমে ভূমির শ্রেণিবিন্যাস করেন প্রত্যেক শ্রেণির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাজস্ব নির্ধারণ করেন, পোলাজ হল এমন ভূমি যেখানে তারা ধারাবাহিকভাবে সব ফসলের চাষ করা হত এবং এটিকে কোনো সময় পতিত রাখা হত না। পারৌতি হল এমন ভূমি যার উর্বরাশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য কিছু দিনের জন্য চাষ বন্ধ রাখা হত। চাচর হল এমন ভূমি যা তিন চার বছর ধরে পতিত রয়েছে। বঞ্জার হল সেই ভূমি যা পাঁচবছর এবং তারও অধিক সময় ধরে অনাবাদী অবস্থায় রয়েছে। প্রথম দুই ধরনের ভূমির মধ্যে তিনটি শ্রেণি রয়েছে যথা- ভাল, মাঝারি এবং খারাপ। একত্রে সমস্ত জমিতে উৎপাদন হত এবং ৩য় শ্রেণির জমির উৎপাদন ছিল মাঝারি স্তরের, আর এই জমির উৎপাদিত এক তৃতীয়াংশ যেত রাজস্ব হিসাবে।

➲ ভূমির শ্রেণিবিন্যাসের সময় মোগল সাম্রাজ্য তার অধীন এলাকাগুলোর উপর কোন কোন নীতি অনুসরণ করত? কীভাবে রাজস্ব পরিমাপ করা হত?

মান চিত্র 1

মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার

➲ ভূমিরাজস্ব আদায় সাম্রাজ্য বিস্তারের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলেছিল বলে তুমি মনে কর?

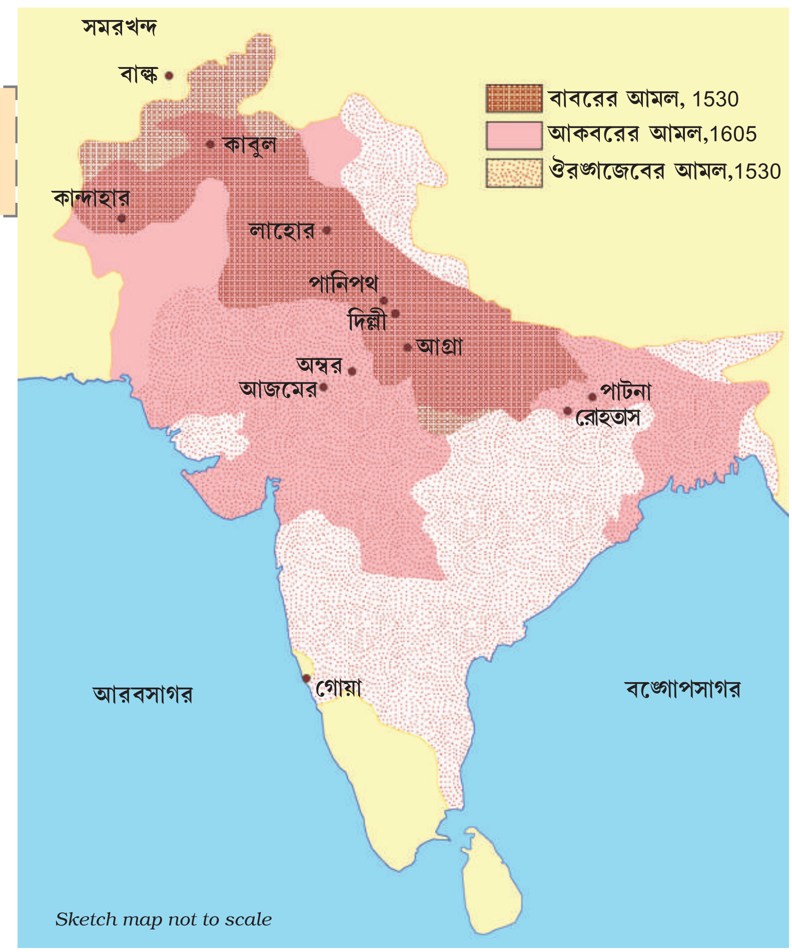

মনসবদারী প্রথা

মোগল শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে এক সমারিক তথা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে (মনসবদারী) যারা রাজ্যের বেসামরিক ও সামরিক বিষয়ের দায়িত্ব তদারকি করত। কিছু মনসবদারদের নগদ (নগদী) অর্থ প্রদান করা হত, আবার অধিকাংশ মনসবদারদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজস্ব (জায়গীর) বন্টনের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হত। তাদের পর্যায়ক্রমে স্থানান্তরিত করা হত। অধ্যায়-9 দেখো

উৎস *6*

রাজস্ব নগদে নাকি উৎপাদিত দ্রব্যে ?

ভূমিরাজস্ব আদায় সম্পর্কে আইন-ই-আকবরীতে প্রকাশিত তথ্য ঃ

আমিল-গুজারেরা রাজস্ব শুধুমাত্র নগদেই নয় উৎপাদিত দ্রব্যের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করত। পরে রাজস্ব আদায়ে অন্য পন্থা ও অবলম্বন করা হয়। প্রথমতঃ কনকুত ঃ হিন্দী ভাষায় 'কন' শব্দটি শস্যকে বোঝায়, 'কুত' শব্দের অর্থ অনুমান বা নিরূপন ...যদি কোন সংশয় দেখা দিত তবে ফসলকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হত উৎকৃষ্ট, মাঝারি এবং নিকৃষ্ট। এভাবে সংশয় দূর করা হত। অনেক সময় অনুমানের উপর ভিত্তি করে যে জমিটি উৎপাদনের জন্য গ্রহণ করা হত সেটি থেকে অপ্রত্যাশিত ফলন পাওয়া যেত। দ্বিতীয়ত, বাটাই থাকে ভাওলি ও বলা হয়। এক্ষেত্রে সকল পক্ষের উপস্থিতিতে শস্যগুলি কেটে স্তূপীকৃত করা হয় এবং চুক্তি অনুসারে ভাগ করা হত। তবে এক্ষেত্রে কয়েকজন বিচক্ষণ পরিদর্শকের প্রয়োজন হত, অন্যথায় দুস্ট বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা প্রতারণা করত। তৃতীয়ত, 'ক্ষেতবাচাই' যখন শস্যবপন করার পর তারা জমিগুলি ভাগ করে নিত। চতুর্থত, 'ল্যাংবাটাই'—ফসল কাটার পর, তারা এর স্তূপ তৈরী করত এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত এবং প্রত্যেকে নিজের অংশ ঘরে নিয়ে এর থেকে মুনাফা অর্জন করত।

➲ রাজস্ব নির্ধারণ এবং রাজস্ব আদায়ের প্রতিটি পদ্ধতি কৃষকদের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলেছিল ?

উৎস *7*

জমা

১৬৬৫ খ্রীঃ ঔরঙ্গজেব দ্বারা তার রাজস্ব আধিকারিদের দেওয়া নির্দেশনামার একটি অংশ ঃ

তিনি পরগণার সমস্ত আমিনদের নির্দেশ দেন যে তারা যেন প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক কৃষকের কৃষিকাজের বর্তমান অবস্থার নিরীক্ষণ করে এবং নিরীক্ষণ করার পর সরকারের আর্থিক লাভ এবং কৃষকদের হিতের বিষয়টি বিবেচনা করে জমা বা রাজস্ব নির্ধারণ করেন।

➲ সম্রাট কেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জমি জরিপ করার উপর জোর দিয়েছিল বলে তোমরা মনে কর ?

➲ আলোচনা করো ঃ

তোমরা কি মনে কর মোগলদের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নমনীয় ছিল ?

7. রূপার যোগান

যোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এশিয়ার সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল মোগল সাম্রাজ্য, যারা ক্ষমতা এবং সম্পদকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছিল। এশিয়ার এই সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে ছিল মিন্ড (চীন), সাফাভিদ (ইরান) এবং অটোমান (তুর্কী)। এই সমস্ত সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিতবস্থা বজায় থাকার ফলে চীন থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে স্থলবাণিজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। জলপথের আবিষ্কার ও নতুন বিশ্ব উন্মুক্ত হওয়ার ফলে ইউরোপের সাথে এশিয়ার (বিশেষ করে ভারতের) বাণিজ্যের সম্ভাবনাগুলো সম্প্রসারিত হয়। এর ফলস্বরূপ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত হয় এবং বাণিজ্য দ্রব্যের বৈচিত্র ও বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে এশিয়ার বিপুল

চিত্র 8.11
আকবর প্রবর্তিত রৌপ্য মুদ্রার উভয় পিঠ।

পরিমাণে রূপার আমদানি ঘটে এবং এর প্রধান অংশ পৌছায় ভারতে। এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে রূপা কম থাকায় এটি ভারতের জন্য আশীর্বাদ হয়। ফলস্বরূপ ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়কালে ধাতব মুদ্রার প্রাপ্যতা, বিশেষ করে ভারতে রৌপ্য মুদ্রার ক্ষেত্রে, স্থিতিস্থাপকতা লাভ করে। রৌপ্যর প্রাপ্যতার ফলে মুদ্রা উৎপাদন এবং অর্থব্যবস্থায় মুদ্রা বিনিময় উভয়ই বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি মোগল সাম্রাজ্য নগদ অর্থরাশিতে রাজস্ব আদায়ে সমর্থ হয়।

ইতালীর পর্যটক জিওভান্নি কারেরী। আনুমানিক 1690 খ্রীঃ যিনি ভারত হয়ে গিয়েছিলেন। কীভাবে রূপার বাট, সারা পৃথিবী হয়ে ভারতে এসে পৌছায় তিনি তার একটি মানচিত্র উপস্থাপন করেন। এ থেকে আমরা সপ্তদশ শতকে ভারতে নগদ অর্থ ও দ্রব্যের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছি।

চিত্র 8.12
ঔরঙ্গজেব প্রবর্তিত রৌপ্য মুদ্রা

চিত্র 8.13 ইউরোপীয় বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে বস্ত্র উৎপাদনের একটি উদাহরণ।

➲ আলোচনা করো ঃ

বর্তমানে তোমার রাজ্যে কৃষি উৎপাদনের উপর কর নির্ধারিত আছে কিনা তা অনুসন্ধান কর। বর্তমান রাজ্য সরকারের রাজস্ব নীতির সাথে মোগল রাজস্ব নীতির কি কি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা বিশ্লেষণ কর।

উৎস ৪

ভারতে রৌপ্য কিভাবে এসেছিল ?

জিওভান্নি কারেরীর বর্ণনা বার্ণিয়ারের বিবরণের ভিত্তিতে আমরা মোগল সাম্রাজ্যে প্রবেশকারী প্রভূত ধন-সম্পদ সম্পর্কে এই অংশ থেকে ধারণালাভ করতে পারি ঃ

পাঠকেরা (মোগল) সাম্রাজ্যের ধন সম্পদ সম্পর্কে কিছু ধারণা নিতে পারবেন এবং এটাও বুঝে নিতে পারবেন যে বিশ্বব্যাপী সোনা ও রূপার চলাচল শেষপর্যন্ত এই কেন্দ্রভূমিতে এসে থামে। এটা সর্বজনবিদিত যে এর অধিকাংশই আমেরিকা থেকে আসত এবং ইউরোপের অনেক বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের বিনিময়ে কিছুটা চলে যায় তুরস্কে এবং এর কিছু অংশ রেশমের বিনিময়ে স্মিরণা হয়ে পারস্যে পৌছাত। যেহেতু তুর্কীর লোকরা কফি পাত্র করা থেকে বিরত থাকতে পারে না, যা ওমান এবং আরব থেকে আসত ... এবং পারস্য, আরব ও তুর্কীরা ভারতের পণ্য ছাড়া চলতে পারে না, তাই তাদের বিপুল অর্থ চলে যায়, লোহিত সাগরের বেবেলমেন্ডেলের নিকটবর্তী মোকা; সেখান থেকে পারস্য উপসাগরের বসোরায় (বসরায়), অবশেষে এসব মুদ্রা জাহাজে করে হিন্দুস্থানে পৌছায়। ভারতীয় জাহাজ ছাড়াও ডাচ, ইংরেজ ও পর্তুগীজ জাহাজ দিয়ে প্রতিবছর হিন্দুস্থানের পণ্য পেগু, আনাসেরী (মারনমারের অংশ), সিরাম (থাইল্যান্ড) সিনান (শ্রীলঙ্কা) .... মালদ্বীপ, মোজাম্বিক এবং অন্যান্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হত এবং বিনিময়ে প্রচুর সোনা ও রূপা এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রেরণ করা হত। ডাচরা যে সব জিনিস জাপানের খনি থেকে আনয়ন করত আগে পরে তা সবই হিন্দুস্থানে চলে যেত, এবং এখান থেকে যেসব জিনিস ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যেমন ফ্রান্স, ইংল্যান্ড কিংবা পর্তুগালে যেত তা সবই নগদে ক্রয় করা হত আর এই অর্থ এই দেশেই থেকে যায়।

৪. আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'

সম্রাট আকবরের নির্দেশে আবুল ফজল দ্বারা একটি বৃহৎ ঐতিহাসিক ও প্রশাসনিক প্রকল্প ছিল 'আইন-ই-আকবরী'। আকবরের রাজত্বের বিয়াল্লিশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 1598 খ্রিঃ পাঁচবার সংস্করনের পর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আকবর দ্বারা অনুমোদিত ইতিহাস রচনার বৃহত্তর প্রকল্পের অংশ ছিল 'আইন-ই-আকবরী'। 'আকবর নামা' নামে পরিচিত এই ইতিহাসের তিনটি খন্ড রয়েছে। এর প্রথম দুটি খণ্ডে ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে। নবম অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়গুলি আর ও বিস্তারিতভাবে পড়ব। আইন-ই-আকবরী ছিল তৃতীয় খণ্ড যা সাম্রাজ্যের নিয়মকানুনের সংকলন ও মোগল প্রশাসনের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ ছিল।

মোগল রাজদরবার সম্পর্কিত তথ্য, প্রশাসন এবং সৈন্য, রাজস্বের উৎস এবং আকবরের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃতিক নকশা এবং লোকেদের সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মাচার ইত্যাদি সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন হল 'আইন-ই-আকবরী'। আকবরের আমলে সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের বিবরণ এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াও প্রদেশগুলির পরিসংখ্যান গত তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

চিত্র 8.14
আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের পান্ডুলিপি সম্রাটের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

নিয়মিতভাবে এই তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য প্রণালী ছিল। এভাবে সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথা সম্পর্কে অবহিত হতেন। 'আইন-ই-আকবরী' আমাদেরকে আকবরের আমলে মোগল সাম্রাজ্যের মূল্যবান তথ্য প্রদান করে, তবে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই গ্রন্থে বর্ণিত সমস্ত কিছুই কেন্দ্র থেকে দেখা সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি।

'আইন-ই-আকবরী' পাঁচটি খন্ডের সমাহার, যার মধ্যে ১ম তিনটি খণ্ড প্রশাসন সম্পর্কে বর্ণনা দেয়। 'মঞ্জিলআবাদি' নামে ১ম খণ্ডটি রাজপ্রাসাদ এবং এর পরিচালনা বিষয়ক তথ্য দিয়ে থাকে। দ্বিতীয় খন্ড 'সিপহ-আবাদি' সৈনিক ও নাগরিক প্রশাসন এবং রাজকর্মচারী বিষয়ক গ্রন্থ। এই খন্ডে মোগল সম্রাটের জারি করা ফরমান, রাজকীয় কর্মচারী (মনসবদার) বিদ্ধান ব্যক্তি, কবিগণ এবং শিল্পীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণীর উল্লেখ রয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড 'মুল্ক আবাদি' হল এমন একটি রচনা যেখানে সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ও রাজস্বের হারের বর্ণনার পাশাপাশি বারোটি প্রদেশের হিসাব সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে। এই বিভাগে প্রত্যেকটি সুবা পরিসংখ্যান সম্পর্কিত বিশদ তথ্য রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ভৌগোলিক, ভূ-প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়, তাদের প্রশাসনিক ও রাজকোষ সম্পর্কিত বিষয় ও জরিপকৃত এলাকা এবং রাজস্ব সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ তথ্য।

সুবা স্তরের বিস্তৃত আলোচনার পর 'আইন-ই-আকবরী' সুবার নিম্নস্তরে গঠিত সরকার সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। একটি সারণির মাধ্যমে এই তথ্য দেওয়া হয়। প্রতি সারণিতে আটটি শ্রেণি রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ (1) পরগণাত/মহল; (2) কিলা (দূর্গ); (3) আরাজী এবং জামিন-ই-পাইমুরা (জরিপকৃত অঞ্চল); (4) নগদী (নগদে রাজস্ব নির্ধারণ); (5) সুয়ুরঘাল (দান দেওয়া রাজস্ব) (6) জমিদার; 738 নং শ্রেণিতে এই জমিদারদের জাতিগত পরিচয়, পাশাপাশি তাদের সৈন্যদল অর্থাৎ অশ্বরোহী বাহিনী পদাতিক বাহিনী ও হস্তীবাহিনী এসবের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। 'মুল্ক আবাদি' খন্ডে উত্তরভারতের কৃষিভিত্তিক সমাজের অতি জটিল ও বিশদ চিত্র ফুটে উঠেছে। চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে (যা 'দফতর' নামে পরিচিত) ভারতবর্ষের ধর্মীয়, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া এই দুই খন্ডে আকবরের 'কল্যাণকর উক্তি আছে।

উৎস *9*

সৌভাগ্যে গোলাপ বাগানে জলসিঞ্চন

আবুল ফজল এই উদ্ধৃতাংশে তিনি কীভাবে এবং কার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তার একটি বিশদ বিবরণ দেন ঃ

... মোবারক পুত্র আবুল ফজলের ... উপর রাজকীয় নির্দেশ জারি হল, "আপনি দায়িত্ব নিয়ে আমাদের রাজ্যে মহিমান্বিত ঘটনাগুলোর বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন"...অবশ্যই, আমি তাঁর মহিমান্বিত কর্মের নথি এবং বিবরণ সংগ্রহের জন্য অনেক শ্রম সাধ্য গবেষণা করেছি এবং আমি দীর্ঘ সময় রাজ্যের রাজকর্মচারীগণ ও বিশিষ্ট পরিবারের পুরানো সদস্যদের তথ্যের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করেছি এবং বিবরণাদি সংগ্রহ করেছি। আমি বিচক্ষণ সত্যনিষ্ঠ বয়স্ক ব্যক্তি এবং সক্রিয় মনোভাবাপন্ন উৎসাহী কর্মক্ষম যুবকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের বিবৃত লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। রাজকীয় ফরমান জারি করা হয় যে যাদের রাজ্যসংক্রান্ত কোন কিছু জানা আছে। অতীতের কোন ঘটনা স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট তা সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে রাজদরবারে জমা দেন। (তখন) পবিত্র দরবার থেকে দ্বিতীয় ফরমান জারি হয়। যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ... তা রাজদরবারে সম্রাটের সামনে পড়ে শোনাতে হবে এবং পরে যা কিছু লিখিত তথ্য আসবে, তা যেন ঐ মহান বই এর সংযোজনীতে রাখা হয় এবং এর পরেও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে যাচাই করার পর যেসব তথ্য তখনও অসম্পূর্ণ থাকবে তা আমি পরবর্তী সময়ে সংযোজনা করব।

দৈব অধ্যাদেশ অনুসারে এই রাজকীয় আদেশগুলো পাওয়ার পর আমি আমার হৃদয়ের সব উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পেলাম, এবং এর রচনাশৈলী ও সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করেই আমার লিখনকর্ম শুরু করলাম। আমি ঐশ্বরিক যুগের ঊনিশতম বছরের শুরুতে, যখন মহামান্য সম্রাটের মহিমার অলোকিত বুদ্ধি দ্বারা তৈরি মহাফেজখানা থেকে ঘটনাপঞ্জি হাতে নিলাম এবং এর সমৃদ্ধ পৃষ্ঠাগুলো থেকে আমি অনেক ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করলাম। সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের পর থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যে সমস্ত রাজকীয় ফলমান জারি করা হয়েছে এগুলির মূল অনুলিপি বা নকল সংগ্রহ করতে আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ আমলারা রাজ্য পারিচালনায় ও বৈদেশিক রাজ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন, রাজদরবারে পেশ করেছিলেন এগুলো পেতে আমাকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনুসন্ধান এবং গবেষণার দ্বারা আমার শ্রমপাগল মন তৃপ্ত হয়েছিল। আমি অনেক উদ্যমের সহিত জ্ঞানী ও দূরদর্শী লোকদের লেখা স্মারকলিপি ও সংগ্রহ করেছি। এই উপায়ে আমি আমার সৌভাগ্যের গোলাপ বাগানে (আকবরনামা) সময়ে সময়ে জলসেচ করার জন্য একটি জলাধার তৈরি করেছি।

➲ আবুলফজল তাঁর রচনা সংকলনের জন্য যে সমস্ত তথ্যসূত্রে ব্যবহার করতেন সেগুলোর তালিকা তৈরি কর, কৃষি সমাজের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য কোন তথ্যসূত্রটি কার্য্যকরী বলে তোমার মনে হয়? তোমার মতে আকবরের সাথে তাঁর সম্পর্ক তাঁর এই রচনাকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে?

আইন-ই-আকবরীর অনুবাদ

আইন-ই-আকবরীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে বেশ কয়েকজন পন্ডিত এর অনুবাদ করেছেন। হেনরি ব্লচম্যান এটির সম্পাদনা করেন এবং ক্যালকাটার (বর্তমানে কলকাতা) এশিয়াটিক সোসাইটি, তার বিবলিওথ্যাকা ইন্ডিকার একটি খন্ডে এটিকে প্রকাশ করেছিল। বইটির তিনটির খন্ডের আবার ইংরেজী অনুবাদ ও হয়েছে। তবে হেনরি ব্লচম্যানের অনূদিত প্রথম খন্ডটি সবচেয়ে বেশী প্রামাণ্য গ্রন্থ (কলকাতা 1873)। বাকী দুটি খন্ডের অনুবাদক হলেন এইচ. এস. জেরেট। (কলকাতা 1891 এবং 1894)।

যদিও আইন-ই-আকবরীকে সম্রাট আকবর দ্বারা তার সাম্রাজ্য পরিচালনা করার সুবিধার্থে বিস্তারিত তথ্য নাথিভুক্ত করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেছিলেন। তবে এটি সরকারি দলিলপত্রের নকলের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পান্ডুলিপিটি লেখক দ্বারা পাঁচবার সংশোধন করা হয়। এতে বোঝা যায় আবুল ফজল সত্যের অনুসন্ধানে অনেক বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ মৌখিক বয়ান থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহকে বইটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে আবার বিভিন্নভাবে যাচাই করা হত। যে ঐতিহাসিকরা আইন-ই-আকবরীকে যত্নসহকারে অধ্যয়ন করেছেন, তাদের মতে এটি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটি মুক্ত নয়।

সংখ্যাতাত্ত্বিক পর্বে প্রতিটি গাণিতিক সংখ্যাকে আবার অক্ষরে লিখে দেওয়া হয়েছে যাতে পরবর্তীতে লিপিবিভ্রমের সম্ভাবনা কম হয়। এগুলো গাণিতিক ছোটখাটো ভুল অথবা প্রতিলিপি তৈরির সময় আবুল ফজলের সহায়কদের দ্বারা ভুল হতে পারে। সাধারণত এই ত্রুটিগুলো একেবারেই তুচ্ছ এবং এর ফলে মূল বিষয়ের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

আইন-ই-আকবরীর অপর একটি সীমাবদ্ধতা হল এর পরিমাণগত তথ্যের অপ্রতুলতা ও বৈষম্য। সমস্ত প্রদেশ থেকে সমানভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ অনেকগুলি সুবার জমিদারদের জাতিবিন্যাসের মাধ্যমে বিস্তৃত তথ্য গৃহীত হলেও, তবে বাংলা ও উড়িষ্যার ক্ষেত্রে এমন তথ্য নেই। উপরন্তু, সুবাগুলোর আর্থিক আস্থার তথা সংগৃহীত দ্রব্যমূল্য ও শ্রমমূল্য সমন্ধে কোন তথ্য এতে নেই।আইন-ই আকবরীতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মূল্য ও শ্রমের সম্পূর্ণ তালিকা পরিসংখ্যান আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অথবা সাম্রাজ্যের রাজধানী আগ্রাকে কেন্দ্র করে গোটা দেশের প্রামাণ্য তথ্য সীমাবদ্ধ আকারে বর্ণিত হয়েছে।

এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আইন-ই -আকবরী তৎকালীন সময়ের এক অসাধারাণ দলিল। মোগল সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রকাঠামোর মনোমুগ্ধকর চিত্র উপস্থাপন এবং ঐ সময়ের উৎপাদিত পণ্য ও জনগণ সম্পর্কে সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য পেশ করে আবুল ফজল মধ্যযুগীয় ইতিহাসবিদদের প্রচলিত রচনায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন করেছিলেন, কারণ বেশীর ভাগ ইতিহাসবিদ উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনাবলী যেমন– যুদ্ধ, বিজয়, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ উত্তারাধিকার সংক্রান্ত বিবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাদের রচনায় দেশ, এর আধিবাসী দেশের উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কিত তথ্য প্রসঙ্গাক্রমে চলে আসত এবং মূলত রাজনৈতিক ঘটনাবলী বর্ণনার অলঙ্করণ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হত।

আইন-ই-আকবরী মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভারতীয় জনগণের সার্বিক জীবন সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করেছে। গতানুগতিক ঐতিহাসিক ধারা থেকে সরে এসেছে এবং সপ্তদশ শতকের শুরুতে ভারতে অধ্যয়ণের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড গঠন করেছে। কৃষিভিত্তিক জীবনের কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানে এই গ্রন্থের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যসমূহ নিয়ে খুব একটা সন্দেহের কারণ ও দেখা যায় নি। আইন-ই-আকবরীতে সন্নিবিষ্ট কিছু নথি যেমন মোগল সাম্রাজ্যের জনগণ, তাদের পেশা ও ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্য ও সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সাম্রাজ্যের উচ্চ আধিকারিক ইত্যাদি ঐতিহাসিকদের তৎকালীন ভারতের সামাজিক কাঠামো পুনর্গঠনে সক্ষম করে।

সময় পঞ্জী
মোগল সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

1526	বাবর দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পানিপথের যুদ্ধে পরাস্ত করার পর মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।
1530-40	হুমায়ুনের রাজত্বকালের প্রথম পর্যায়
1540-55	শেরশাহ দ্বারা যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয় এবং সাফাভি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ।
1555-56	হুমায়ুন কর্তৃক লুপ্ত সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার।
1556-1605	আকবরের রাজত্বকাল
1605-27	জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল
1628-58	শাহজাহানের রাজত্বকাল।
1658-1707	ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল।
1739	নাদিরশাহ কর্তৃক ভারত আক্রমণ ও দিল্লীর লুণ্ঠন
1761	পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমেদশাহ আবদালি কর্তৃক মারাঠাদের পরাজয়।
1765	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলার 'দেওয়ানি লাভ'।
1857	ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সর্বশেষ মোগল শাসক দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের রাজ্যচ্যুতি এবং রেঙ্গুনে নির্বাসন (বর্তমান মায়ানমারের ইয়াঙ্গন)।

উত্তর দাও (100-150 শব্দের মধ্যে)

1. কৃষি অর্থনীতির ইতিহাসের তথ্যসূত্র হিসাবে 'আইন-ই -আকবরী' গ্রন্থটি ব্যবহারের সমস্যাগুলো কি? ঐতিহাসিকরা কিভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করছে?
2. ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে কৃষির উৎপাদন জীবনধারণের জন্য কতটুকু অপরিহার্য্য ছিল? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
3. কৃষির উৎপাদনে নারীদের ভূমিকা আলোচনা কর।
4. আলোচ্য ঐতিহাসিক পর্বে বাজার অর্থনীতি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল, উদাহরণসহ আলোচনা কর।
5. মোগল অর্থব্যবস্থায় ভূমি রাজস্ব ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, প্রামাণিক তথ্য সহ আলোচনা কর।

নিম্নলিখিতগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। আনুমানিক 250-300 শব্দের মধ্যে ঃ

6. কৃষিভিত্তিক সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে নির্ধারণে 'বর্ণপ্রথা' কতটা প্রভাবিত করেছিল বলে তোমরা মনে হয়?
7. ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে আরণ্যবাসীদের জীবন কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল?
8. মোগল ভারতে জমিদারদের ভূমিকার আলোচনা কর।
9. পঞ্চায়েত এবং গ্রাম প্রধানগণ গ্রামীণ সমাজকে কিভাবে পরিচালনা করত তা আলোচনা কর।

চিত্র 8.15
সপ্তদশ শতকের একটি চিত্রে প্রদর্শিত অলঙ্কার সামগ্রী।

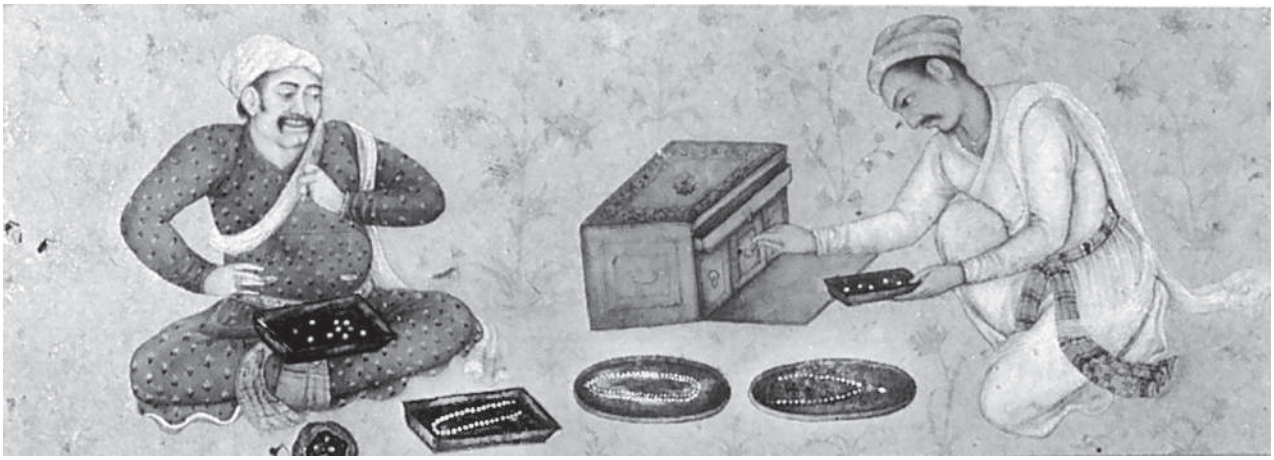

মানচিত্র কার্য

10. পৃথিবীর মানচিত্রে মোগল সাম্রাজ্যের সাথে যে সব অঞ্চলে অর্থনৈতিক যোগসূত্র ছিল সেগুলো এবং যোগাযোগের সম্ভাব্য পথগুলো চিহ্নিত কর।

প্রকল্প (যে কোন একটি)

11. একটি প্রতিবেশী গ্রাম পরিদর্শণ কর। হিসাব বের কর গ্রামে কতজন লোক বসবাস করে? কোন কোন ফসল উৎপাদিত হয়? কোন পেশার লোক বসবাস করে? অনুসন্ধান করে দেখ নারীরা জমির মালিক কিনা, স্থানীয় পঞ্চায়েত কিভাবে কাজ করে, তোমরা যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সম্পর্কে যা শিখেছো তার সাথে এই গ্রাম সম্পর্কিত তথ্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বের কর? উভয় ক্ষেত্রেই যেসব পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করেছো, সেগুলো বিবরণ দাও।

12. আইন-ই-আকবরীর একটি ছোট অংশ নির্বাচন কর (10-12 পৃষ্ঠা নিম্নে দেওয়া ওয়েবসাইটে অন লাইন উপলব্ধ)। মনোযোগ সহকারে এটি পর এবং কোন ঐতিহাসিক এটি কিভাবে কাজে লাগতে পারে সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

চিত্র 8.16
মিষ্টি বিক্রেতা একজন নারীর চিত্র

If you would like to know more, read:

Sumit Guha. 1999.
Environment and Ethnicity in India.
Cambridge University Press, Cambridge.

Irfan Habib. 1999.
The Agrarian System of Mughal India 1556-1707 (Second edition).
Oxford University Press, New Delhi.

W.H. Moreland. 1983 (rpt).
India at the Death of Akbar: An Economic Study.
Oriental, New Delhi.

Tapan Raychaudhuri and Irfan Habib (eds). 2004.
The Cambridge Economic History of India. Vol.1.
Orient Longman, New Delhi.

Dietmar Rothermund. 1993.
An Economic History of India – from Pre-colonial Times to 1991.
Routledge, London.

Sanjay Subrahmanyam (ed.).1994.
Money and the Market in India, 1100-1700.
Oxford University Press, New Delhi.

For more information, you could visit:
http://persian.packhum.org persianindex.jsp?serv= pf&file=00702053&ct=0

বিষয়বস্তু নয়

সম্রাট এবং তাঁদের ইতিহাস

মোগল দরবার (The Mughal Courts)

(ষোড়শ - সপ্তদশ শতাব্দী) (*c.* sixteenth - seventeenth centuries)

মোগল সাম্রাজ্যের শাসকরা নিজেদেরকে ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা নিযুক্ত শাসক হিসাবে দেখতেন এবং তারা একটি বৃহত্তর ও ভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপরে রাজত্ব করতেন। যদিও এই মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়শই প্রকৃত রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল, তবুও এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই দৃষ্টি ভঙ্গি সঞ্চারিত করার একটি উপায় ছিল রাজবংশের সম্রাটদের ইতিহাস রচনার মাধ্যমে। মোগল সম্রাটরা তাঁদের কৃতিত্বের বিবরণ লেখার জন্য দরবারে ইতিহাসবিদদের নিযুক্ত করেছিলেন। এইসব বিবরণগুলিতে সম্রাটের শাসনকালের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। অধিকন্তু তাদের লেখকরা উপমহাদেশের অঞ্চলগুলো থেকে শাসকদের শাসন পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য প্রচুর পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

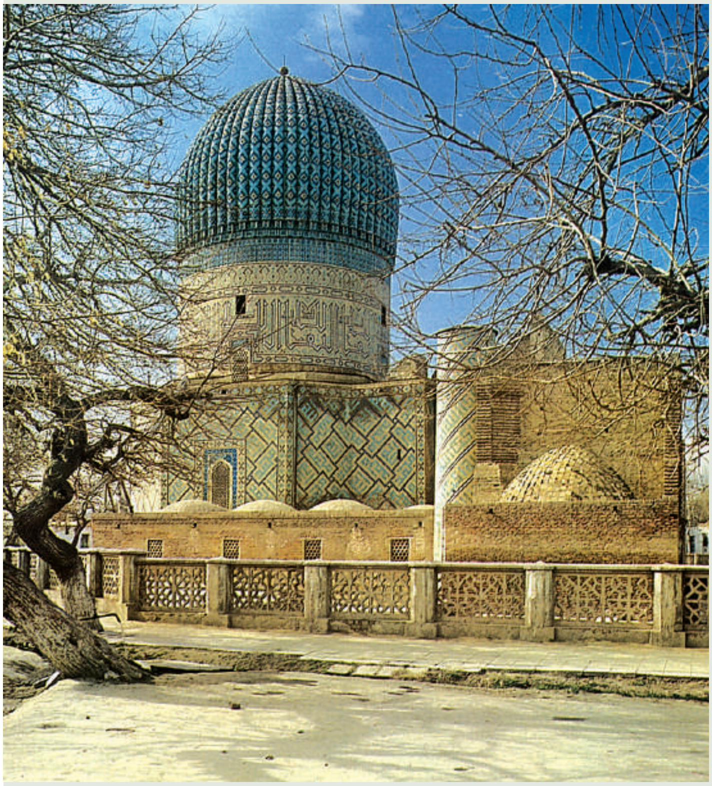

চিত্র : 9.1
সমরখন্দে তৈমুরের মাজার, 1404

ইংরেজি ভাষার আধুনিক ঐতিহাসিকরা এই পুঁথিগুলোকে ইতিহাস হিসাবে অভিহিত করেছেন। কারণ এগুলো ঘটনার ধারাবাহিক কালানুক্রমিক রেকর্ড (তথ্য) উপস্থাপন করে। মোগলদের ইতিহাস লিখতে ইচ্ছুক যে কোনও পন্ডিতদের জন্য কালক্রমের ইতিহাস একটি অপরিহার্য উৎস। এক স্তরে এই বিবরণগুলো মোগল রাজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে সত্য তথ্যের ভান্ডার ছিল। কঠোর পরিশ্রম করে এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং রাজদরবারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা এগুলো শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল। একই সাথে এই গ্রন্থগুলো সংকল্পের পরিবাহক হিসাবে অভিহিত হয়েছিল যা মোগল শাসকরা তাদের শাসিত অঞ্চলগুলোর উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেস্টা করেছিলেন। সুতরাং এগুলো, সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শ কীভাবে তৈরি ও প্রচারিত হয়েছিল, তার একটি ধারণা দেয়। এই অধ্যায়টি মোগল সাম্রাজ্যের এই সমৃদ্ধ এবং আকর্ষণীয় মাত্রার কাজগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবে।

1. মোগলরা এবং তাদের সাম্রাজ্য (The Mughals and Their Empire)

মঙ্গোল শব্দ থেকে মোগল নামের উৎপত্তি হয়েছে। যদিও আজ এই শব্দটি একটি সাম্রাজ্যের মহিমা প্রকাশ করে, তবে এটি রাজবংশের শাসকদের দ্বারা নিজেদের জন্য বেছে নেওয়া নাম নয়। পিতার দিক থেকে তারা তুরস্কের শাসক তৈমুরের বংশোদ্ভূত হিসাবে নিজেদেরকে তৈমুরিড হিসাবে অভিহিত করে ছিলেন। প্রথম মোগল শাসক বাবর তার মায়ের দিক থেকে চেঙ্গিস খানের বংশোদ্ভূত ছিলেন। বাবর তুর্কী ভাষায় কথা বলতেন এবং উপহাসের ছলে মঙ্গোলদের 'বর্বর' হিসাবে অভিহিত করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে, ইউরোপীয়রা মঙ্গোল বংশোদ্ভূত ভারতীয় শাসকদের এই পরিবারের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'মোগল' শব্দটি ব্যবহার করেছিল। বিগত শতাব্দী থেকে এই শব্দটি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমন কি রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের 'জঙ্গাল বুক' এর তরুন নায়ক মোগলি নামটি এর থেকেই উদ্ভুত হয়েছে।

মোগল এবং স্থানীয় সর্দারদের মধ্যে বিজয় এবং রাজনৈতিক জোটের মধ্য দিয়ে ভারতের বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক রাজ্য থেকে এই সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন বাবরকে যুদ্ধরত উজবেকরা তার মধ্য এশিয় জন্মভূমি ফারহানা থেকে বহিষ্কার করেছিল। তিনি প্রথমে কাবুলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারপরে 1526 সালে তার বংশের সদস্যদের সংস্থানের চাহিদা মেটাতে নতুন অঞ্চলের সন্ধানে ভারত উপমহাদেশের দিকে এগিয়ে যান।

তাঁর উত্তরসূরি নাসিরুদ্দিন হুমায়ূন (1530-40, 1555-56) সাম্রাজ্যের সীমানা প্রসারিত করেছিলেন । কিন্তু আফগান নেতা শেরশাহ সুরের কাছে হেরে যান, শেরশাহ তাঁকে সাম্রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেন। তখন হুমায়ূন ইরানের সাফাভিদ শাসকের দরবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। 1555 সালে হুমায়ুন সুরদের পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু এক বছর পরেই হুমায়ূন মারা যান।

অনেকে জালালউদ্দিন আকবরকে 1556-1605) সমস্ত মোগল সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে অভিহিত করেন। আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে সুসংহত করে এটিকে তার সময়ের বৃহত্তম শক্তিশালী এবং ধনী রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। আকবর তার সাম্রাজ্যের সীমানা হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন। তিনি তুরানের উজবেকদের এবং ইরানের সাফাভিদের সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনাগুলোর দমন করেছিলেন। জাহাঙ্গীর (1605-27), শাহজাহান (1628-58) এবং ঔরঙ্গজেব (1658-1707)-এই তিনজন আকবরের যথাযথ উত্তরসূরি ছিলেন। তবে তাদের চরিত্রের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। তাদের অধীনে আঞ্চলিক সম্প্রসারণ অব্যাহত ছিল, যদিও অনেক ধীর গতিতে । এই তিনজন শাসকই প্রশাসন পরিচালনার বিভিন্ন উপকরনগুলি বজায় রেখেছিলেন এবং একীভূত করেছিলেন।

চিত্র : 9.3
হুমায়ুনের স্ত্রী নাদিরার রাজস্থানের মরুভূমি পার হওয়ার একটি দৃশ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর চিত্রকর্ম।

➲ আলোচনা করো...

তুমি যে রাজ্যে বসবাস কর তা মোগল সাম্রাজ্যের অংশে গঠিত কিনা তা অনুসন্ধান করো। এই সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে এলাকার কোনো পরিবর্তন হয়েছিল কী? যদি তোমার রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের অংশ না হয়, তবে সমসাময়িক আঞ্চলিক শাসকদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করো–তাদের উৎপত্তি এবং নীতিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে। তারা কোন্ ধরনের নীথিপত্র সুরক্ষিত রাখত?

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর সময় একটি সাম্রাজ্য কাঠামোর প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রশাসন ও করের কার্যকর পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোগল শক্তির দৃশ্যমান কেন্দ্র ছিল দরবার। এখানে মেকি/ কৃত্রিম রাজনৈতিক আতাঁত এবং সম্পর্ক স্থাপন করা হত এবং পদমর্যাদা ও ক্রমোচ্চ শ্রেণি বিন্যাস সংজ্ঞায়িত করা হত। মোগলদের দ্বারা নির্মিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি বিভিন্ন সামরিক শক্তির সংমিশ্রন এবং উপমহাদেশে তারা যে বিভিন্ন ঐতিহ্যের সম্মুখীন হয়েছিল তা সামঞ্জস্য করার সচেতন নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল।

1707 সালে ঔরঙ্গাজেবের মৃত্যুর পর থেকে মোগল রাজ বংশের শক্তি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। পূর্বে যেখানে দিল্লী, আগ্রা বা লাহোরের মতো বিভিন্ন রাজধানী শহরগুলো থেকে সাম্রাজ্যের বিশাল প্রশাসনিক কাজকর্মগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হত, এখন সে জায়গায় আঞ্চলিক শক্তিগুলো বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন অর্জন করেছিল। তবুও প্রতীকীভাবে মোগল শাসকের মর্যাদা বোধ তার জ্যোতি হারায় নি। 1857 সালে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে ব্রিটিশরা সিংহাসন থেকে উৎখাত করেন।

2. ইতিহাস রচনা (The Production of Chronicles)

মোগল সম্রাটদের দ্বারা অনুমোদিত কালানুক্রমিক ইতিহাস হল মোগল সাম্রাজ্য ও দরবারের ইতিহাস সম্পর্কে জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যারা এই সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় এসে ছিল, তাদের সকলের কাছে এই রাজ্যকে একটি আদর্শ রাজ্য রূপে উপস্থাপন করার জন্য এগুলো রচনা করা হয়েছিল। একই সাথে তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে যারা মোগল শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তাদের অবহিত করা যে তাদের সমস্ত প্রতিরোধ ব্যর্থ হওয়ার যুক্তি সঙ্গাত কারণ ছিল। এছাড়াও, শাসকরা এটি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে তাদের উত্তরবংশের জন্য (পরবর্তী বংশের জন্য) তাদের শাসনের একটি বর্ণনা রয়েছে।

মোগল দরবারের পরিষদরাই সর্বদা মোগল ইতিহাসের লেখক—রচয়িতা ছিলেন, তারা যে ইতিহাসগুলো লিখেছিলেন সেগুলো তাদের শাসক, তাঁর পরিবার, দরবার এবং অভিজাত বর্গ, যুদ্ধ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেগুলোর উপর কেন্দ্রীভূত ছিল। এইসব ইতিহাসের শিরোনামগুলো, যেমন আকবর নামা, শাহজাহান নামা, আলমগীর নামা অর্থাৎ আকবর, শাহজাহান এবং আলমগীরের (মোগল সম্রাট ঔরঙ্গাজেবের উপাধি) কাহিনী, থেকে বোঝা যায় যে এই লেখকদের দৃষ্টিতে সাম্রাজ্য ও রাজসভার ইতিহাস এবং সম্রাটের ইতিবৃত্ত —ইতিহাস সমার্থক ছিল।

2.1 তুর্কি থেকে ফারসি (From Turkish to Persian)

মোগল দরবারের ইতিহাস ফার্সি ভাষায় লেখা হয়েছিল। দিল্লীর সুলতানদের অধীনে উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলো বিশেষত হিন্দভি ও এর আঞ্চলিক উপভাষাগুলোর পাশাপাশি ফার্সি ভাষা প্রশাসনিক এবং সাহিত্য রচনার ভাষা হিসাবে বিকাশ লাভ করে। মোগলরা

চাঘটাই তুর্কিরা চেঙ্গিজখানের জ্যেষ্ঠপুত্রের বংশোদ্ভুত ছিল।

যেহেতু মূলত চাঘটাই তুর্কি ছিল, তাই তাদের মাতৃভাষা তুর্কী ছিল। তাদের প্রথম শাসক বাবর এই ভাষায় কবিতা এবং তাঁর 'স্মৃতি কথা' রচনা করেছিলেন।

আকবরই সচেতন ভাবে ফারসীকে মোগল দরবারের শীর্ষস্থানীয় ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইরানের সাথে সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক যোগাযোগের পাশাপাশি মোগল দরবারে অবস্থানের জন্য ইরানী ও মধ্যএশিয়া অধিবাসীদের নিয়মিত প্রবাহ সম্রাটকে এই ভাষা অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ফারসীকে সাম্রাজ্যের ভাষায় উন্নীত করা হয়েছিল এবং যারা এই ভাষায় দক্ষ ছিলেন, তাদেরকে ক্ষমতা এবং সম্মান প্রদান করা হয়। রাজা, রাজপরিবার এবং আদালতে উচ্চবিত্তরা এই ভাষায় কথা বলতেন। তদ্ব্যতীত, এটি সর্বস্তরের প্রশাসনের ভাষাতে পরিনত হয়েছিল যাতে হিসাবরক্ষক, কেরানি এবং অন্যান্য কর্মীরাও এটি শিখতে পারে।

এমনকি যখন ফারসি ভাষার সরাসরি ব্যবহার প্রচলিত ছিল না, তখনও রাজস্থানি, মারাঠি এবং তামিল ভাষায় লিখিত সরকারী দলিলপত্রে ফারসির শব্দভাণ্ডার ও বাগ্‌ধারার প্রবল প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেহেতু ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ফারসী ভাষা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছিল এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কথা বলত, সেহেতু ফারসিও স্থানীয় বাগ্‌ধারাগুলো গ্রহণ করে ভারতীয় ভাষা হয়ে উঠেছিল। হিন্দাভির সাথে ফারসির পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ায় একটি নতুন ভাষা উর্দুর উদ্ভব হয় এবং এটি ছড়িয়ে পড়ে।

'আকবর নামা'র মতো মোগল ইতিহাসগুলো ফারসি ভাষায় লিখিত ছিল। অন্যান্য রচনা যেমন, বাবরের স্মৃতি কথা তুর্কী ভাষা থেকে ফারসি ভাষায় 'বাবর নামা' রূপে অনুদিত হয়। তাছাড়া মোগল শাসকরা সংস্কৃত গ্রন্থ রামায়ণ এবং মহাভারতকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করে। মহাভারতকে 'রাজ্‌মনামা' (যুদ্ধের বই) রূপে অনুবাদ করা হয়।

2.2 পাণ্ডুলিপি তৈরি (The making of manuscripts)

মোগল ভারতে সবগুলো বইই ছিল পাণ্ডুলিপি, অর্থাৎ এগুলি হাতে লেখা ছিল, পাণ্ডুলিপি তৈরির মূল কেন্দ্রস্থল ছিল রাজকীয় কিতাবখানা। যদিও কিতাবখানাকে গ্রন্থাগার হিসাবে অনুবাদ করা যেতে পারে, তবে এটি ছিলো একটি স্কিপটোরিয়াম, অর্থাৎ এমন একটি জায়গা, যেখানে সম্রাটের সংগ্রহকরা পাণ্ডুলিপিগুলি রাখা হতো এবং নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হতো।

পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কাজ সম্পাদক করত। পাণ্ডুলিপিগুলো ভাঁজ করে বই তৈরি করার জন্য কাগজ প্রস্তুত কারকদের প্রয়োজন ছিল। লেখক বা লিপিবিদ্যা শিল্পিগণ পাঠ্যটি অনুলিপি করত। চিত্র শিল্পীরা লেখকদের পাঠ্য থেকে দৃশ্যগুলিকে তুলে ধরে পৃষ্ঠাগুলোকে আলোকিত এবং চিত্রিত করত, দপ্তরিগণ পৃথক পৃথক ভাবে ভাঁজ করা কাগজগুলো সংগ্রহ করত এবং আলংকারিক প্রচ্ছদপটের মধ্যে সেগুলোকে সেট করত। সমাপ্ত পাণ্ডুলিপিকে একটি মূল্যবান বস্তু, বৌদ্ধিক সম্পদ

লিখিত শব্দের উড়ান (The flight of the written word)

আবুল ফজলের ভাষায়—

লিখিত ভাষা বিগত যুগের জ্ঞানকে মূর্ত করতে পারে এবং তা বৌদ্ধিক অগ্রগতির মাধ্যমেও হতে পারে। যারা শোনার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন এই মৌখিক ভাষা যাতে তাদের হৃদয়ে অনুভূত হয়। লিখিত ভাষা ব্যবহারকারীরা যারা নিকটে এবং দূরে, তাদের জ্ঞান দেয়। যদি লিখিত ভাষার অস্তিত্ব না থাকত, তবে কথ্য ভাষাটি শীঘ্রই হারিয়ে যেত, এবং যারা মারা গেছে তাদের কাছ থেকে কোনো কিছুই স্মারক চিহ্ন হিসাবে থাকত না, স্থূল পর্যবেক্ষকরা লিখিত ভাষাকে কেবল একটি অন্ধকার চিত্র হিসেবে দেখেন, কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে এটিকে জ্ঞানের প্রদীপ (চিরগই - শিনসই) হিসেবে দেখা হয়। লিখিত শব্দটি কালো দেখায়, যদিও এর মধ্যে হাজার রশ্মি নিহিত রয়েছে। অথবা এটি একটি তিলযুক্ত আলো যা কুদৃষ্টিকে দূরে রাখে। একটি চিঠি (খত) হল জ্ঞানের প্রতিকৃতি; একটি ধারনামূলক নকশা, দিনের শুরুতে একটি অন্ধকার আলো, একটি কালো মেঘ যা অর্থপূর্ণ জ্ঞান দেয়, নীরব, তবুও কথা বলে; ভ্রাম্যমান তবুও স্থির পৃষ্ঠার উপরে প্রসারিত তবুও উপরের দিকে উড়ে।

চিত্র : 9.3
নাস্তালিক শৈলিতে লেখা একটি ফোলিও, কাশ্মীরের মুহাম্মদ হুসেনের রচনা (1575-1605)। তিনি আকবরের দরবারে অন্যতম সেরা খোশনবিশ (ক্যালিগ্রাফার) ছিলেন যিনি বর্ণের পুরোপুরি অনুপাতযুক্ত বক্রতার স্বীকৃতি হিসাবে 'জারিন ক্বালাম' (সোনার কলম) উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। খোশনবিশ (ক্যালিগ্রাফার) পৃষ্ঠার নিচের অংশে প্রায় এক-চতুর্থাংশ স্থান গ্রহণ করে তাঁর নামটি স্বাক্ষর করেছেন।

এবং উৎকৃষ্ট কাজ হিসাবে দেখা হত। এটি এর পৃষ্ঠপোষক, মোগল সম্রাটের শক্তির উদাহরণ দিয়েছিল যিনি এ জাতীয় সৌন্দর্যকে সৃজন করতে পারেন।

একই সাথে পান্ডুলিপির প্রকৃত প্রকাশনা (লেখার) সাথে জড়িত কিছু লোক উপাধি এবং পুরস্কারের জন্য স্বীকৃত পেয়েছিল। লিপি বিশারদরা এবং চিত্রশিল্পীরা উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অবস্থান করেছিল। কিন্তু সমাজের অন্যান্যরা, যেমন কাগজ প্রস্তুত কারক বা বই বাঁধাইকারী বা দপ্তরিদের তেমন কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না।

লিপি বিদ্যা তথা হস্তাক্ষর শিল্পকে দুর্দান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হিসাবে বিবেচনা করা হতো। এটি বিভিন্ন শৈলীতে ব্যবহার করে অনুশীলন করা হত। 'নাস্তালিকা' অর্থাৎ দীর্ঘ অনুভূতিক স্ট্রোক সহ তরল শৈলী আকবরের খুব প্রিয় ছিল। টুকরো করা খাগড়া (যার অগ্রভাগ বা ডগা 5-10 মিমি মাপের) কার্বন কালিতে ডুবিয়ে এই শৈলী লেখা হয়। এইরূপ অগ্রভাগকে 'কলাম' বলা হয়। কলামের নিব সাধারণত কালি শোষনের সুবিধার্থে মাঝখান দিয়ে বিভক্ত হয়।

➲ আলোচনা করো...

বর্তমান সময়ের লিখিত বই প্রকাশনার সাথে মোগল আমলের ইতিহাসের প্রকাশনার কোন্ কোন্ দিক থেকে মিল অথবা ভিন্নতা রয়েছে বলে তুমি মনে করো?

3. আঁকা চিত্র (The Painted Image)

আমরা যেমন পূর্ববর্তী অংশে পড়েছি, চিত্রশিল্পীরাও মোগল পান্ডুলিপি তৈরির সাথে জড়িত ছিলেন। মোগল সম্রাটদের রাজত্বের ঘটনা বর্ণনা করার ইতিহাসে লিখিত পাঠ্যের পাশাপাশি চিত্রগুলো একটি ঘটনার দৃশ্যরূপকে বর্ণনা করে। যখন কোনও বইয়ের দৃশ্যাবলী বা বিষয়বস্তুর চাক্ষুষ অভিব্যক্তি দিতে হতো, তখন লেখক সংলগ্ন পৃষ্ঠাগুলোতে কিছু জায়গা রেখে দিতেন। চিত্র শিল্পীদের দ্বারা পৃথকভাবে অঙ্কিত দৃশ্যগুলো যা লেখকদের বর্ণনাকে আরো ফুটিয়ে তুলত, সেগুলোকে পৃষ্ঠার ওইসব ফাঁকা জায়গায় সন্নিবিষ্ঠ করা হত। এই চিত্রগুলো ছোটোখাটো ছিল এবং তাই পান্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলো দেখা এবং বাঁধাই করার জন্য সহজই হস্তান্তরিত করা যেতে পারে।

চিত্রগুলো কেবল একটি বইয়ের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যই পরিবেশন করা হত না। রাজ্য এবং রাজাদের শক্তি সম্পর্কিত ধারণা প্রকাশ করতে এই চিত্রকর্মগুলো ব্যবহার করা হতো, কারণ এটা বিশ্বাস করা হয় যে ' বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন' ওই চিত্রগুলো রাজ্য ও রাজাদের যেভাবে বর্ণনা করতে পারত, তেমনভাবে লিখিত মাধ্যমটি তা প্রকাশ করতে পারত না। ইতিহাসবিদ আবুল ফজল চিত্রশিল্পকে 'ঐন্দ্রজালিক শিল্প' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে এটি নির্জীব বস্তুকে এমনভাবে দেখানোর ক্ষমতা রাখে যেন তারা জীবন ধারন করে।

সম্রাট, তাঁর রাজদরবার এবং সভাসদরা ছিল এমন চিত্রিত চিত্রকর্মগুলোর বিষয়বস্তু। এটিই শাসক এবং মুসলিম গোঁড়ামির প্রতিনিধি অর্থাৎ উলেমাদের মধ্যে ক্রমাগত উত্তেজনার কারণ। উলেমারা দৃঢ়ভাবে দাবি করেন যে চিত্রকর্মে মানুষের প্রকৃত বা স্বাভাবিক রূপদান সম্পর্কে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যা 'কোরান শরিফ' ও 'হাদিস' —এ দেওয়া আছে। নবী/ধর্মপ্রবক্তা মহম্মদের জীবনের একটি ঘটনা থেকে এই নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জানা যায় । এখানে নবীকে (বলা হয় যে) জীবিত প্রাণীদের চিত্রকে প্রাকৃতিক উপায়ে চিত্রিত করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কারণ এটা বোঝার যে শিল্পী সৃষ্টির শক্তিকে নিজের মতো করে দেখাতে চাইছেন। বাস্তুবে, এটি এমন একটি কাজ/ অনুষ্ঠান ছিল যা একমাত্র ঈশ্বরই করতে সক্ষম ছিলেন।

চিত্র 9.4
মোগলদের একটি কিতাবখানা

➲ এই ক্ষুদ্রাকৃতিতে চিত্রিত মোগল পান্ডুলিপি তৈরির সাথে জড়িত বিভিন্ন কাজগুলো চিহ্নিত করো।

উৎস 1

তাসবিরের প্রশংসায়

আবুল ফজল চিত্রকলা শিল্পকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে ধারন করেছিলেন ঃ

যে কোন কিছুর সদৃশ আঁকাকে তাসবির বলে। মহামতি প্রভু তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই এই শিল্পের প্রতি একটি দুর্দান্ত অনুরাগ দেখিয়েছেন। এবং এটিকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ দান করেছেন। যেহেতু তিনি এটিকে অধ্যায়ন এবং পরিতোষ উভয়ের মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন। খুব বড় সংখ্যক চিত্রশিল্পীরা কাজ করতে প্রস্তুত হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে, রাজকর্মী, কর্মশালার বেশ কয়েকজন তত্ত্বাবধায়ক এবং কেরানী সম্রাটের সামনে প্রতিটি শিল্পীর দ্বারা সম্পাদিত কাজ জমা দেয় এবং মহামান্য সম্রাট একটি পুরস্কার প্রদান করেন এবং তাদের কাজের মান অনুযায়ী শিল্পীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের এখন খোঁজা হোক বিহজাদের যোগ্য শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্মটি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করা ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের বিস্ময়কর চিত্র কর্মের পাশে রাখা হোক। বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, নিখুঁত সমাপ্তি এবং সাহসিক সম্পাদনা এবং চিত্রকর্মে দেখা দেয়, যা অতুলনীয়; এমন কি নির্জীব বস্তু গুলোকে দেখলে মনে হয় তাদের মধ্যে প্রাণ আছে। শতাধিক চিত্র শিল্পী শিল্পের বিখ্যাত বিশারদ হয়ে উঠেছে। এটি বিশেষত হিন্দু শিল্পীদের ক্ষেত্রে সত্য ছিল। তাদের চিত্রগুলো আমাদের ধারণাগুলোকে ছাড়িয়ে যায়। গোটা বিশ্বে তাদের সমতুল্য খুব কমই পাওয়া যায়।

➲ আবুল ফজল চিত্রকলার শিল্পকে কেন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছিলেন? কীভাবে তিনি এই শিল্পকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন?

তবুও সময়ের সাথে সাথে শরিয়তের ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন সমাজিক দল দ্বারা ইসলামী ঐতিহ্যের মূল কাঠামোটি বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। প্রায়শই প্রতিটি গোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যের এমন একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করত যা তাদের রাজনৈতিক চাহিদা বা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হতো। বহু এশিয় অঞ্চলে মুসলিম শাসকরা শত শত বছর ধরে সাম্রাজ্য নির্মাণের সময় শিল্পীদের নিয়মিত তাঁদের প্রতিকৃতি এবং রাজ্যগুলোর জীবন ধারার চিত্র আঁকার অনুমতি দিয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, ইরানের সাফাভিদ রাজারা সেইসব শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, যারা রাজদরবারে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত করেছিলেন। চিত্রশিল্পীদের নাম যেমন বিহজাদ এর নাম, সাফভিদ দরবারের সাংস্কৃতিক খ্যাতিকে সুদূর প্রসারিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

ইরান থেকেও শিল্পীরা মোগল ভারতে যাত্রা করেছিলেন। সম্রাট হুমায়ুনের সাথে দিল্লীতে থাকার জন্য কিছু চিত্রশিল্পীকে মোগল দরবারে আনা হয়েছিল। যেমন মীর সাইয়িদ আলী ও আবদুস সামাদ। অন্যরা পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রতিপত্তি জয়ের সুযোগের সন্ধানে অন্যত্র পাড়ি জমান। মোগল দরবারে সম্রাট এবং গোঁড়া মুসলমান মুখপাত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ ছিল জীবজন্তুদের দৃশ্যমান উপস্থাপনার প্রশ্ন। আকবরের রাজসভার ঐতিহাসিক আবুল ফজল উদাহরণ হিসাবে সম্রাটের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, "চিত্র শিল্পকে ঘৃণা করে এমন অনেকে রয়েছেন তবে এই জাতীয় পুরুষদের আমি পছন্দ করি না। আমার কাছে মনে হয় যে একজন শিল্পীর ঈশ্বরকে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি অনন্য উপায় রয়েছে তবে তাকে অনুভব করতে হবে যে ঈশ্বর ভিন্ন তিনি নিজের কাজকে জীবন দান করতে পারবেন না .....।"

➲ আলোচনা করো...

আবুল ফজল (উৎস- 1) এর উপস্থাপনার সাথে সাহিত্যিক ও শৈলিক প্রযোজনার চিত্রকরের উপস্থাপনা (চিত্র 9.4) তুলনা করো।

4. আকবর নামা এবং বাদশাহ নামা (The *Akbar Nama* and the *Badshah Nama*)

মোগল রাজবংশের ইতিহাসগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সুপরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস হল 'আকবর নামা' এবং 'বাদশাহ নামা'। প্রতিটি পান্ডুলিপিতে লড়াই, অবরোধ, শিকার ভবন নির্মাণ, রাজদরবারের দৃশ্য ইত্যাদির গড়ে 150 টি পূর্ণ দৈর্ঘ অথবা জোড়া পৃষ্ঠায় আঁকা ছিল।

আকবর নামা'র লেখক আবুল ফজল মোগল রাজধানী আগ্রাতে বড়ো হয়েছিলেন। তিনি অনর্গল আরবী, ফার্সি, গ্রীক দর্শণ এবং সুফিবাদের বইগুলো পড়তে পারতেন। অধিকন্তু, তিনি এক জবরদস্ত বিতর্ককারী এবং স্বাধীন চিন্তাবিদ ছিলেন যিনি নিয়মিত রক্ষনশীল উলামাদের মতামতের বিরোধিতা করতেন, এই গুনাবলী আকবরকে মুগ্ধ করেছিল, যিনি তাঁর নীতিগুলো উপদেস্টা এবং মুখপাত্র হিসাবে আবুল ফজলকে আদর্শগত ভাবে উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। সম্রাটের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল

রাষ্ট্রকে ধর্মীয় গোঁড়ামির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা। রাজদরবারের ঐতিহাসিকের ভূমিকায় আবুল ফজল আকবরের রাজত্বের সাথে জড়িত ধারণাগুলোকে অভিব্যজ ও রুপদান করেছেন।

1589 সালে শুরু করে, আবুল ফজল তেরো বছর ধরে 'আকবর নামা' নিয়ে কাজ করেছিলেন; তিনি বারবার খসড়াটি সংশোধন করেছিলেন। সরকারি নথিপত্র এবং জ্ঞানী ব্যক্তির মৌখিক সাক্ষ্যদান সহ বিভিন্ন সূত্রের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জীর প্রকৃত রেকর্ড (ওয়াকাই) তৈরি করা হয়েছে।

আকবর নামাকে তিনটি বইয়ে বিভক্ত করা হয়েছে, যার প্রথম দুটি কালানুক্রমিক ইতিহাস। তৃতীয় বইটি হলো 'আইন-ই-আকবরী'। প্রথম খন্ডে আদম থেকে শুরু করে আকবরের জীবনের (30 বৎসরের) এক আকাশচুম্বী মানবজাতির ইতিহাস রয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডটি আকবরের রাজত্বের 46 তম (1601) বছরে সমাপ্ত হয়। পরের বছর আবুল ফজল রাজকুমার সেলিমের ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং তার সহযোগী বীর সিং বুন্দেলা তাঁকে হত্যা করে।

আকবরের রাজত্বের ঐতিহ্য এবং বিশদ বর্ণনা দেওয়ার জন্য আকবর নামাটি রচিত হয়েছিল। এখানে রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ সময় জুড়ে হওয়া ঘটনাবলীর পাশাপাশি আকবরের সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক, সামাজিক, প্রশাসনিক এবং সংস্কৃতিক ঘটনাবলীও যুক্ত হয়েছে– তবে এগুলোর মধ্যে কোনো কালানুক্রমিকতার উল্লেখ নেই। আইন-ই-আকবরীতে মোগল সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন ধর্ম যেমন হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ এবং মুসলমান এবং একীভূত সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত বৈচিত্রময় জনগোষ্ঠী হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আবুল ফজল এমন একটি ভাষায় বই লিখেছিলেন যা অলঙ্কৃত করা ছিল এবং রচনা ও ছন্দকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন কারণ পাঠগুলো প্রায়শই উচ্চস্বরে পড়া হতো। রাজদরবারে এই ইন্দোপার্সিয়ান রীতিটির পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছিল এবং সেখানে প্রচুর লেখক ছিলেন যারা আবুল ফজলের মতো লিখতে চেয়েছেন।

আবুল ফজলের এক ছাত্র আবদুল হামিদ লাহোরি বাদশা নামা-র লেখক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সম্রাট শাহজাহান তাঁর প্রতিভার কথা শুনে আকবর নামার আদলে তাঁর রাজত্বকালের একটি ইতিহাস লেখার জন্য লাহোরিকে আদেশ দেন। 'বাদশা নামা' হল সরকারী ইতিহাস—এটি তিনটি খন্ডে বিভক্ত, প্রতিটি খন্ডে দশটি চন্দ্র বছরের ইতিহাস বর্ণিত রয়েছে। লাহোরি সম্রাটের শাসনের প্রথম দুই দশক নিয়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় দফতর (খন্ড) রচনা করেছিলেন (1627-47) এই খন্ডগুলো পরে শাহজাহানের উজির সাদুল্লাহ খান দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল। বার্ধক্যের দুর্বলতা লাহোরিকে তৃতীয় দশক সম্পর্কে লিখতে বাধা দেয়, যা পরে ইতিহাস বিদ ওয়ারিসের দ্বারা ধারা বিবরণীভুক্ত করা হয়েছিল।

একটি ডায়াক্রোনিক বিবরণি সময়ের সাথে হওয়া বিকাশগুলি সনাক্ত করে তবে একটি সিঙ্ক্রোনিক বিবরণ একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত বা বিন্দুতে এক বা একাধিক পরিস্থিতিকে চিত্রিত করে।

বাদশা নামা ভ্রমণ

মূল্যবান পান্ডুলিপি উপহার প্রদান মোগলদের একটি প্রতিষ্ঠিত কূটনৈতিক রীতি ছিল এর অনুকরনে, অযোধ্যার নবাব 1799 সালে রাজা তৃতীয় জর্জকে সচিত্র বাদশা নামা উপহার দিয়েছিলেন। তারপর থেকে এটি উইন্ডাসর ক্যাসলে ইংলিশ রয়্যাল কালেকশনস্ এ সংরক্ষিত রয়েছে।

1994 সালে, সংরক্ষণের কাজের জন্য বাঁধাই করা পান্ডুলিপিটি পৃথক করে নেওয়া হয়। এর ফলে এই কলাগুলো প্রদর্শণ করা সম্ভব হয়েছিল এবং 1997 সালে প্রথম বারের মতো 'বাদশাহ নামা'র চিত্রকর্মগুলো নতুন দিল্লী, লন্ডন এবং ওয়াশিংটনে প্রদর্শণীতে প্রদর্শিত হয়েছিল।

উপনিবেশিক আমলে, ব্রিটিশ প্রশাসকরা ভারতীয় ইতিহাস অধ্যায়ন শুরু করে এবং এই উপমহাদেশ সম্পর্কে জ্ঞান সংরক্ষণাগার তৈরি করে, যাতে তারা যাদেরকে শাসন করতে চেয়েছিল, তাদের সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে এবং মানুষকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারে। 1784 সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। এই সোসাইটি বহু ভারতীয় পান্ডুলিপির সম্পাদনা, মুদ্রণ ও অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

'আকবর নামা' এবং 'বাদশাহ নামা'র সম্পাদিত সংস্করণগুলো এশিয়াটিক সোসাইটিই উনিশ শতকে প্রথম প্রকাশ করেছিল। বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে কয়েক বছর কঠোর পরিশ্রম করে হেনরি বিভেরিজ আকবর নামার ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন। তবে বাদশাহ নামার শুধু কিছু অংশই আজ অবধি ইংরাজীতে অনুবাদ করা হয়েছে। পুরোপুরি লেখকটি এখনও অনুবাদের অপেক্ষায়।

➲ আলোচনা করো ...

তোমার শহরে বা গ্রামে পান্ডুলিপি চিত্রিত করার ঐতিহ্য ছিল কিনা তা সন্ধান করো। কে এই পান্ডুলিপিগুলো তৈরি করেছিল ? কী বিষয়ে নিয়ে তারা নিয়ে তারা আলোচনা করেছিল ? কীভাবে এই পান্ডলিপিগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে ?

5. আদর্শ রাষ্ট্র (The Ideal Kingdom)

5.1 এক ঐশ্বরিক আলো (A divine light)

মোগল দরবারের ঐতিহাসিকরা বহু উৎস থেকে দৃষ্ঠান্ত দিয়ে এটা দেখাতে চেয়েছেন যে মোগল সম্রাটদের ক্ষমতা সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিল। তাদের বর্ণিত একটি কিংবদন্তি হল মঙ্গোল রাণী অ্যালানকোয়া যিনি তাঁর তাঁবুতে বিশ্রাম নেওয়ার সময়ে রৌদ্রের এক রশ্মির দ্বারা বিদ্ধ হয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন, যে সন্তান সন্ততি তিনি জন্ম দিয়েছেন তারা এই ঐশ্বরিক আলো বহন করেছিল এবং তা প্রজন্ম ধরে প্রজন্মন্তারে প্রেরণ হয়েছে।

আবুল ফজল মোগল রাজ্যত্বকে ঈশ্বরের কাছ থেকে আলোকসজ্জা প্রাপ্ত বস্তুর শ্রেণি বিন্যাসের সর্বোচ্চ স্থান হিসাবে স্থাপন করেছিলেন। (ফর-ই-ইজাদি)। এখানে তিনি বিখাত ইরানি সুফী শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (মৃত্যুঃ 1191) যিনি প্রথমে এই ধারনাটি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। এই ধারণা অনুসারে এমন একটি যাজকতন্ত্র ছিল, যেখানে ঐশ্বরিক আলো রাজার কাছে সঞ্চারিত হত, যিনি পরবর্তীকালে তাঁর প্রজাদের আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শণ রূপে কাজ করতেন।

ইতিহাসের বর্ণনা কারী চিত্রগুলো এই ধারণাগুলোকে এমন ভাবে প্রেরণ করে যা

আলোকিত করণের ধারণার প্ররণ

সোহরাওয়ার্দীর দর্শনের উৎস প্লেটোর, 'রিপাব্লিক' রচনায় নিহিত ছিল। যেখানে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব সূর্যের প্রতীক দ্বারা করা হয় সোহরাওয়ার্দীর লেখা ইসলামী বিশ্বে সর্বজননীনভাবে পঠিত ছিল। বিশ্ব সর্বজনীনভাবে পঠিত ছিল। সেগুলো শেখ মুবারক দ্বারা অধ্যায়ণ করা হয়েছিল, যিনি তাঁর ধারণাগুলো তাঁর পুত্র ফরাজি এবং আবুল ফজলের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। যারা তার তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন।

চিত্র 9.5
আবুল হাসান কর্তৃক আঁকা এই ছবিতে দেখানো হয়েছে যে জাহাঙ্গীর তাঁর বাবা আকবরের প্রতিকৃতি ধারনা করে ঝকঝকে পোশাক এবং গহনা পড়েছেন।
আকবর সাদা পোশাক পরিহিত, যা সুফী ঐতিহ্যে আলোকিত আত্মার সাথে সম্পর্ক নির্দেশ করে। তিনি রাজবংশের কর্তৃত্বের প্রতীকী হিসাবে একটি ভূ-গোলক পেশ করেন।
মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাটের কোন পুত্র সিংহাসন আরোহন করবেন, এ মর্মে কোনো আইন ছিল না। এর অর্থ হল প্রতিটি বংশের পরিবর্তন প্রতিযোগিতা মূলক দাবি এক ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত ছিল। আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে রাজকুমার সেলিম তঁার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁকে ক্ষমতার চ্যুত করেন ও পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীর উপাধি গ্রহণ করেন।

➲ এই চিত্রকর্মটি কীভাবে পিতা এবং পুত্রের সম্পর্কের বর্ণনা দেয়? কেন তুমি মনে করো যে মোগল শিল্পীরা প্রায়শই অন্ধকার বা স্বল্প আলোকিত পটে সম্রাটদের চিত্রিত করতেন? এই চিত্রকলার আলোর উৎসগুলি কী?

দর্শকদের মনে এক দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মোগল শিল্পীরা বর্ণবলয় বা জ্যোতি চক্র (halo) ধারণ করে সম্রাটদের চিত্রায়ণ করা শুরু করছেলিন, যা তারা ঐশ্বরিক আলোর প্রতীক হিসাবে খ্রিস্ট এবং ভার্জিন মেরির ইউরোপীয় চিত্রগুলোতে দেখে ছিল।

5.2 একটি ঐক্যবন্ধ শক্তি (A unifying force)

মোগল ইতিহাসে এই সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায় যেমন— হিন্দু, জৈন, জোরোস্ট্রিয় এবং মুসলিম নিয়ে গঠিত হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সমস্ত শান্তি ও স্থিতিশীলতার উৎসের প্রতীক হিসাবে সম্রাট, সকল ধর্মীয় এবং জাতিগত গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করেছিলেন এবং ন্যায় ও শান্তি নিশ্চিত করেছিলেন। আবুল ফজল সুলহই কুলের (পরম শান্তি) আদর্শকে আলোকিত নিয়মের ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সুলহ-ই কুলের সমস্ত ধর্ম এবং চিন্তাধারার মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল, তবে এই শর্তে যে তারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে ক্ষুন্ন করবে না বা নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে না।

সুলহ-ই কুলের আদর্শকে রাষ্ট্রের নীতিমালার মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছিল। মোগলদের অধীনে অভিজাতরা ছিল মিশ্র—ইরানী, তুরানিস, আফগান, রাজপুত, ডেকানিস সমন্বিত। তাদের প্রত্যেককেই রাজার প্রতি তার সেবা এবং আনুগত্যের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে পদ এবং পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও আকবর 1563

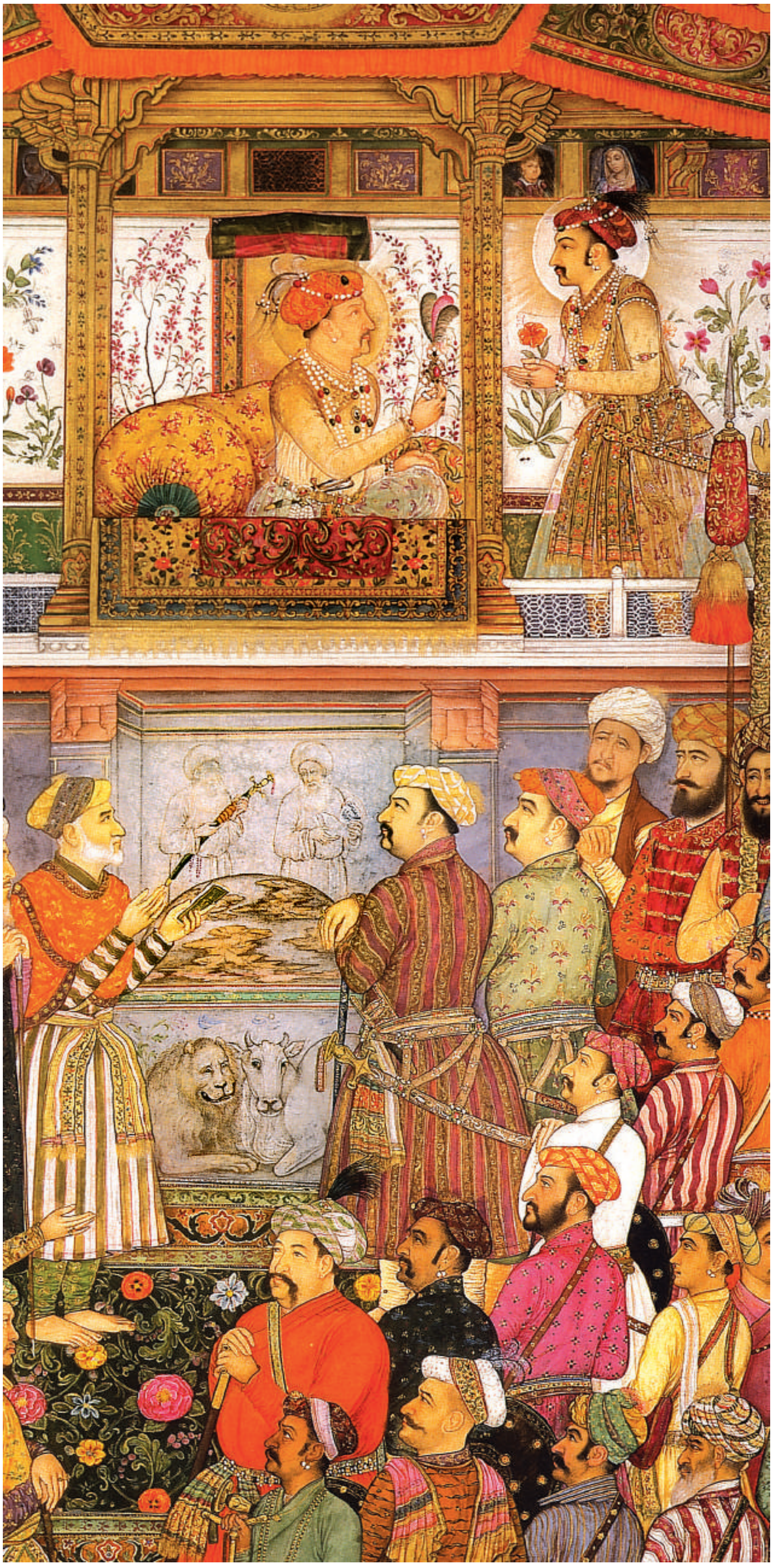

সালে তীর্থ কর এবং 1564 সালে জিজিয়া কর বাতিল করে দেন কারণ এ দুটিই ধর্মীয় বৈষম্যের ভিত্তিতে আরোপ করা হত। প্রশাসনে সুলহ-ই কুলের আদেশ অনুসরণ করার জন্য সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রেরণ করা হয়েছিল।

সমস্ত মোগল সম্রাটরা উপাসনালয় নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুদান দিয়েছিলেন। যদিও যুদ্ধের সময় মন্দিরগুলো ধ্বংস করা হয়েছিল। পরে এগুলোর মেরামতের জন্য অনুদান জারি করা হয়। শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব থেকে আমরা তা জানতে পারি। তবে পরবর্তীকালের সম্রাটদের রাজত্বকালে অ-মুসলিম প্রজাদের ক্ষেত্রে জিজিয়া কর পুণরায় আরোপিত করা হয়।

5.3 সামাজিক চুক্তি হিসাবে ন্যায় সঙ্গত সার্বভৌমত্ব (Just sovereignty as social contract)

আবুল ফজল সার্বভৌমত্বকে সামাজিক চুক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন ঃ সম্রাট তাঁর প্রজাদের চারটি বিষয়কে রক্ষা করেন, যেমন জীবন (জান), সম্পত্তি (মাল), সম্মান (নমাস) এবং বিশ্বাস (দ্বীন) এবং বিনিময়ে সম্রাট বাধ্যতা এবং সম্পদের অংশ প্রজাদের কাছে দাবি করেন। কেবলমাত্র ন্যায় পরায়ণ সার্বভৌমিকরাই ক্ষমতা এবং ঐশ্বরিক নির্দেশিকা সহ চুক্তিটি সম্মান করতে সক্ষম বলে মনে করা হয়েছিল।

চিত্র 9.6
শিল্পী পেয়াগের আঁকা (বাদশা নামা থেকে প্রাপ্ত) চিত্রে জাহাঙ্গীর রাজকুমার খুররামকে পাগড়ি রত্ন উপহার দিচ্ছেন।

চিত্র 9.7
দারিদ্রের চিত্রকে জাহাঙ্গীর গুলোবিদ্ধ করছেন, চিত্রশিল্পী আবুল হাসানের চিত্রকর্ম।
শিল্পী একটি কালো রং-এর মেঘের মধ্যে লক্ষ্যবস্তুটিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এটি বাস্তবে ব্যক্তি নয়, তবে একটি মানব রূপ যা একটি বিমূর্ত মানের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। শিল্প ও সাহিত্যে এই জাতীয় ব্যক্তিরূপদানকে রূপক হিসাবে অভিহিত করা হয়। চেইন অফ জাস্টিস অর্থাৎ ন্যায় -শৃঙ্খল স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, এমনটা দেখানো হয়েছে। জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিচারণে এভাবেই বিচারের শৃঙ্খলা বা ন্যায় শৃঙ্খলার বর্ণনা করেছেন ঃ

> আমার সম্রাট পদে যোগদানের পর আমি প্রথম যে অদেশটি দিয়েছিলাম তা ছিল বিচারের প্রশাসনে নিযুক্ত ব্যক্তিরা, যারা বিচারে চাইছেন, তাদের ক্ষেত্রে বিলম্ব বা দ্বিচারিতা করতে না পারে; নিপীড়িতরা এই শৃঙ্খলার নিকট আসতে পারে এবং এটিকে নাড়াতে পারে। যাতে এর শব্দ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। চেইনটি (শৃঙ্খলাটি) খাঁটি সোনার তৈরি, এর দৈর্ঘ্য 30 গজ এবং এর মধ্যে 60 টি ঘন্টা ছিল।

➲ ছবির প্রতীকগুলো সনাক্ত করো এবং ব্যাখ্যা করো।

ন্যায়বিচারের ধারণার চাক্ষুষ উপস্থাপনের জন্য বেশ কয়েকটি চিহ্ন তৈরি করা হয়েছিল। এই ধারণাটি মোগল রাজতন্ত্রের সর্বোচ্চ গুন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্পীদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রিয় প্রতীকগুলো মধ্যে একটি হল সেই মোটিফ বা নকশা যাতে সিংহ এবং মেষ শাবক (বা গরু) শান্তভাবে একে অপরের পাশে বাসা বেঁধেছিল। এটি এমন এক রাজ্যকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল যেখানে শক্তিশালী এবং দুর্বল দ'জনই সহাবস্থান করতে পারে। বাদশাহ নামায় চিত্রিত আদালতের দৃশ্যগুলো সম্রাট্রের সিংহাসনের নীচে একটি কুলুঙ্গিতে এই জাতিয় রূপগুলো স্থাপন করে। (চিত্র 9.6 দেখো)।

➲ আলোচনা করো ...

মোগল সাম্রাজ্যের ন্যায় বিচার কেন রাজতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ গুন হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল?

6. রাজধানী ও রাজসভা (Capitals and Courts)

6.1 রাজধানী শহর (Capital cities)

মোগল সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল এর রাজধানী শহর, যেখানে রাজদরবার গড়ে উঠেছিল। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগলদের রাজধানী শহরগুলো প্রায় স্থানীন্তরিত হতো। বাবর লোধীদের রাজধানী আগ্রা দখল করেছিলেন, যদিও তাঁর রাজত্ব কালের চার বছরে তাঁর দরবার প্রায়ই স্থানান্তরিত হয়। 1560 এর দশকে আকবর আশেপাশের অঞ্চলগুলো থেকে লাল বেলেপাথর সংগ্রহ করে আগ্রা দুর্গটি নির্মান করেছিলেন।

1570 এর দশকে তিনি ফতেপুরে সিক্রিতে একটি নতুন রাজধানী তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম কারণ হল সিক্রি আজমীরগামী রাস্তায় অবস্থিত, যেখানে শেখ মইনউদ্দিন চিশতীর দরগা ছিলএবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। মোগল সম্রাটরা চিশ্তী সিলসিলার সুফীদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। আকবর সিক্রিতে জাঁকজমক পূর্ণ জুমা মসজিদের পাশেই শেখ সেলিম চিশ্তীর জন্য একটি সাদা মার্বেল সমাধির নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন। বিশাল খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বারটি (বুলান্দ দরজা) গুজরাটে মোগল বিজয়ের কথা দর্শকদের মনে করে দেওয়ার জন্য ছিল। 1585 সালে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলকে আরও অধিক নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য রাজধানী লাহোরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং আকবর 13 বছর ধরে সমনোযোগে সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে নজরদারি করেন।

চিত্র 9.8
বুলান্দ দরওয়াজ ফতেপুর সিক্রি।

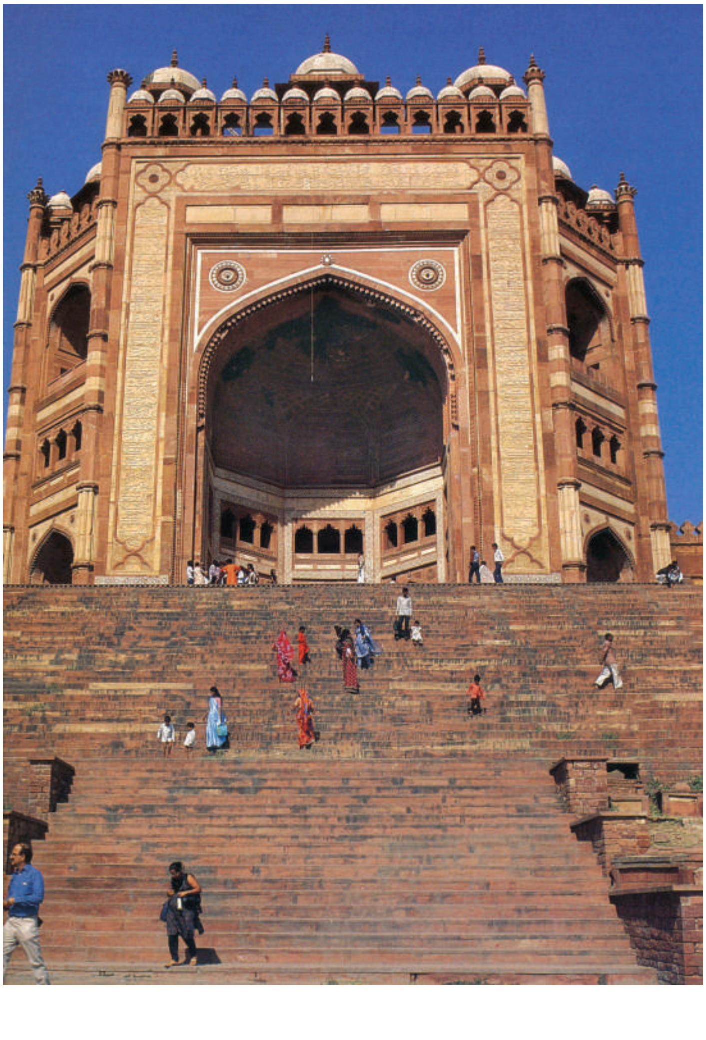

শাহ জাহান রাজকোষে যুক্তিপূর্ণ রাজস্ব নীতি অনুসৃত করেছিলেন এবং নির্মাণ শিল্পের প্রতি তার গভীর আবেগকে তৃপ্ত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থসংগ্রহ করেছিলেন। রাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে ভবন নির্মাণ কার্য, যেমন তোমরা পূর্বের শাসকদের ক্ষেত্রে দেখেছ, রাজবংশের শক্তি সম্পদ ও মর্যাদার সর্বাধিক দৃশ্যমান এবং স্পষ্ট প্রতীক ছিল। মুসলমান শাসকদের ক্ষেত্রে এটিকে ধর্মভীরুতাও মনে করা হত।

1648 সালে রাজদরবার, সেনাবাহিনী এবং পরিবার আগ্রা থেকে সদ্য নির্মিত রাজকীয় রাজধানী শাহজাহান বাদে চলে আসে। এটি ছিল পুরানো আবাসিক শহর দিল্লিতে একটি নতুন সংযোজন যে শহরে লালকেল্লা, জামে মসজিদ, বাজার (চাঁদনি চৌক) এবং অভিজাতদের জন্য প্রশস্ত বাড়িঘর সহ

বৃক্ষ রেখাযুক্ত (সারিযুক্ত) এসপ্ল্যানেত ছিল। শাহজাহানের নতুন শহরটি এক বিরাট রাজতন্ত্রের আরও আনুষ্ঠানিক দর্শনের জন্য উপযুক্ত ছিল।

6.2 মোগল দরবার (The Mughal court)

সার্বভৌম ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা মোগল দরবার ব্যবস্থা সম্রাটের পদমর্যাদাকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করত। তাই এর কেন্দ্রবিন্দু ছিল সিংহাসন। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একজন রাজা আশ্রয়দাতা বা অবলম্বন-স্তম্ভ এর ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাঁর সিংহাসন এই অ্যাক্সিস মুন্ডি বা স্তম্ভেরই পার্থিব রূপ। এক হাজার বছরের জন্য ভারতে মোগল রাজত্বের প্রতীক মোগল শামিয়ানার সার্বভৌমত্বকে সূর্যের তেজের চেয়ে আলাদা বলে মনে করা হত।

অ্যাক্সিসমুন্ডি হলো একটি লাতিন বাক্যাংশ, যার অর্থ হলো একটি স্তম্ভ বা মেরু, যা পৃথিবীর অবলম্বন হিসাবে রূপান্তরিত হয়।

ইতিহাসে মোগল অভিজাতদের মধ্যে পদ মর্যাদা নির্ধারণের বিধিগুলো অত্যন্ত নির্ভুলতার সাথে রচনা করা হয়। মোগল দরবারে কোনো পরিষদে পদ মর্যাদা রাজার সাথে তার দূরত্বের দ্বারা নির্ধারিত হত। শাসকের দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে দরবারে স্থান দেওয়ার অর্থ হলো সম্রাটের চোখে তার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল। সম্রাট সিংহাসনে বসে পরলে কাউকেই তার অবস্থান থেকে সরে যাওয়ার বা চলে যাওয়ার অনুমতি

উৎস 2

দরবার-ই-আকবরী

আবুল ফজল আকবরের দরবারে এক বিশেষ বিবরণ দেন ঃ

> যখনই মহামতি (আকবর) দরবারে যেতেন, তখনই একটি বড় ঢাক বাঁজানো হত এর ধ্বনি ঐশ্বরিক প্রশংসা সহকারে আসত। এভাবে সমস্ত শ্রেণির লোকদের জানান দেওয়া হয়। মহামান্য সম্রাটের পুত্রগণ ও নাতি-নাতনিগণ দরবারের প্রবীণরা এবং অন্যান্য সমস্ত পুরুষদের প্রবেশাধিকার রয়েছে 'কর্ণিশ' করতে নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। খ্যাতিমান এবং দক্ষতথা শিক্ষিত পুরুষরা তাদের শ্রদ্ধা জানায়, এবং ন্যায় বিচারের কর্মকর্তারা তাদের রিপোর্টি পেশ করেন। মহামান্য তাঁর সাধারণ অন্তদৃষ্টি দিয়ে আদেশ দেন এবং সন্তোষ জনক উপায় সব কিছু মীমাংশা করেন। এই সময়কালে সকল দেশের দক্ষ মল্লযোদ্ধা এবং কুস্তিগিররা নিজেকে প্রস্তুত রাখে এবং গায়ক ও গায়িকারা অপেক্ষা করতে থাকে। চতুর জাদুকররা এবং মজাদার বাজিকররা তাদের দক্ষতা এবং তৎপরতা প্রদর্শণ করতে অধির আগ্রহ দেখায়।

➲ দরবারে সংগঠিত মূল কর্মকান্ডগুলো বর্ণনা কর।

কর্নিশ এক প্রকার অনুষ্ঠানিক ভাবে অভিবাদন জানানোর প্রথা, যাতে রাজ দরবারের উপস্থিত লোকদের তাঁদের ডান হাতের তালুটি নিজেদের কপালে ঠেকিয়ে মাথা নত করতে হত। এর অর্থ ছিল যে প্রজা তার মস্তক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও মনের আসন - বিনম্রতার হাতে সঁপে রাজসভায় পেশ করবে।

চাহার তাসলিম হল অভিবাদনের একটি রূপ যা ডান হাতের পৃষ্ঠ-ভাগ মাটিতে রেখে শুরু হয় এবং এটিকে আলতো করে উত্থাপন করা হয়, যতক্ষণ না ব্যক্তি সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর সে তার হাতের তালু তার মাথার মুকুটটিতে রাখে। চারবার এই ভাবে করতে হতো। তাসলিমের আক্ষরিক অর্থ হল নমন।

শব-ই-বরাত হিজরি পঞ্জিকার অষ্টম মাসের 14 ই শ্রাবণের পূর্ণিমা রাতে প্রার্থনা এবং আসতবাজি দিয়ে উদযাপিত হয়। এটি হল সেই রাত যে রাতে আগত বছরের মুসলমানদের ভাগ্য নির্ধারিত হয় এবং তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়।

না। মোগল পরম্পরা অনুসারে রাজদরবারে গ্রহণযোগ্য সম্ভাষণ, আদব কায়দা ও অভিভাষণকে সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে দরবারের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হত। শিষ্ঠাচারের সামান্যতম লঙ্ঘন লক্ষ্য করা গেলেই ঘটনাস্থলে শাস্তি দেওয়া হত।

শাসককে অভিবাদনের ধরনগুলো শ্রেণি বিন্যাসের ব্যক্তির অবস্থান নির্দেশ করে ঃ গভীর সিজদা উচ্চতর মর্যাদার প্রতীক। নিজেকে উপস্থাপনা করার সর্বোচ্চ রূপটি ছিল সিজদা বা সম্পূর্ণ নিবেদন। শাহজাহানের অধীনে এই অনুষ্ঠানগুলো চাহার তাসলিম এবং জ্যামিন বোস (ভূমিতে চুম্বন) এর সাথে পুনর্নির্বাচিত ছিল।

মোগল দরবারে কূটনৈতিক দূত পরিচালনাকারী রীতিনীতিগুলোও সমান ভাবে লক্ষণীয় ছিল। মোগল সম্রাটের কাছে উপস্থাপিত হওয়া একজন রাষ্ট্রদূত গভীরভাবে মাথা নত করে বা মাটিতে চুম্বন দিয়ে বা অন্যথায় নিজের হাত বুকের সামনে আঁকড়ে ধরার পার্সিয়ান রীতি অনুসরণ করে সম্রাটকে অভিবাদন করতে হত। রাজা প্রথম জেমসের ইংরেজ দূত টমাস রো ইউরোপীয় রীতি অনুযায়ী জাহাঙ্গীরের সামনে কেবল প্রণাম করেছিলেন এবং চেয়ারের দাবি করে দরবারকে আরও চমকে দিয়েছিলেন।

সম্রাট সূর্যোদয়ের সময় ব্যক্তিগত ধর্মীয় অনুরাগ বা প্রার্থনা দিয়ে তাঁর দিন শুরু করতেন এবং তারপরে ঝাড়োকা অর্থাৎ পূর্ব দিকের একটি ছোট্ট বারান্দায় হাজির হতেন। নীচে, জনতার ভীড় (সৈনিক, ব্যবসায়ী, কারুশিল্পী, কৃষক, মহিলা এবং অসুস্থ শিশু) সম্রাটের দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছিল। জন বিশ্বাসের অংশ হিসাবে সাম্রাজ্যিক কর্তৃত্বের গ্রহণ যোগ্যতা বিস্তারের লক্ষ্যে আকবর দ্বারা ঝাড়োকা দর্শন প্রবর্তন করা হয়েছিল।

রত্ন সিংহাসন (The jewelled throne)

আগ্রার প্রাসাদে জন দর্শকদের হলে শাহজাহানের রত্ন সিংহাসন (তখত-ই-মুরাস্সা) এভাবেই 'বাদশাহ নামা'য় বর্ণিত হয়েছে ঃ

> এই চমৎকার সিংহাসনের কাঠামোটিতে বারো পার্শ্বযুক্ত স্তম্ভের উপরে আলম্বিত একটি চাঁদোয়া/ আচ্ছাদন রয়েছে। সিড়ির ধাপ থেকে ঝুলন্ত গম্বুজ অব্দি এর উচ্চতার পরিমাপ পাঁচ হাত ছিল। মহামহিমের (সম্রাটের) রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি 86 লক্ষ টাকার মূল্যবান রত্ন ও মূল্যবান পাথর এবং 1 লক্ষ তোলা স্বর্ণ এবং আরো 14 লক্ষ মূল্যের সোনা দিয়ে সিংহাসনটি সাজানোর আদেশ দিয়েছিলেন.....। সিংহাসনটি তৈরি করতে সাত বছর সময় লেগেছিল। আর এর উপরে খচিত মূল্যবান পাথরের মধ্যে এক লক্ষ টাকা মূল্যের পদ্মরাগমনি চুনি (ruby) ছিল যা শাহ আব্বাস সাফাডি প্রয়াত সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এবং এই চুনি পাথরে মহান সম্রাট তৈমুর সাহেব-ই কিরান, মির্জা শাহরুখ, মির্জা উলুগবেগ এবং শাহআব্বাসের নামের পাশাপাশি সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর এবং মহান সম্রাট শাহজাহানের নামও খোদাই করা ছিল।

চিত্র 9.9
শাহজাহান, যুবরাজ ঔরংজেবের বিয়ের আগে আগ্রায় তাঁকে সম্মান জানিয়েছিলেন, বাদশাহ নামায় পেয়াগের চিত্রকর্ম।

➲ সম্রাটকে সনাক্ত করো। ঔরঙ্গাজেবকে হলুদ জামা (শরীরের উপরের অংশের পোশাক) এবং ছোট পুষ্পযুক্ত সবুজ জ্যাকেট পরিহিত দেখানো হয়েছে। তাকে কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে এবং তার বাবার প্রতি তার অঙ্গাভঙ্গি কী বোঝায়। দরবারীদের কীভাবে দেখানো হয়েছে? তুমি কী বাম দিকে বড় পাগড়িযুক্ত চিত্রগুলো শনাক্ত করতে পারবে? এগুলি হল পন্ডিতদের চিত্র।

ঝাড়োকায় এক ঘন্টা সময় কাটানোর পরে সম্রাট তার সরকারের প্রাথমিক ব্যবসা পরিচালনার জন্য দর্শকের জনদরবারে (দেওয়ান-ই-আম) হেঁটে যেতেন। রাজ্য কর্মকর্তারা প্রতিবেদন উপস্থাপন করতেন এবং বিভিন্ন আবেদন নিয়ে আসতেন। দুই ঘন্টা পরে, সম্রাট ব্যক্তিগত দর্শকদের কাছে গোপনীয় বিষয়ে আলোচনার জন্য দিওয়ান-ই-খাসে যেতেন। রাজ্যের উচ্চ পদস্থ মন্ত্রিরা তাদের আবেদনগুলো তাঁর সামনে রাখতেন এবং রাজস্ব কর্মকর্তারা তাদের হিসাবগুলো উপস্থাপন করতেন। মাঝে মাঝে, সম্রাট অত্যন্ত খ্যাতিমান শিল্পীদের কাজ বা স্থপতিদের (মিমার) ভবন নির্মাণ পরিকল্পনা দেখতেন।

সিংহাসন আরোহণের বার্ষিকী, ঈদ, শাব-ই-বরাত এবং হোলির মতো বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোতে দরবারটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। দামি মোমদানিতে রাখা সুগন্ধি মোমবাতি এবং প্রাসাদ প্রাচীরগুলোতে ঝুলানো রঙিন শিল্পকর্ম দর্শনার্থীদের উপর এক দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছিলে। মোগল সম্রাটগণ বছরে তিনটি বড়ো উৎসব পালন করতেন।

চিত্র 9.10
জাশন-ই-ওয়াজান বা তুলা দান নামে একটি অনুষ্ঠানে প্রিন্স খুররমকে মূল্যবান ধাতুতে ওজন করা হচ্ছে (জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা থেকে নেওয়া)।

চিত্র 9.11a

দারা সিকোর বিবাহ অনুষ্ঠান

চিত্র 9.11b

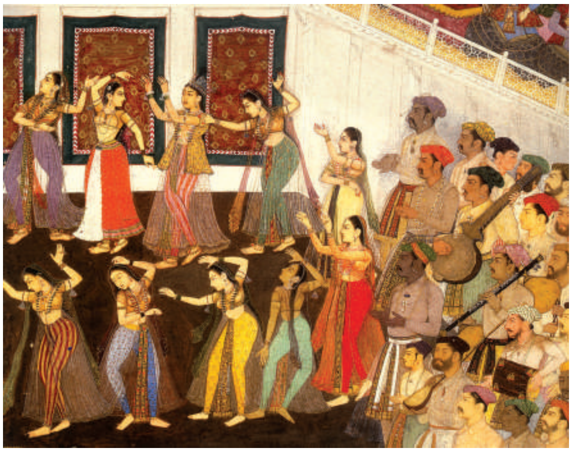

চিত্র 9.11c

মোগল রাজপরিবারের বিবাহ অনুষ্ঠানগুলো খুব জাঁকজমকভাবে হতো। 1633 সালে রাজপুত্র পারভেজের কন্যা নাদিরার সাথে দারা শিকোর বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন রাজকন্যা। জাহানারা এবং সতী উন নিসা খানুম, যিনি প্রয়াত সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের প্রধান দাসী ছিলেন। দেওয়ান-ই-আম-এ বিবাহে অনুষ্ঠানে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিকেলে সম্রাট এবং হারেমের মহিলারা সেখানে যান এবং সন্ধ্যায় অভিজাতদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল। কনের মা একইভাবে একই সভাগৃহে তার উপহারগুলো সাজিয়ে ছিলেন এবং শাহজাহান সেগুলো দেখতে যান। দিওয়ান-ই-খাসে হিনাবন্দি (মেহেদী রঞ্জক প্রয়োগ) অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দরবারের পরিচারকদের মধ্যে তাম্বুল (পান), এলাচ এবং শুকনো ফল বিতরণ করা হয়। বিবাহের মোট ব্যয় হয়েছিল 32 লক্ষ টাকা, এর মধ্যে ছয় লক্ষ টাকা রাজকীয় কোষাগার থেকে দেওয়া হয়েছিল, জাহানারা কর্তৃক 16 লক্ষ টাকা (মমতাজ দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণ সহ) এবং বাকি টাকা কনের মা ব্যয় করেছিলেন। বাদশাহ নামার এই চিত্রগুলোতে এই অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত কিছু ক্রিয়াকলাপ চিত্রিত করা হয়েছে।

➲ ছবিতে তুমি কী দেখেছ তা বর্ণনা করো।

রাজার সৌর এবং চন্দ্র জন্মদিন এবং বসন্তকালিন বিষুবস্থায় ইরানি নববর্ষ যার নাম নওরোজ। রাজার জন্মদিনে, বিভিন্ন পন্যাদির সমান তার ওজন করা হত যার সমপরিমাণ অর্থ সেরাকেন্দ্রে দান করা হত।

6.3 উপাধি এবং উপহার (Titles and gifts)

মোগল সম্রাটরা তাদের রাজ্যাভিষেকের সময় বা কোনও শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ের পরে মহান উপাধিগুলো গ্রহণ করতেন। অনুদানশীল এবং ছন্দময় এই উপাধিগুলো যখন নাবিক দ্বারা ঘোষিত হত, তখন দর্শকদের মধ্যে বিস্ময়ের পরিবেশ তৈরি করত। মোগল মুদ্রাগুলি নিয়মিত প্রোটোকল সহ শাসক সম্রাটের পুরো উপাধি বহন করে।

মেধাবী পুরুষদের উপাধি প্রদান মোগল রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। রাজদরবারের শ্রেণি বিন্যাস কোনো ব্যক্তির অবস্থান তার প্রাপ্ত বা গৃহিতা উপাধি থেকেই বোঝা যেতে পারে। রাজদরবারে সর্বোচ্চ পদে আসীন মন্ত্রীর জন্য প্রদত্ত আসফ খান উপাধিটি নবী রাজা সুলাইমানের (সোলোমোন) কিংবদন্তী মন্ত্রী আসফের নামে রাখা হয়েছে। মির্জা রাজা উপাধিটি ঔরঙ্গজেব সর্বোচ্চ পদে আসীন তাঁর অভিজাতদ্বয়, জয় সিংহ ও যশবন্ত সিংহকে দিয়েছিলেন। উপাধি অর্জনের জন্য অর্থ প্রদান করা যেতে পারে। মীর খান ঔরঙ্গজেবকে আলিফ উপাধি দেওয়ার জন্য একলক্ষ টাকা প্রদান করেছিলেন। পরে এটি 'এ' নামে তাঁর নামের সাথে যুক্ত হয়ে 'আমীরখান' হয়েছে।

অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে সম্মানের পোশাক (খিলাত) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি এমন একটি পোশাক যা একদা সম্রাট দ্বারা পরিধান করা হয়েছিল। এবং তাঁর আর্শীর্বচন দ্বারা সিক্ত করা ছিল। একটি উপহার ছিল সরপা ('মাথা থেকে পা অব্দি')। এটি একটি জামা, একটি পাগড়ি এবং একটি উত্তরীয় (পাইকা) সমন্বয়ে গঠিত ছিল। সম্রাট প্রায়ই জহরত অলংকারগুলো উপহার হিসাবে দিতেন। পদ্মফুলের রত্ন খচিত সেটটি (পদ্ম মুরসা) কেবল ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে উপহার দেওয়া হত।

কোনও পারিষদ কখনও খালি হাতে সম্রাটের কাছে যেত না ঃ তিনি স্বল্প পরিমাণে অর্থ (নাজর) বা বিপুল পরিমাণে অর্থ (পেশকশ) প্রদান করতেন। কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপহারকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চিহ্ন হিসাবে বিবেচনা করা হত। রাষ্ট্রদূতরা রাজনৈতিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করতেন। এই জাতীয় উপহারগুলোর একটি গুরুত্ব পূর্ণ প্রতীকী ভূমিকা ছিল। থমাস রো হতাশ হয়েছিলেন। যখন তিনি আসফ খানের কাছে একটি আংটি উপস্থাপন করেছিলেন, তখন আসফ খান এটি তার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কারণ এটির দাম মাত্র 400 (চারশ) টাকা ছিল।

চিত্র 9.12
মোগলদের একটি পাগড়ির বাক্স।

➲ আলোচনা ...

মোগলদের এমন কিছু রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ও অনুশীলন রয়েছে যা বর্তমান রাজনৈতিক নেতারা অনুসরণ করেন?

7. সার্বভৌম পরিবার (The Imperial Household)

‘হারেম’ শব্দটি প্রায়শই মোগলদের ঘরোয়া জগতকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর উৎপত্তি ফারসি শব্দ হারাম থেকে, যার অর্থ, ‘পবিত্র স্থান’। মোগল পরিবারে সম্রাটের স্ত্রী এবং উপপত্নী, তাঁর নিকটবর্তী ও দূরের আত্মীয় (যেমন মা, সৎমা, পালিতা মা, বোন, কন্যা, পুত্রবধূ, কাকিমা, শিশু প্রমুখরা) এবং মহিলা চাকর এবং দাসরা এর অর্ন্তভুক্ত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষত ক্ষমতাসীন দলগুলোর মধ্যে ব্যাপকভাবে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল।

রাজপুত বংশের সাথে মোগলদের বৈবাহিক সম্পর্ক উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও জোরদার করার একটি উপায় মাত্র ছিল। বিয়ের সময় কনেকে অন্যান্য উপহারগুলোর পাশাপাশি একটি রাজ্যক্ষেত্রও উপহার দেওয়া হত। এটি শাসক গোষ্ঠীরগুলোর মধ্যে ক্রমাগত শ্রেণিবদ্ধ সম্পর্ককে নিশ্চিত করেছে। বিবাহের যোগসূত্রের মাধ্যমে সম্পর্কগুলোকে বিকশিত করা হয়। এবং এর ফলশ্রুতিতে মোগলরা একটি বিশাল আত্মীয়তার যোগসূত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সম্পর্ক তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দরগুলোর সাথে যুক্ত এবং একসাথে একটি বিশাল সাম্রাজ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে ছিল।

মোগল পরিবারে, রাজকীয় এবং অভিজাতদের পরিবার থেকে আগত স্ত্রীদের / পত্নী (বেগম) এবং অন্যান্য স্ত্রী/উপপত্নী (আঘাস) যারা জন্মগত ভাবে মহৎ ছিল না, তাদের মধ্যে একটি পার্থক্য বজায় ছিল। আঘাসদের তুলনায় প্রচুর পরিমাণে নগদ এবং মূল্যবান জিনিসপত্র যৌতক পাওয়ার পরে বিবাহিত এই বেগমরা স্বাভাবিক ভাবেই স্বামীদের কাছে বেশি ভালবাসা পেয়েছিল। রাজবংশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত মহিলাদের শ্রেণি বিন্যাসের সর্বনিষ্ঠ উপপত্নীরা অবস্থান করেছিল। তারা সকলেই তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী উপহারের সাথে পরিপূরক নগদে মাসিক ভাতা পেত। বংশ ভিত্তিক পারিবারিক কাঠামো সম্পূর্ণ স্থিতিশীল ছিল না। স্বামীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে আঘা এবং আঘাচারা একজন বেগমের অবস্থানে উঠতে পারত, তবে এই শর্তে যে তাকে প্রমাণ করতে হবে তার চারজন স্ত্রী নেই। আইনত বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদার উন্নীত করতে প্রেম ও মাতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

পত্না/স্ত্রী ছাড়াও অসংখ্য পুরুষ ও মহিলা দাস মোগল পরিবারের অংশ ছিল। সাধারণ সাংসারিক কাজগুলো সম্পাদন করার পাশাপাশি তারা এমন কাজও করত যেখানে প্রয়োজন ছিল দক্ষতা, কৌশল এবং বুদ্ধিমত্তার, হিজড়ে বা খাজা দাসগণ (যাদের খোয়াজাসার বলা হত) রাজপরিবারের প্রহরী এবং পরিচালকের কাজ করত। তাছাড়া তারা বিভিন্ন ব্যবসায় নিযুক্ত মহিলাদের এজেন্ট রূপেও অভ্যন্তরীণ জীবনের

চিত্র 9.13
ফতেরপুর সিক্রির অভ্যন্তরীণ কাম করার অংশ।

অংশ তারা বাইরের জগত ও মোগল পরিবারের অভ্যন্তরীণ জীবনের অংশ হয়ে উঠে।

নূর জাহানের পরে মোগল রানী এবং রাজকন্যারা উল্লেখ্যযাগ্য আর্থিক সংস্থান নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। শাহ জাহানের কন্যা জাহানারা ও রোশনারা প্রায়শই উচ্চ সাম্রাজ্য মনসবদারদের সমান বার্ষিক উপার্জন উপভোগ করত। এছাড়াও, জাহানারা বন্দর শহর সুরাট থেকে রাজস্ব আদায় করেছিল। যা বিদেশের ব্যবসায়ের একটি লাভজনক কেন্দ্র ছিল।

➲ চিত্রকর্মের প্রতিটি বিভাগে প্রদর্শন করা হয়েছে এমন ক্রিয়া কলাপগুলি বর্ণনা করো। বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত কাগজগুলোর বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা স্পাদিত কাজগুলির ভিত্তিকে দ্বারা সম্পাদিত কাজগুলোর বর্ণনা করো। বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত কাজগুলোর ভিত্তিতে রাজকীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের রাজকীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সনাক্ত করো, যা এই চিত্রে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

সম্পদ সমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ মোগল পরিবাররের গুরুত্বপূর্ণ মহিলাদের ভবন এবং বাগানগুলো পরিচালনা করতে সক্ষম করে। জাহানারা, শাহজাহানের নতুন রাজধানী শাহজাহান বাদের (দিল্লী) অনেক স্থাপত্য প্রকল্পের অংশ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি উঠান এবং বাগান সহ একটি মনোরম দ্বিতল পান্থনিবাস ছিল, শাহজাহানাবাদের ক্রমবর্ধমান কেন্দ্র চাঁদনী চকের বাজারের নকশা জাহানারা করেছিলেন।

মোগল রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ জগৎ সম্পর্কে আমাদের একটি আকর্ষনীয় বই উপহার দেওয়ার জন্য গুলবদন বেগম 'হুমায়ুন নামা' রচনা করেছিলেন। গুলবাদন বাবরের কন্যা, হুমায়ুনের বোন এবং আকবরের পিসি/খালা ছিলেন। তিনি তুর্কী ও পার্সিয়ান ভাষায় সাবলীলভাবে লিখতে পারতেন। আকবর যখন আবুল ফজলকে তাঁর রাজত্বের ইতিহাস লেখার অনুমোদন দিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর খালাকে, আবুলকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য, বাবর এবং হুমায়ুনের অধীনে তার আগের স্মৃতিগুলো রেকর্ড করার অনুরোধ করেছিলেন।

গুলবাদন যা লিখেছিলেন তাতে মোগল সম্রাটদের কোনো প্রশংসা ছিল না। বরং তিনি রাজকুমার এবং রাজাদের মধ্যে বিবাদ ও উত্তেজনা এবং পরিবারের মধ্যে কিছু সংঘাতের বিবরণ দিয়েছেন। পরিবারের এই বয়স্ক মহিলারা এই দ্বন্দ্বগুলোর কিছু সমাধান করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

চিত্র 9.14
রাজপুত্র সেলিমের জন্ম ফতেপুর সিক্রিতে। রামদাসের আঁকা ছবি, আকবর নামা।

8. রাজকীয় কর্মকর্তারা (The Imperial Officials)

8.1 নিয়োগ এবং পদমর্যাদা (Recruitment and rank)

মোগল ইতিহাস, বিশেষত আকবর নামা সাম্রাজ্যের এমন এক বিবরণ উপস্থাপন করেছে যাতে সমস্ত প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ ও কর্তৃত্ব প্রায় পুরোপুরি ভাবে সম্রাটের অধীনে থাকে এবং তাঁর রাজ্যের বাকি অংশটি তাঁর আদেশ অনুসারেই পরিচালিত হয়। তবুও যদি আমরা মোগল যুগের প্রশাসনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে এমন ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ তথ্য/নথিগুলো আরও ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাটি কার্যকর ভাবে কাজ করতে সক্ষম হতে বেশ কয়েকটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল ছিল, এমন উপায়গুলো আমরা বুঝতে সক্ষম হতে পারি। মোগল সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিল এর সৈন্যদলের কর্মকর্তারা, যাকে ইতিহাসবিদরা সম্মিলিত ভাবে সম্মিলিতভাবে আভিজাত্য হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের এই অভিজাত গোষ্ঠী বিভিন্ন জাতিগত এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এটি নিশ্চিত ছিল যে কোন পক্ষই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে অমান্য করার পক্ষে এতটা ক্ষমতা ছিলনা, মোগল সৈন্য দলের অফিসাররা মোগল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত, তাই তাদেরকে ফুলের তোড়া (গুলদস্তা) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। আকবরের সাম্রাজ্যিক চাকরিতে তুরানী ও ইরানী অভিজাতরা একটি রাজনৈতিক আধিপত্য তৈরির জন্য প্রথম দিক থেকেই উপস্থিত ছিলেন, অনেকঅভিজাতরা হুমায়ুনের সাথে ছিলেন, অন্যরা আবার পরে মোগল দরবারে চলে এসেছিলেন।

মোগল অভিজাত সম্প্রদায় (The Mughal nobility)

শাহজাহানের শাসনকালে রচিত তাঁর চার চমন (চার উদ্যান) গ্রন্থে চন্দ্রভবন বরাহমান এই ভাবে মোগল আধিজাত্যক বর্ণনা করেছিলেন ঃ

> বহু জাতির জনগণ (আরব, ইরানীয়া, তুর্কী, তাজিম, কুরডস, তাতার, রাশিয়ান, আবেসিনয় এবং এরকম আরো অনেক) এবং অনেক দেশ থেকে মানুষ (তুর্কী, মিশর, সিরিয়া, ইরাক, আরব, ইরান, খুরাসান, তুরান)– বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং সমস্ত সমাজের শ্রেণির লোকেরা রাজকীয় দরবারে আশ্রয় চেয়েছেন–যেমন ভারত থেকে বিভিন্ন দল (গ্রুপ) জ্ঞান এবং দক্ষতা সম্পন্ন পুরুষদের পাশাপাশি যোদ্ধারা উদাহরণস্বরূপ বুখারিস ও ভক্কারিস, সত্য বংশের সাইয়্যাদগন, আভিজাত্য সম্পন্ন শেখগণ, আফগানিস্তানের উপজাতি যেমন লোধি, রোহিলাস, ইউসুফজাই এবং রাজপুতদের জাতি যাদের রানা, রাজা, রাও এবং রায়য়ান অর্থাৎ রাঠোর, সিসোদিরা, কাছওয়াহা, হাদা, গৌড়, চৌহান, পানওয়ার, ভাদুড়িয়া, সোলঙ্কি, বুন্দেলা, শেখাওয়েত এবং অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় উপজাতি যেমন ঘাক্কার, খোকর, বালুচি এবং অন্যরা যারা তরোয়াল চালিয়েছিলেন এবং মনসবগুলোর 100-7000 জ্যাট, একই ভাবে খাড়া এবং পাহাড় থেকে জমির মালিকরা কর্ণাটক, বাংলা, আসাম, উদয়পুর, শ্রীনগর, কুমাত্তন, তিব্বত ও কিস্তার অঞ্চলে এবং এরকম আরও পুরো উপজাতি এবং তাদের গোষ্ঠীগুলি রাজকীয় দরবারের চৌকাঠ চুম্বন করার সুযোগ পেয়েছিল, অর্থাৎ রাজদরবারে অংশগ্রহণ করার অথবা চাকুরির সুযোগ পায়।

1560 সাল থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত দুটি শাসক গোষ্ঠী রাজকীয় চাকরিতে প্রবেশ করেছিল ঃ একটি হল রাজপুত এবং অন্যটি হল মুসলিম শেখজাদা। প্রথম যিনি যোগ দিয়েছিলেন তিনি হলেন রাজপুত প্রধান, আম্বরের রাজা ভর্মল কাছওয়াহা, যার মেয়ের আকবরের সাথে বিয়ে হয়েছিল। শিক্ষা ও হিসাবরক্ষক পদে নিযুক্ত থাকা হিন্দু বর্ণের সদস্যদেরও পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল আকবরের অর্থমন্ত্রী টোডরমল, যিনি খাত্রী জাতের ছিলেন।

ইরানীরা জাহাঙ্গীরের অধীনে (সময়ে) উচ্চপদ লাভ করেছিল। তাদের রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবশালী রানী নূর জাহান একজন ইরানী ছিলেন। ঔরঙ্গজেব রাজপুতদের উচ্চপদে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর অধীনে মারাঠা আধিকারিকদের সংখ্যা এক বিশাল সংখ্যা হিসাবে গণ্য হয়েছিল।

সরকারী দফতরের সমস্ত ধারকরা (মনসবরা) দুটি সংখ্যক উপাধি সমন্বিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'জাট' যা ছিল রাজকীয় শ্রেণিবিন্যাসের অবস্থান এবং কর্মচারীদের (মনসবদারদের) বেতনের সূচক এবং 'সাওয়ার' যা তাদের চাকরি বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ঘোড়াসওয়ারের সংখ্যা নির্দেশ করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে 1,000 জাট বা তার চেয়েও উপরের মনসবদাররা অভিজাত (উমারা, যা আমিরের বহুবচন) হিসাবে চিহ্নিত হতেন।

অভিজাতরা তাদের সেনাবাহিনী নিয়ে সামরিক অভিযানে অংশ নিয়েছিল এবং প্রদেশগুলিতে সাম্রাজ্যের অফিসার হিসাবেও কাজ করেছিল। প্রতিটি সামরিক কমান্ডার মোগল সেনাবাহিনীর অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ, সজ্জিত এবং প্রশিক্ষিত করেছিলেন। সৈন্যরা সাম্রাজ্যের চিহ্ন (দাগ) দ্বারা উন্নত ঘোড়াগুলির পার্শ্বদেশ চিহ্নিত করে রেখেছিল। সম্রাট ব্যক্তিগত ভাবে, নিম্নস্তরের আধিকারিক ব্যতিত অন্যান্য আধিকারিকদের পদমর্যাদা, উপাধি এবং অফিসিয়াল পোস্টিংয়ের পরিবর্তণগুলো পর্যালোচনা করে দেখতেন। আকবর যিনি মনসব পদ্ধতিটি পরিকল্পনা করেছিলেন, তিনি তাঁর আভিজাত্যের একটি নির্বাচিত দলের সাথে ঐশ্বরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কারণ তিনি তাদেরকে তাঁর শিষ্য (মুরিদ) হিসাবে মনে করতেন।

অভিজাত সদস্যদের জন্য, সাম্রাজ্য সেবাশক্তি, সম্পদ এবং সর্বোচ্চ খ্যাতি অর্জনের একটি উপায় ছিল। একজন ব্যক্তি চাকরিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক হলে তাকে অভিজাতদের মাধ্যমে আবেদন করতে হত এবং সেই অভিজাতরা সম্রাটের কাছে 'তাজভিজ' উপস্থাপন করত। যদি আবেদনকারীকে উপযুক্ত মনে করা হত, তবে তাকে একটি মনসব দেওয়া হতো। মীর বক্সী (প্রধান কোষাধ্যক্ষ) যখন সম্রাটের ডানদিকে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত আদালতে সমস্ত প্রার্থীকে নিয়োগ বা পদোন্নতির জন্য নাম উপস্থাপন করতেন, তখন তাঁর অফিস তার সীলমোহর এবং স্বাক্ষর এবং সেই সঙ্গে সম্রাটের সীলমোহর

উৎস 3

মোগল দরবারে অভিজাতগণ

আকবরের দরবারের বাসিন্দা জেসুইট পুরোহিত ফাদার আন্তোনিও মাঁসির‍্যাট লক্ষ্য করলেন ঃ

> যাতে অদম্য ক্ষমতার উপভোগের মধ্য দিয়ে মহান অভিজাতরা দাম্ভিক না হয়ে যান, তাই রাজা তাদেরকে রাজ দরবারে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন এবং তাদেরকে এমন জঘন্য আদেশ দেন, যেন তারা তাঁর দাস। এই আদেশ গুলির আনুগত্য তাদের উচ্চতর পদ এবং মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে।

➲ ফাদার মঁসির‍্যাট-এর পর্যবেক্ষণে মোগল সম্রাট এবং তাঁর কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে কী প্রকাশ করে?

তাজউইজ ছিল একটি আবেদন যা একজন মহৎ ব্যক্তির দ্বারা সম্রাটের কাছে উপস্থাপিত করা হত, যাতে একজন আবেদন কারীকে মনসবদার পদে নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়।

ও স্বাক্ষর বহনকারী আদেশ প্রস্তুত করত। কেন্দ্রে আরও দু'জন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন ঃ দেওয়ান-ই -আলা (অর্থমন্ত্রী) এবং সদর -উস- সুদূর (অনুদান /দানমন্ত্রী অথবা মদাদ-ই-মাশ, যিনি স্থানীয় বিচারক বা কাজী নিয়োগের দায়িতে থাকতেন)। এই তিন মন্ত্রী মাঝে মধ্যে উপদেষ্টা হিসাবে একসাথে কাজ করতেন কিন্তু তারা একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। এই তিনজন এবং অন্যান্য উপদেষ্টাদের সাহায্যে আকবর তাঁর সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক, রাজস্ব এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলোকে আকার দিয়েছিলেন।

কোনও প্রদেশ বা সামরিক অভিযানে নিযুক্ত হওয়ার জন্য একটি সংরক্ষিত শক্তি ছিল দরবারে অবস্থানরত অভিজাতরা (তায়ানত-ই-রাকাব)। সম্রাটের কাছে বশ্যতা প্রকাশ করার জন্য তাদের প্রতিদিন, সকাল ও সন্ধ্যায় দুবার জনগনের পেক্ষাগৃহে উপস্থিত হওয়ার দায়িত্ব ছিল। তারা সম্রাট এবং তাঁর পরিবারকে চব্বিশ ঘন্টা রক্ষা করার দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিলেন।

8.2 তথ্য এবং সাম্রাজ্য (Information and empire)

যথাযথ এবং বিস্তারিত রেকর্ড সংরক্ষন করা মোগল প্রশাসনের একটি বড় উদ্বেগ ছিল। মীরবকশী দরবার লেখকদের কর্ণধারদের (ওয়াকিয়া নাভিস) তত্ত্বাবধান করেছিলেন, যারা মোগল দরবারে উপস্থাপিত সমস্ত আবেদনপত্র ও নথিপত্র এবং সমস্ত রাজকীয় নির্দেশ (ফরমান) নথীভুক্ত করতেন। অধিকন্তু, অভিজাত শাসকদের এজেন্টরা (ওয়াফিল) 'উচ্চ আদালতের সংবাদ' (আখবারত-ই-দকবার-ই মুয়াল্লা) শিরোনামে দরবারের পুরো কার্য করি তার সাথে আদালতের অধিবেশনের দিন, তারিখ রেকর্ড করতেন। আখবারাতে সমস্ত ধরনের তথ্য লিপিবদ্ধ থাকত। যেমন- আদালতে উপস্থিতির সংখ্যা, উপস্থাপিত উপহার বা অনুদান প্রদান, উপাধি, কূটনৈতিক মিশন বা কোনও কর্মকর্তার স্বাস্থ্যের বিষয়ে সম্রাট কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ ইত্যাদি। এই তথ্যগুলো রাজা ও অভিজাতদের সরকারী ও ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস লেখার জন্য মূল্যবান ছিল।

সংবাদ প্রতিবেদন এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দস্তাবেজগুলো সরকারী ডাকযোগে মোগল শাসনের অধীনস্থ অঞ্চলগুলো জুড়ে আদান প্রদান করা হত। বাঁশের পাত্রে কাগজপত্রগুলো নিয়ে পদাতিক দূতরা (কাসিদ বা পথ্‌মার) দিনরাত দৌড়াতে থাকত। তাই সম্রাট মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সুদূর প্রাদেশিক রাজধানী থেকেও প্রতিবদন গ্রহণ করতে পারতেন। রাজধানীর বাইরে কর্মরত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের এজেন্টরা, রাজপুত রাজকুমাররা এবং আঞ্চলিক শাসকরা সকলেই এই ঘোষণাগুলো অনুলিপি করেছিলেন এবং বিষয়বস্তুগুলো তাদের প্রভুদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য জনসংবাদ প্রেরণকারী একটি দ্রুত তথ্য পরিবেশনকারী কাঠামো দ্বারা সংযুক্ত ছিল।

8.3 কেন্দ্রিয় শাসনের বাইরে ঃ প্রাদেশিক প্রশাসন (Beyond the centre: provincial administration)

কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত কার্যাবলির বিভাগটি সেই প্রদেশগুলোতে (সুবা) প্রতিলিপি করা হয়েছিল, যেখানে মন্ত্রীরা তাদের সংশ্লিষ্ট অধস্তন ছিলেন (দেওয়ান, বক্সী এবং সাদর)। প্রাদেশিক প্রশাসনের প্রধান ছিলেন গভর্নর (সুবাদার) যিনি সরাসরি সম্রাটের কাছে রিপোর্ট করতেন।

প্রত্যেক সুবা, সরকারে বিভক্ত ছিল। জেলাগুলোতে অশ্বারোহী ও বন্দুকধারী সৈনিকদেরকে মোতায়েন করা হয়েছিল, যা প্রায়শই ফৌজদারদের (সেনাপ্রধানদের) এক্তিয়ারে ছিল। স্থানীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে তিন জন উপ বংশানুক্রমিক আধিকারিক, যথা কানুনগো (রাজস্বের হিসাব রক্ষাকর্তা), চৌধুরী (রাজস্ব আদায়কারী) এবং কাজীর দ্বারা পরগণা (উপ-জেলা) স্তরের তদারকি করা হত।

প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগে কেরানী, হিসাবরক্ষক, নিরীক্ষক (হিসাব পরীক্ষক), বার্তাবাহক এবং অন্যান্য কর্মীদের একটি বড়ো সমর্থনকারী দল ছিল যারা প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। তারা উৎকর্ষ নিয়মাবলী এবং পদ্ধতি অনুসারে কাজ করতেন এবং প্রচুর লিখিত আদেশ ও নথি তৈরি করতেন। প্রশাসনের ভাষা ছিল ফার্সী, তবে গ্রামের লোকেরা হিসাব নিকাসের ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করতেন।

মোগল ইতিহাস অনুসারীরা সাধারণত সম্রাট এবং তাঁর দরবারকে গ্রাম স্তর, অব্দি, পুরো প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ কর্তা হিসাবে চিত্রিত করেছিলেন। তবুও তোমরা যেমনটি দেখেছ (অধ্যায়-৪) এটি তেমনটি নয়। সম্ভবত এই প্রক্রিয়াটি উত্তেজনামুক্ত ছিল না। স্থানীয় বিত্তশালী জমিদার এবং মোগল সম্রাটের প্রতিনিধিদের মধ্যে সম্পর্ক কখনও কখনও ক্ষমতা আধিকারের লড়াই ও সম্পদ বণ্টনে দ্বন্দ্বের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। জমিদাররা প্রায়শই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কৃষক সমর্থন জোটে সফল হয়েছিল।

➲ আলোচনা করো ...

৮ম অধ্যায়ের 2 নং অংশটি করেকবার পড়ো এবং সম্রাটের উপস্থিতি গ্রামাঞ্চলে কতটা অনুভূত হয়েছিল। আলোচনা করো।

9. সীমান্ত ছাড়িয়ে (Beyond the Frontiers)

ইতিহাস লেখকেরা মোগল সম্রাটদের দ্বারা গৃহীত অনেক আড়ম্বরপূর্ণউপাধির তালিকা উপস্থাপন করেছে, এর মধ্যে শাহেন শাহের (রাজার রাজা) মতো সাধারণ উপাধি বা সিংহাসনে আরোহনের পরে পৃথক রাজাদের দ্বারা নির্দিষ্ট উপাধি যেমন জাহাঙ্গীর (বিশ্বের অধিকারী) বা শাহ-জাহান (বিশ্বের রাজা) প্রভৃতি অন্তরভুক্ত ছিল। ইতিহাসবিদরা প্রায়শই এই উপাধিগুলোর অর্থ অধ্যায়ন করতেন এবং মোগল সম্রাটদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রিয় অঞ্চল ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কর্তা হওয়ার দাবিটিকে জোরালো সমর্থন প্রদান করতেন। তবুও একই সমসায়িক ইতিহাস, কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং প্রতিবেশী রাজনৈতিক শক্তির সাথে দ্বন্দ্বের বিবরণ সরবরাহ করে। এগুলো আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে উদ্ভুত কিছু উত্তেজনা এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিফলিত করে।

চিত্র 9.15
কান্দাহার অবরোধ

9.1 সাফাভিদ এবং কান্দাহার (The Safavids and Qandahar)

মোগল রাজাদের এবং পার্শবর্তী, দেশ ইরান ও তুরানের মধ্যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক হিন্দুকুশ পর্বতমালার সীমান্তের নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করত, যেটি আফগানিস্থানকে ইরান ও মধ্য এশিয়ার অঞ্চল থেকে পৃথক করেছিল। যে সমস্ত বিজয়ী ভারত উপমহাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল, তাদের উত্তর ভারতে প্রবেশের জন্য হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে আসতে হয়েছিল। মোগল নীতিমালার একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল কৌশলগতভাবে ফাঁড়িগুলো, বিশেষ লক্ষ্য ছিল কৌশলগত ভাবে ফাঁড়িগুলো, বিশেষত কাবুল এবং কান্দাহারকে নিয়ন্ত্রণ করে এই সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া।

সাফাভিদ এবং মোগলদের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ ছিল কান্দাহার। দুর্গ শহরটি প্রাথমিকভাবে হুমায়ুনের দখলে ছিল। আকবর কর্তৃক 1595 সালে এটি দখল করা হয়েছিল। সাফাভিদ দরবার মোগলদের সাথে কূটনৈতিক

চিত্র 9.16
জাহাঙ্গীরের
স্বপ্নএই মুদ্রাকৃতির শিল্পকর্মে খোদাই করা লেখা থেকে জানা যায় যে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর সম্প্রতি দেখা একটি স্বপ্নকে চিত্রায়িত করার দায়িত্ব আবুল হাসানকে দিয়েছিলেন। আবুল হাসান দু'জন শাসককে চিত্রিত করে এই দৃশ্যটি এঁকেছিলেন– জাহাঙ্গীর এবং সাফাভিদ শাহ আব্বাস– তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ আলিঙ্গানে দেখানো হয়েছে। উভয় সম্রাটকে (রাজাকে) তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে চিত্রিত করা হয়েছে, শাহের ছবিটি বিশালদাসের নির্মিত প্রতিকৃতিগুলোর উপর ভিত্তি করে আঁকা হয়েছে, যিনি 1619 সালে ইরানে মোগল দূতাবাসের দূত হিসাবে এসেছিলেন এটি একটি দৃশ্যে সত্যতার অনুভূতি দিয়েছে যা কল্পিত, কারণ এই দুই শাসকের কখনও সাক্ষাতই হয়নি।

মনোযোগ সহকারে ছবিটিতে দিকে তাকাও, জাহাঙ্গীর এবং শাহ আব্বাসের সম্পর্ক কীভাবে দেখানো হয়েছে? তাদের শারীরিক গঠন এবং ভঙ্গিমা তুলনা করো। পশুদের কীসের প্রতীক হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে? মানচিত্রটি কীসের ইঙ্গিত দেয়?

সম্পর্ক বজায় রাখার পরেও কান্দাহারকে পণ হিসাবে দাবী করে চলছিল। 1613 খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর কান্দাহার দখলে রাখার জন্য মোগল মামলার উকালতি করার জন্য শাহ আব্বাসের দরবারে কূটনৈতিক দূত প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সফল হয় নি। 1622 খ্রিস্টাব্দের শীতকালে পার্সিয়ান সেনাবাহিনী কান্দাহারকে ঘিরে ফেলে, অসম-প্রস্তুত মোগল সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছিল এবং দুর্গ ও শহরটি সাফাভিদের কাছে সমপর্ণ করতে হয়েছিল।

9.2 অটোমান ঃ- তীর্থস্থান এবং বাণিজ্য (The Ottomans: pilgrimage and trade)

অটোমানদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলিকে বণিক এবং তীর্থ যাত্রীদের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করার নিরিখেই মোগল এবং অটোমানদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এটি হিজাজ সম্পর্কে বিশেষভাবে সত্য ছিল। কারণ অটোমান ঐ অংশে আরবের অর্থাৎ হিজাজে, গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান মক্কা ও মদিনা অবস্থিত ছিল, মোগল সম্রাট সাধারণত লোহিত সমুদ্র বন্দর, যথা আদেন ও মোখাতে মূল্যবান পণ্য রপ্তানি করে ধর্ম মোখাতে ও বাণিজ্যকে একত্রিত করেছিলেন। সেখানে তীর্থস্থানের তত্ত্বাবধায়ক এবং ধার্মিক পুরুষদের মধ্যে পণ্য বিক্রয়ের মুনাফা বিতরণ করা হত। তবে, যখন

ঔরঙ্গজেব আরবের কাছে প্রেরিত তহবিলের অপব্যবহারের মামলাগুলো আবিষ্কার করেছিলেন। তখন তিনি ভারতে তাদের বিতরণকে সমর্থন করেছিলেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে ভারতবর্ষও, "মক্কা মতোই ঈশ্বরের ঘর ছিল।"

9.3 মোগল দরবারে জেসুইটসরা (Jesuits at the Mughal court)

জেসুইট মিশনারী, ভ্রমণকারী, ব্যবসায়ী এবং কূটনীতিকদরে বিবরণের মাধ্যমে ইউরোপ, ভারত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিল। ইউরোপীয় লেখকদের দ্বারা লিপিবন্ধ জেসুইট বিবরণগুলো মোগল দরবারের প্রথম দিকের প্রমাণপত্র (ছাপ)।

পনেরো শতকের শেষে ভারতে সরাসরি সমুদ্রপথ আবিষ্কারের পরে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা ভারতের বন্দর শহরগুলির মধ্যে বাণিজ্যের একটি যৌথ সম্প্রচার ব্যবস্থা স্থাপন করেছিল। পর্তুগীজ রাজা সোসাইটি অফজিসাস -এর মিশনারীদের (জেসুইটস) সাহায্যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারে আগ্রহী ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর ভারতে আগত খ্রিস্টান মিশনগুলো বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য নির্মাণের প্রক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করে।

আকবর খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং জেসুইট পুরোহিতদের আমন্ত্রণ জানাতে গোয়ায় একটি দূতাবাস নির্মাণ করেছিলেন। 1580 সালে ফতেপুর সিক্রির মোগল দরবারে প্রথম জেসুইট মিশনারীরা এসেছিলেন এবং সেখানে তারা প্রায় দুই বছর ছিলেন। জেসুইটরা আকবরকে খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে বলেছিলেন এবং উলেমাদের সাথে এই ধর্মের গুণাবলি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। 1591 সাল থেকে 1595 সালের মধ্যে আরো দুটো মিশনারী দলকে লাহোরের মোগল দরবারে পাঠানো হয়েছিল।

জেসুইট বিবরণগুলো ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে লেখা হয়েছিল এবং এগুলো সম্রাটের চরিত্র ও মনের উপর আলোকপাত করেছিল। জন সমাবেশ (পাবলিক অ্যাসেমমব্লিতেগুলোতে জেসুইটদেরকে আকবরের সিংহাসনের খুব কাছাকাছি রাখা হয়েছিল। তারা তাঁর প্রচারের সময় তাঁর সাথে এসেছিলেন, তাঁর ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিতেন এবং প্রায়শই তাঁর অবসর ঘন্টার তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। জেসুইট বিবরণীতে রাজ্য আধিকারিকদের এবং মোগল আমলের জীবনের সাধারণ পরিস্থিতি সম্পর্কে পারস্যের ইতিহাসে দেওয়া তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

উৎস 4

সুযোগ্য/সহায়ক সম্রাট

মনসারেট, যিনি প্রথম জেসুইট মিশনের সদস্য ছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণীতে তিনি বলেছেন ঃ

> যারা তাঁর শ্রোতা, তাদের কাছে তিনি (আকবর) নিজেকে কতটা গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন তা অতিরঞ্জিত করে বলা শক্ত। কারণ তিনি প্রায় প্রতিদিন সাধারণ বা মহৎ লোকদের বা যে কোনও ব্যক্তির পক্ষেতাকে দেখার এবং তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ তৈরি করে দিতেন এবং যাঁরা তাঁর সাথে কথা বলতে আসে তাদের প্রতি কড়া মনোভাব না দেখিয়ে বরং নিজেকে মনোমুগ্ধকর, মৃদুভাষী এবং স্নেহময় দেখানোর চেষ্টা করেন। এটি অত্যন্ত স্মরনীয় যে এই নম্রতা ও স্নেহশীলতা তাঁকে তার প্রজাদের মনে সংযুক্ত করতে কতটা দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছিল।

➲ এই বিবরণীটি উৎস 2 নং এর সাথে তুলনা করো।

➲ আলোচনা করো ...

মোগল শাসকদের সাথে তাদের সমসাময়িক শাসকদের সম্পর্ক কেমন ছিল বলে তুমি মনে কর।

10. আনুষ্ঠানিক ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করা (Questioning Formal Religion)

আকবর জেসুইট মিশনের সদস্যদের প্রতি যে উচ্চ সম্মান দেখিয়েছিলেন তা গভীরভাবে তাদের মুগ্ধ করেছিল। তারা খ্রিস্ট ধর্মের মতবাদ সম্পর্কে সম্রাটের প্রকাশ্য আগ্রহকে তাঁর সেই ধর্মের প্রতি বিশ্বাসও গ্রহণযোগ্যতার চিহ্ন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এটি পশ্চিম ইউরোপের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে বোঝা যায়, মনসেরাট মন্তব্য করেছিলেন যে, "রাজা এই মর্মে খুব কম যত্নশীল ছিলেন যে প্রত্যেককে তার ধর্ম অনুসরণ করার অনুমতি দিয়ে তিনি বাস্তবে সমস্ত ধর্মকেই লঙ্ঘন করেছেন।"

আকবরের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্বেষনের ফলে ফতেপুর সিক্রির ইবাদাত খানায় মুসলিম, হিন্দু. জৈন, পার্সি এবং খ্রিষ্টান পন্ডিতারদের মধ্যে অন্ত ধর্মীয় বিশ্বাসের বিতর্ক সৃষ্টি করে। আকবরের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীগুলো পরিপক্ক হয়ে উঠল যখন তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের পন্ডিতদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন এবং তাদের মতামত সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ করেছিলেন। ক্রমবর্ধমানভাবে, তিনি ধর্মকে উপলব্ধি করার গোঁড়া ইসলামিক উপায়গুলো থেকে দূরে সরে এসেছিলেন এবং আলো ও সূর্যের ঐশ্বরিক উপাসনার এক নিজস্ব ধারণা সম্পন্ন সরগ্রাহী রূপের দিকে অগ্রসর হন। আমরা দেখেছি যে আকবর ও আবুল ফজল আলোর দর্শন তৈরি করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাজের ভাবমূর্তি ও আদর্শকে রূপাদান দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে, ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রানিত ব্যক্তির, তার লোকদের উপরে সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্ব এবং তার শত্রুদের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকত।

চিত্র 9.17
দরবারে ধর্মীয় বিতর্ক
পাদ্রে রুডলফ এ্যাকোয়াভিভা প্রথম জেসুইট মিশনের নেতা ছিলেন। ছবির উপরে তাঁর নাম লেখা আছে।

হারামে হোম (**Hom in the *haram***)

এটি আবদুল কাদির বাদাউনির লেখা মনুতাখাব -উট তাওয়ারিখের একটি অংশ। ধর্মতত্ত্ববিদ ও দরবারী বাদাউনি তার নিয়োগ কর্তার নীতিগুলির সমালোচনা করেছিলেন এবং তাঁর বইয়ের বিষয়বস্তু সর্বজনীন করতে চাননি।

> যৌবন কাল থেকেই তাঁর স্ত্রীদের অর্থাৎ হিন্দরাজ কন্যাদের অভিনন্দন ও প্রশংসা হেতু মহামহিম সম্রাট হারামে হোম সম্পাদন করতেন, যা অগ্নি উপাসনা (অতীশ-পরশতী) থেকে প্রাপ্ত অনুষ্ঠান ছিল। তবে তাঁর রাজত্ব কালের পঁচিশতম নিয়মিত বছরের নববর্ষে (1578) তিনি সূর্য ও আগুনের সামনে প্রকাশ্যে সিজদা করেছিলেন। সন্ধ্যায় যখন প্রদীপ ও মোমবাতিগুলো জ্বলে উঠে তখন পুরো দরবারটি (আদালত) শ্রদ্ধায় ভরে উঠে ও লোকজন উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করে।

এই ধারণাগুলো মোগল দরবারের কাহিনীকারদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যারা আমাদের সেই প্রক্রিয়াগুলোর ধারণা দেয় যার দ্বারা মোগল শাসকরা কার্যকর ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জনসাধারণকে একটি সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় সংহত করতে পেরেছিলেন। রাজবংশের নামটি উপমহাদেশে দেড় শতাব্দী ধরে বৈধতা। উপভোগ করে চলেছিল। যদিও এর ভৌগোলিক পরিধি এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল।

চিত্র 9.18
মুলতানের একটি মাজারের নীল রঙের টাইলস্ ইরানের প্রবাসী কারিগররা নিয়ে এসেছিল।

সময় রেখা (Timeline)

কিছু প্রধান মোগল ইতিহাস এবং স্মৃতিচারণ

c. 1530	তুর্কি ভাষায় বাবর স্মৃতি চিহ্নের পান্ডুলিপি— ঝড় থেকে রক্ষা পেয়েছে— তৈমুরিডদের পরিবার সংগ্রহের অংশ হয়ে যায়।
c. 1587	গুলবদন বেগম 'হুমায়ুন নামা' লিখতে শুরু করেন ।
1589	বাবর স্মৃতি পারসিক ভাষায় অনুবাদ হয় 'বাবর নামা' নামে।
1589-1602	আবুল ফজল ' আকবর নামা' লিখেছেন।
1605-22	জাহাঙ্গীর 'জাহাঙ্গীর নামা' নামে তাঁর স্মৃতি চারণ লিখেছেন।
1639-47	লাহোরি 'বাদশা নামা' এর প্রথম দুটি দফতর বা খসড়া রচনা করেছেন।
c. 1650	মহম্মদ ওয়ারিস শাহ জাহানের রাজত্বের তৃতীয় দশকের ইতিহাস লিখতে শুরু করেছিলেন।
1668	'আলমগীর নামা'— আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দশ বছরের ইতিহাস মহম্মদ কাজিমের দ্বারা সংকলিত হয়।

100 থেকে 150 শব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

1. মোগল দরবারে পাণ্ডুলিপি প্রকাশনার প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।
2. মোগল দরবারের সাথে যুক্ত নিত্যদিনের কার্যাবলি এবং বিশেষ উৎসবগুলো কীভাবে সম্রাটের ক্ষমতাকে প্রকাশ করে?
3. মোগল সাম্রাজ্যের রাজকীয় পরিবারের মহিলারা যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা মূল্যায়ণ করো।
4. উপমহাদেশের বাইরের অঞ্চলগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মোগল নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কী উদ্বেগ প্রকাশ পায়?
5. মোগল প্রাদেশিক প্রশাসনের প্রধান বৈশিষ্ঠ্যগুলো আলোচনা কর। কেন্দ্র কীভাবে প্রদেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল?

সংক্ষিপ্ত রচনা লিখো (250-300 শব্দের মধ্যে)

6. উদাহরণ সহযোগে মোগল ইতিহাসের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্যগুলো আলোচনা করো।
7. তুমি কি মনে করো যে এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত দৃশ্যমান উপাদানটি আবুল ফজলের তাসওয়ির (উৎস-1) বর্ণনার সাথে মিলেছে?
8. মোগল আভিজাত্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্যেগুলো কী ছিল? সম্রাটের সাথে তাদের সম্পর্ক কেমন ছিল?
9. মোগল রাজতন্ত্রের আদর্শ গঠনে যে উপাদানগুলো কাজ করেছিল সেগুলো চিহ্নিত করো।

নিম্নলিখিত

চিত্র 9.19

অনেক মোগল পাণ্ডুলিপিতে পাখি আঁকা ছিল।

If you would like to know more, read:

Bamber Gascoigne. 1971. *The Great Moghuls.* Jonathan Cape Ltd., London.

Shireen Moosvi. 2006 (rpt). *Episodes in the Life of Akbar.* National Book Trust, New Delhi.

Harbans Mukhia. 2004. *The Mughals of India.* Blackwell, Oxford.

John F. Richards. 1996. *The Mughal Empire* (The New Cambridge History of India, Vol.1). Cambridge University Press, Cambridge.

Annemarie Schimmel. 2005. *The Empire of the Great Mughals: History, Art and Culture.* Oxford University Press, New Delhi.

আরো তথ্যের জন্য তুমি দেখতে পার ঃ
www.mughalgardens.org

মানচিত্রের কাজ (Map work)

10. বিশ্বের মানচিত্রে কোন্ কোন্ দেশের সাথে মোগলদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল, সেই স্থানগুলো চিহ্নিত করো।

প্রকল্প (একটি পছন্দ কর) Project (choose one)

11. যে কোনও একটি মোগল ইতিহাস সম্পর্কে আরও তথ্য সন্ধান করো। লেখকের বর্ণনা এবং পাঠ্যের ভাষা শৈলীর এবং বিষয়বস্তু বর্ণনা করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করো। সম্রাটের শক্তি চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত চিহ্নগুলোতে মনোনিবেশ করে তোমার পছন্দের ঘটনাটি চিত্রিত করতে ব্যবহৃত কমপক্ষে দুটি দৃশ্যের (ভিজ্যুয়াল) বর্ণনা করো।

12. মোগল দরবার এবং প্রশাসন, শাসনব্যবস্থার আদর্শ, দরবারের আচার অনুষ্ঠান এবং সাম্রাজ্যিক চাকরিতে নিয়োগের মাধ্যমের দিকে বিশেষ জোর দিয়ে তার সাথে বর্তমান সরকারের পদ্ধতির তুলনা করেই তার একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

চিত্র 9.20
একটি মোগলচিত্র যা গাছে কাঠবিড়ালি চিত্রিত করে।

Credits for Illustrations

Theme 5

Fig. 5.1: Ritu Topa.

Fig. 5.2: Henri Stierlin, *The Cultural History of the Arabs,* Aurum Press, London, 1981.

Fig. 5.4, 5.13: FICCI, *Footprints of Enterprise: Indian Business Through the Ages,* Oxford University Press, New Delhi, 1999.

Fig. 5.5: Calcutta Art Gallery, printed in E.B. Havell, *The Art Heritage of India,* D.B. Taraporevala Sons & Co., Bombay, 1964.

Fig. 5.6, 5.7, 5.12: Bamber Gascoigne, *The Great Moghuls*, Jonathan Cape Ltd., London, 1971.

Fig. 5.8, 5.9: Sunil Kumar.

Fig. 5.10: Rosemary Crill, *Indian Ikat Textiles,* Weatherhill, London, 1998.

Fig. 5.11, 5.14: C.A. Bayly (ed). *An Illustrated History of Modern India,1600-1947,* Oxford University Press, Bombay, 1991.

Theme 6

Fig. 6.1: Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India,* Weatherhill, New York, 1993.

Fig. 6.3, 6.17: Jim Masselos, Jackie Menzies and Pratapaditya Pal, *Dancing to the Flute: Music and Dance in Indian Art,* The Art Gallery of New South Wales, Sydney, Australia, 1997.

Fig. 6.4, 6.5: Benjamin Rowland, *The Art and Architecture of India,* Penguin, Harmondsworth, 1970.

Fig. 6.6: Henri Stierlin, *The Cultural History of the Arabs,* Aurum Press, London, 1981.

Fig. 6.8: http://www.us.iis.ac.uk/view_article.asp/ContentID=104228

Fig. 6.9: http://www.thekkepuram.ourfamily.com/miskal.htm

Fig. 6.10: http://a-bangladesh.com/banglapedia/Images/A_0350A.JPG

Fig. 6.11: foziaqazi@kashmirvision.com

Fig. 6.12: Stuart Cary Welch, *Indian Art and Culture 1300-1900,* The Metropolitan Museum of Art, New York, 1985.

Fig. 6.13: Bamber Gascoigne, *The Great Moghuls,* Jonathan Cape Ltd., London, 1971.

Fig. 6.15: CCRT.

Fig. 6.16: C. A. Bayly (ed). *An Illustrated History of Modern India, 1600-1947,* Oxford University Press, Bombay, 1991.

Fig. 6.18: Ahmad Nabi Khan, *Islamic Architecture in Pakistan,* National Hijra Council, Islamabad, 1990.

Theme 7

Fig. 7.1, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.18: Vasundhara Filliozat and George Michell (eds), *The Splendours of Vijayanagara,* Marg Publications, Bombay, 1981.

Fig. 7.2: C.A. Bayly (ed). *An Illustrated History of Modern India,*

1600-1947, Oxford University Press, Bombay, 1991.

Fig. 7.3: Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India,* Weatherhill, New York, 1993.

Fig. 7.4, 7.6, 7.7, 7.20, 7. 23, 7.26, 7.27, 7.32: George Michell, *Architecture and Art of South India,* Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

Fig. 7.5, 7.8, 7.9, 7.21 http://www.museum.upenn.edu/new/research/Exp_Rese_Disc/Asia/vrp/HTML/Vijay_Hist.shtml

Fig 7.10: Catherine B. Asher and Cynthia Talbot. *India Before Europe,* Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

Fig. 7.17, 7.22, 7.24, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.33: George Michell and M.B.Wagoner, *Vijayanagara: Architectural Inventory of the Sacred Centre,* Munshiram Manoharlal, New Delhi.

Fig. 7.25: CCRT.

Theme 8

Fig. 8.1, 8.9: Milo Cleveland Beach and Ebba Koch, *King of the World,* Sackler Gallery, New York, 1997.

Fig. 8.3: India Office Library, printed in C.A. Bailey (ed). *An Illustrated History of Modern India, 1600-1947,* Oxford University Press, Bombay, 1991.

Fig. 8.4: Harvard University Art Museum, printed in Stuart Cary Welch, *Indian Art and Culture 1300-1900,* The Metropolitan Museum of Art, New York, 1985.

Fig. 8.6, 8.11, 8.12, 8.14: C.A. Bayly (ed). *An Illustrated History of Modern India, 1600-1947,* Oxford University Press, Bombay, 1991.

Fig. 8.13, 8.15: Bamber Gascoigne, *The Great Moghuls*, Jonathan Cape Ltd., London, 1971.

Theme 9

Fig. 9.1, 9.2, 9.12, 9.13, 9.19: Bamber Gascoigne, *The Great Moghuls,* Jonathan Cape, London, 1971.

Fig. 9.3, 9.4, 9.17: Michael Brand and Glenn D. Lowry, *Akbar's India,* New York, 1986.

Fig. 9.5, 9.15: Amina Okada, *Indian Miniatures of the Mughal Court.*

Fig. 9.6, 9.7: *The Jahangirnama* (tr. Wheeler Thackston)

Fig. 9.8: Photograph Friedrich Huneke.

Fig. 9.9, 9.11 a, b, c : Milo Cleveland Beach and Ebba Koch, *King of the World,* Sackler Gallery, New York, 1997.

Fig. 9.10, 9.16, 9.20: Stuart Carey Welch, *Imperial Mughal Painting,* George Braziller, New York, 1978.

Fig. 9.14: Geeti Sen, *Paintings from the Akbarnama.*

Fig. 9.18: Hermann Forkl et al. (eds), *Die Gärten des Islam.*

NOTE :

NOTE :